# সমাজকর্ম

## প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1862

**হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম**
**(এইচএসসি প্রোগ্রাম)**

ওপেন স্কুল



**বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**

# সমাজকর্ম

## প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1862

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)


**লেখকবৃন্দ**

শিল্পী রাণী দে
মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান
মোছা: শামীমা নাছরীন

**সম্পাদনা**

ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন

**সমন্বয়কারী**

আবু জিহাদ



ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

# সমাজকর্ম

## প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1862
এইচএসসি প্রোগ্রাম

**প্রকাশ কাল :** এপ্রিল, ২০১৬
পুনঃমুদ্রণ : অক্টোবর, ২০১৭
পুনঃমুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮
পুনঃমুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
পুনঃমুদ্রণ : মার্চ, ২০২০
অনলাইন ভার্সন : জানুয়ারি, ২০২২

**প্রকাশনায়**
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫।

**প্রচ্ছদ**
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

**প্রচ্ছদ গ্রাফিকস**
আবদুল মালেক

**কম্পিউটার কম্পোজ**
মোঃ টিপু সুলতান

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

**ISBN 978-984-34-3157-8**

**মুদ্রণ**
ফরাজী প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
দক্ষিন পাড়া, মাতুয়াইল, ঢাকা

# সূচিপত্র

**ইউনিট-০১: সমাজকর্ম : প্রকৃতি ও পরিধি** .....১-১৭
পাঠ-১.১: সমাজকর্মের ধারণা .....১
পাঠ-১.২: সমাজকর্মের সংজ্ঞা..... ২
পাঠ-১.৩: সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য..... ৪
পাঠ-১.৪: সমাজকর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ..... ৭
পাঠ-১.৫: সমাজকর্মের পরিধি.....১০
পাঠ-১.৬: সমাজকর্মের গুরুত্ব .....১৩
পাঠ-১.৭: সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা .....১৫

**ইউনিট-০২: সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট** ..... ১৮-৩৪
পাঠ-২.১: দরিদ্র আইনের ধারণা .....১৮
পাঠ-২.২: সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দরিদ্র আইনের ভূমিকা– ১৬০১, ১৮৩৪, ১৯০৫, এবং ১৯৪২ সালের আইনসমূহ ... ২০
পাঠ-২.৩: সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দান সংগঠন সমিতির কার্যক্রম ও ভূমিকা ..... ২৪
পাঠ-২.৪: সমাজকর্ম পেশার বিকাশে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কারস'র কার্যক্রম ও ভূমিকা .....২৬
পাঠ-২.৫: সমাজকর্ম পেশার বিকাশে কাউন্সিল ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'র কার্যক্রম ও ভূমিকা ..... ২৮
পাঠ-২.৬: শিল্পবিপ্লবের ধারণা.....২৯
পাঠ-২.৭: আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব ..... ৩০
পাঠ-২.৮: সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা..... ৩২

**ইউনিট-০৩: সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা**.....৩৫-৫৩
পাঠ-৩.১: পেশার ধারণা ..... ৩৫
পাঠ-৩.২: পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক..... ৩৮
পাঠ-৩.৩: সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ..... ৩৯
পাঠ-৩.৪: মূল্যবোধের ধারণা ও ধরন..... ৪২
পাঠ-৩.৫: সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা ..... ৪৩
পাঠ-৩.৬: সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা এবং গুরুত্ব ..... ৪৪
পাঠ-৩.৭: পেশা হিসেবে সমাজকর্ম..... ৪৮

**ইউনিট-০৪: সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ**..... ৫৪-৭১
পাঠ-৪.১: সমাজকল্যাণের ধারণা ..... ৫৪
পাঠ-৪.২: সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য..... ৫৫
পাঠ-৪.৩: সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ ..... ৫৭
পাঠ-৪.৪: সমাজকর্ম ও সমাজসেবা..... ৫৮
পাঠ-৪.৫: সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তা..... ৫৯
পাঠ-৪.৬: সমাজকর্ম ও সামাজিক পরিবর্তন .....৬১
পাঠ-৪.৭: সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন ..... ৬৩
পাঠ-৪.৮: সমাজকর্ম ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ..... ৬৫
পাঠ-৪.৯: সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার.....৬৬
পাঠ-৪.১০: সমাজসংস্কার আন্দোলন– সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাবিবাহ ও নারী শিক্ষা আন্দোলন ..... ৬৮

**ইউনিট-০৫: ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ** ..... ৭২-৮৭
পাঠ-৫.১: ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দানশীলতা ..... ৭২
পাঠ-৫.২: ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সদ্‌কা ..... ৭৪
পাঠ-৫.৩: ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাত ..... ৭৫
পাঠ-৫.৪: ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মগোলা ..... ৭৮
পাঠ-৫.৫: ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাইখানা ..... ৭৯
পাঠ-৫.৬: ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর ..... ৮০
পাঠ-৫.৭: ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বায়তুলমাল ..... ৮১
পাঠ-৫.৮: ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াক্‌ফ ..... ৮৩
পাঠ-৫.৯: ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতিমখানা ..... ৮৪

**ইউনিট-০৬: সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক** ..... ৮৮-১০৬
পাঠ-৬.১: সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক ..... ৮৮
পাঠ-৬.২: সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক ..... ৯০
পাঠ-৬.৩: সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক ..... ৯২
পাঠ-৬.৪: সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে সম্পর্ক ..... ৯৪
পাঠ-৬.৫: সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক ..... ৯৬
পাঠ-৬.৬: সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক ..... ৯৭
পাঠ-৬.৭: সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার মধ্যে সম্পর্ক ..... ৯৯
পাঠ-৬.৮: সমাজকর্ম ও আইন পেশার মধ্যে সম্পর্ক ..... ১০১
পাঠ-৬.৯: সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা পেশার মধ্যে সম্পর্ক ..... ১০২
পাঠ-৬.১০: জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম ..... ১০৩

**ইউনিট-০৭ : সমাজকর্ম পদ্ধতি : ব্যক্তি সমাজকর্ম** ..... ১০৭-১২৩
পাঠ-৭.১: সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণা ..... ১০৭
পাঠ-৭.২: সমাজকর্ম পদ্ধতির ধরন ..... ১০৮
পাঠ-৭.৩: ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা ..... ১১১
পাঠ-৭.৪: ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান ..... ১১২
পাঠ-৭.৫: ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা ..... ১১৪
পাঠ-৭.৬: ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া ..... ১১৫
পাঠ-৭.৭: সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি সমাজকর্মীর সম্পর্ক (র‍্যাপো) ..... ১১৭
পাঠ-৭.৮: ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র ..... ১২০

**ইউনিট-০৮: সমাজকর্ম পদ্ধতি: দল এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন** ..... ১২৪-১৫৩
পাঠ-৮.১: দলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ ..... ১২৫
পাঠ-৮.২: দল সমাজকর্মের ধারণা, উপাদান ও নীতিমালা ..... ১২৭
পাঠ-৮.৩: দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া ..... ১৩০
পাঠ-৮.৪: দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া ..... ১৩২
পাঠ-৮.৫: দল সমাজকর্মীর ভূমিকা ..... ১৩৩
পাঠ-৮.৬: দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র ..... ১৩৫
পাঠ-৮.৭: সমষ্টির ধারণা ও প্রকৃতি ..... ১৩৭
পাঠ-৮.৮: সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন ..... ১৩৯
পাঠ-৮.৯: সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান ..... ১৪১

পাঠ-৮.১০: সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের নীতিমালা.....১৪২
পাঠ-৮.১১: সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের প্রক্রিয়া.....১৪৪
পাঠ-৮.১২: সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগক্ষেত্র.....১৪৬
পাঠ-৮.১৩: সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি গুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক.....১৪৯

**ইউনিট-০৯: সমাজকর্ম পদ্ধতি ঃ সমাজকল্যাণ প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম ও সমাজকর্ম গবেষণা**..... ১৫৪-১৭৮
পাঠ-৯.১: প্রশাসন ও সমাজকল্যাণ প্রশাসনের ধারণা.....১৫৫
পাঠ-৯.২: সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদান.....১৫৬
পাঠ-৯.৩: সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব.....১৫৭
পাঠ-৯.৪: সামাজিক কার্যক্রমের ধারণা.....১৫৯
পাঠ-৯.৫: সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান.....১৬০
পাঠ-৯.৬: সামাজিক কার্যক্রমের প্রক্রিয়া.....১৬২
পাঠ-৯.৭: সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব.....১৬৪
পাঠ-৯.৮: গবেষণা, সামাজিক গবেষণা ও সমাজকর্ম গবেষণা.....১৬৬
পাঠ-৯.৯: সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ.....১৬৯
পাঠ-৯.১০: গবেষণা প্রস্তাবনা.....১৭১
পাঠ-৯.১১: সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব.....১৭৩
পাঠ-৯.১২: সমাজকর্মের মৌলিক এবং সহায়ক পদ্ধতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক.....১৭৪

**ইউনিট-১০: সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম**..... ১৭৯-২৪৮
পাঠ-১০.১: সামাজিক নীতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য.....১৮০
পাঠ-১০.২: সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য.....১৮১
পাঠ-১০.৩: সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া.....১৮৩
পাঠ-১০.৪: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০.....১৮৫
পাঠ-১০.৫: জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০১২..... ২০০
পাঠ-১০.৬: জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১.....২০৯
পাঠ-১০.৭: জাতীয় শিশু নীতি ২০১১.....২১৯
পাঠ-১০.৮: সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব.....২২৭
পাঠ-১০.৯: সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা.....২২৯
পাঠ-১০.১০: সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা.....২৩১
পাঠ-১০.১১: পরিকল্পনা ও সামাজিক পরিকল্পনা..... ২৩৩
পাঠ-১০.১২: পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ..... ২৩৫
পাঠ-১০.১৩: বাংলাদেশে গৃহীত পরিকল্পনা.....২৩৯
পাঠ-১০.১৪: সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা.....২৪১
পাঠ-১০.১৫: সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা..... ২৪৪

**ইউনিট-১১: সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা**..... ২৪৯-২৬৬
পাঠ-১১.১: বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশের পর্যায়.....২৪৯
পাঠ-১১.২: বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার অনুশীলনের ইতিহাস.....২৫২
পাঠ-১১.৩: বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র..... ২৫৩
পাঠ-১১.৪: বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সমস্যাসমূহ.....২৫৬
পাঠ-১১.৫: বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনা..... ২৫৮
পাঠ-১১.৬: বিশ্বের উন্নত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা.....২৫৯
পাঠ-১১.৭: বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা.....২৬৩
**মানবণ্টন ও নমুনা প্রশ্ন**..... ২৬৭-২৭৪

# কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

## কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

**কোর্সের নাম : সমাজকর্ম প্রথম পত্র** **কোর্স কোড : (HSC-1862)**

এইচএসসি প্রোগ্রামের সমাজকর্ম প্রথম পত্র বইটি এক বছরের জন্য পাঠ্য। বইটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একই সাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে এনসিটিবি'র নতুন কারিকুলামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বইটি স্ব-শিখন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইটিকে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশিষ্ট কোন দিকগুলো জানা যাবে তা ইউনিটের উদ্দেশ্যে বলা আছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী উদ্দেশ্য অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কি না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি ভূমিকা অবশ্যই বুঝে পড়তে হবে। প্রতিটি পাঠের শেষে সারসংক্ষেপ দেয়া আছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন এবং ইউনিটের শেষে সৃজনশীল প্রশ্ন দেয়া হয়েছে।

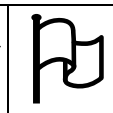
সমাজকর্ম হচ্ছে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে একটি গতিশীল পেশাগত কর্মকাণ্ড, যা একাধারে বিজ্ঞান ও কলা। সমাজকর্ম পেশা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভে এই পাঠ্যবইটি সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে জ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রয়োগের পাশাপাশি সহমর্মিতা, আত্মবিযুক্ত ভালবাসা, উষ্ণতা, আন্তরিকতা, সৃজনশীলতা, বিচারবোধ কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা, মানবীয় গুণাবলি ইত্যাদি শৈল্পিক দক্ষতা বিকশিত করার সুযোগ পাবে। দেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তোলা এই পর্যায়ের শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। পাঠ্যবইটির বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে এটি দূরশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের আনন্দদায়ক পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

শিক্ষার্থীরা যাতে বইটি পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারে সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল :

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলো পড়ে এই পাঠ থেকে কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল অধ্যায়কে ততটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোনো অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।
- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালো করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর অনুশীলন অংশের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কি না দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবার পড়ুন।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।

## মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মড্যুলের কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উদ্দেশ্য | মূলপাঠ | সারসংক্ষেপ | পাঠোত্তর মূল্যায়ন | চূড়ান্ত মূল্যায়ন | উত্তরমালা | ভিডিও বা দেখা | অডিও বা শোনা | সাহায্য/প্রয়োজনে |

| | |
|---|---|
| <br><br>**অডিও/ভিডিও** | বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী বন্ধুদের জন্য সমাজকর্ম বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।<br>শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ ও কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন। |

| | | |
|---|---|---|
|  | **সাহায্য বা সহায়তার জন্য আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটরের পরামর্শ নিন।** | **শিল্পী রাণী দে**<br>সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ<br>জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০। |

ইউনিট
১

# সমাজকর্ম : প্রকৃতি এবং পরিধি
# (Social Work : Nature and Scope)

## ভূমিকা


ডাব্লিউ. এ ফ্রিডল্যান্ডার

বর্তমান বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও জটিল সমাজের বহুমুখী সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের উদ্ভব। সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর সাহায্যকারী পেশা, যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা মানুষের জীবনমান উন্নয়নে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে। সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা একাধারে একটি বিজ্ঞান ও কলা। শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজ ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর রূপ লাভ করার প্রেক্ষাপটে প্রথাগত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ায় প্রাতিষ্ঠানিক সমাজকর্মের আবির্ভাব হয়েছে।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ–১.১ : সমাজকর্মের ধারণা
পাঠ–১.২ : সমাজকর্মের সংজ্ঞা
পাঠ–১.৩ : সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ–১.৪ : সমাজকর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ–১.৫ : সমাজকর্মের পরিধি
পাঠ–১.৬ : সমাজকর্মের গুরুত্ব
পাঠ–১.৭ : সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা


## পাঠ-১.১ সমাজকর্মের ধারণা (Concept of Social Work)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১.১ সমাজকর্ম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ১.১ সমাজকর্মের ধারণা

সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশা, যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে মানুষ তার বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেই নিজেদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে উঠে। সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে এবং সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। তাই সমাজকর্মকে empowering পেশা হিসেবে অভিহিত করা হয়। আধুনিক শিল্পসমাজের বহুমুখী ও জটিল সমস্যা মোকাবিলার জন্য সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব হয়েছে; যদিও পেশাদার তথা আধুনিক সমাজকর্মের শিকড় প্রথিত রয়েছে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় পরিকল্পিত সেচ্ছাসেবী সমাজসেবা কার্যক্রম ও প্রচেষ্টার মধ্যে।

সমাজকর্ম একটি বিজ্ঞান ও কলা, যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত কর্মকাণ্ড পরিচলিত করে। শিল্পভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হওয়ার প্রেক্ষাপটে সমাজকর্ম

পেশার আবির্ভাব হয়েছে। সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যার সূচনা ও বিকাশ একদিনে হয়নি। বস্তুত সর্বজনীন মানবমর্যাদা ও মানবাধিকারকে সমুন্নত রেখে মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণ প্রচেষ্টার একটি অংশ হিসেবে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃ-বিজ্ঞান, মনোচিকিৎসাসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয়ে সমাজকর্ম একটি সমন্বিত ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়ে মানুষের জীবনযাত্রার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার পাশাপাশি সৃষ্টি হয় মনো-সামাজিক সংকট ও সমস্যা। এই সংকট ও সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করলে প্রচলিত সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবা অপ্রতুল, অপর্যাপ্ত ও অকার্যকর হয়ে উঠে। এই প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্য ও সেবামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর পেশাগত কর্মকাণ্ড হিসেবে সমাজকর্মের সূচনা হয়। ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম সমাজকর্মের সূত্রপাত হলেও আমেরিকায় পেশাদার সমাজকর্মের ধারণা, পদ্ধতি ও কৌশল পূর্ণতা লাভ করেছে। সমাজকর্মের বিকাশে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন জ্যান এড্যামস (Jane Addams) (১৮৬০–১৯৩৫), ম্যারী এ্যালেন রিচমন্ড (Mary Ellen Richmond) (১৮৬১–১৯২৮) এবং উইলিয়াম হ্যানরি বিভারিজ (William Henry Beveridge) (১৮৭৯–১৯৬৩)। সমাজকর্ম মূলত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি পেশাগত কর্মকাণ্ড, যা মানুষকে তার সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার সংরক্ষণ, সমৃদ্ধিকরণ, উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধারে সক্রিয় ও সক্ষম করে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে।

## সারসংক্ষেপ

শিল্পবিপ্লবোত্তর আধুনিক শিল্পসমাজের জটিল সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের প্রয়াসে সমাজকর্ম ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। সমাজকর্ম মূলত একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান যা সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী মানবহিতৈষী পেশাগত সেবাকর্ম হিসেবে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের যাথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। আধুনিক শিল্পসমাজের জটিলতর সমস্যা মোকাবিলার প্রচেষ্টা হিসেবে কোন পেশার সূচনা হয়?

ক) সমাজকল্যাণ খ) মনোবিজ্ঞান

গ) সমাজকর্ম ঘ) দর্শন

২। আধুনিক সমাজকর্ম পেশার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে কোন দেশে?

ক) ইংল্যান্ড খ) আমেরিকা

গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) বাংলাদেশ

## পাঠ-১.২ সমাজকর্মের সংজ্ঞা (Definition of Social Work)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১.২ সমাজকর্মকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।

### ১.২ সমাজকর্মের সংজ্ঞা

সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলনির্ভর একটি পেশাগত কর্মকাণ্ড ও প্রক্রিয়া, যা সামাজিক কল্যাণ (Social Betterment) আনয়নে প্রয়াস চালায়। আমেরিকার National Association of Social Workers (NASW) কর্তৃক প্রকাশিত সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "সমাজকর্ম হলো ব্যক্তি, দল ও

সমষ্টিকে সাহায্য করার এক পেশাগত কর্মকাণ্ড, যা তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতাকে পুনরুদ্ধার ও শক্তিশালী করে এবং সামাজিক পরিবেশকে এই লক্ষ্যের উপযোগী করে গড়ে তোলে।" (Social work is the professional activity of helping individual, groups or communities to enhance or restore, their capacity for social functioning and creating societal conditions favourable to this goal.) বর্তমানে NASW কর্তৃক প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটি বহুল প্রচলিত। ওয়াল্টার এ. ফ্রিডল্যান্ডার (Walter A. Friedlander) (১৯৯৬) তাঁর *æIntroduction to Social Welfare"* গ্রন্থে বলেন, "সমাজকর্ম হলো মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক এমন এক পেশাদার সেবাকর্ম, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একক বা দলীয়ভাবে ব্যক্তিকে সহায়তা করে।" (Social work is a professional service, based upon scientific knowledge and skills in human relations, which assists individuals, alone or in groups, to obtain social and personal satistaction and independence.)

আরমান্ডো টি. মোরেলস এবং ব্রাডফোর্ড ডব্লিউ শেফর (Armando T. Morales & Bradford W. Sheafor) (1986 : 18) তাঁদের *æSocial Work : A Profession of Many Faces"* গ্রন্থে বলেন, "সমাজকর্ম ক্রমবর্ধমান সমাজের জটিলরুপ ধারনকারী সমস্যা সমাধানের জন্য সৃষ্ট একটি ব্যবস্থা যা সমাজের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত আন্তক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকরভাবে তাদের চাহিদা পূরণকে জটিল করে তোলে।" (Social work has been a product of an increasingly complex world that makes it difficult for people to meet their needs effectively through conventional interaction with family, friends, neighbors and the various social institutions.) তাঁরা বলেন, সমাজকর্ম একটি বহুমুখী পেশা। (Social work is a prosfession of many faces.) সমাজকর্ম বিশ্বকোষ (*Encyclopedia of Social Work*) এর ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমাজকর্ম হলো এমন একটি সুসংগঠিত প্রচেষ্টা যা ব্যক্তি ও পরিবারকে সমষ্টির সাথে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে এবং একইভাবে সমষ্টিকেও ব্যক্তি ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণে উপযোগী করে তোলে।" (Social work is an organized effort to help individuals and families to adjust themselves to the community as well as to adapt the community to the needs of such persons and family.)

International Federation of Social Workers-IFSW (২০১৪) এর সংজ্ঞানুযায়ী, "সমাজকর্ম হলো অনুশীলনভিত্তিক একটি পেশা ও জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা যা সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি এবং জনগণের সক্ষমতা ও স্বাধীনতার উন্নয়ন সাধিত করে। সামাজিক ন্যায়-বিচার, মানবাধিকার, সামষ্টিক দায়িত্ববোধ এবং বৈচিত্র্যময়তার প্রতি সম্মানবোধের নীতিমালা সমাজকর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দু।" (Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work.)

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, সমাজকর্ম হচ্ছে একটি পেশাগত প্রক্রিয়া, যা মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়ন, মানবীয় শক্তি-সামর্থ্য বাড়ানো ও পুনরুদ্ধার করা এবং এক্ষেত্রে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলে সাহায্যার্থীর ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা লাভে সহায়তা করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী প্রক্রিয়া ও পেশা, যা কতগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের সমস্যার টেকসই সমাধান করে এবং ব্যক্তিগত, দলীয় এবং সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে সক্ষম করে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি পেশাগত কর্মকাণ্ড। সমাজকর্ম হচ্ছে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে পদ্ধতিনির্ভর, আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেবামূলক একটি প্রক্রিয়া, যা সমাজস্থ মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সন্তোষজনক জীবন লাভে সক্ষম করে তোলে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। "সমাজকর্ম একটি বহুমুখী পেশা" (Social work is a profession of many faces.) –এটি কার উক্তি?

ক) W.A Friedlander খ) Armando T. Morales

গ) Rex A. Skidmore ঘ) Encyclopedia of Social Work

২। সমাজকর্ম হচ্ছে একটি–

ক) সাহায্যকারী পেশা খ) বদান্যতানির্ভর প্রচেষ্টা

গ) সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতা ঘ) বাহ্যিক সাহায্যদান প্রক্রিয়া

৩। ক্রমবিকাশমান আধুনিক শিল্পসমাজের সামাজিক জটিলতার ফসল কী?

ক) সনাতন সমাজকর্ম খ) চিকিৎসা সমাজকর্ম

গ) পেশাদার সমাজকর্ম ঘ) আধুনিক সমাজকর্ম

## পাঠ-১.৩ সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goals and Objectives of Social Work)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১.৩ সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

### ১.৩ সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো সমাজস্থ প্রতিটি স্তরের মানুষকে তার সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্রিয় ও সক্ষম করে গড়ে তোলা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। একটি মানবোচিত পেশাগত কর্মকাণ্ড (humanizing professional activity) হিসেবে সমাজকর্ম মানুষের যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালন (social functioning) এবং পরিবেশের সঙ্গে কার্যকর সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার (social interaction) ক্ষমতা উন্নয়নে সক্ষম করে তোলে।

এ প্রসঙ্গে সমাজকর্ম বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, পরিবার, দল, সংগঠন এবং সমষ্টিকে কর্মসম্পাদন, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রতিরোধ ও সম্পদ ব্যবহারে সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ এবং শক্তিশালীকরণ।

W. A. Friedlander এর মতে, বিজ্ঞান, কলা ও পেশা হিসেবে সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করা যাতে প্রতিটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সামাজিক, মানসিক এবং দৈহিক কল্যাণের অধিকারী হতে পারে। সমাজকর্মের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে B. R. Compton এবং B. Galaway (১৯৭৫) তাঁদের *"Social Work Process"* গ্রন্থে বলেন, "The purpose of social work practice can be seen as effecting deliberate changes in the interaction of people and their environment, with the goal of improving the capacity of individuals to cope with their life tasks in a way that is satisfying to themselves and to others, and is so doing, enhancing their capacity for a fuller realization of their aspirations।"

সমাজকর্ম অনুশীলনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে *"Comprehensive Handbook of Social Work and Social Welfare"* (2008 : 38) এর vol-1 এ বলা হয়েছে, "The purpose of scial work practice, in general,

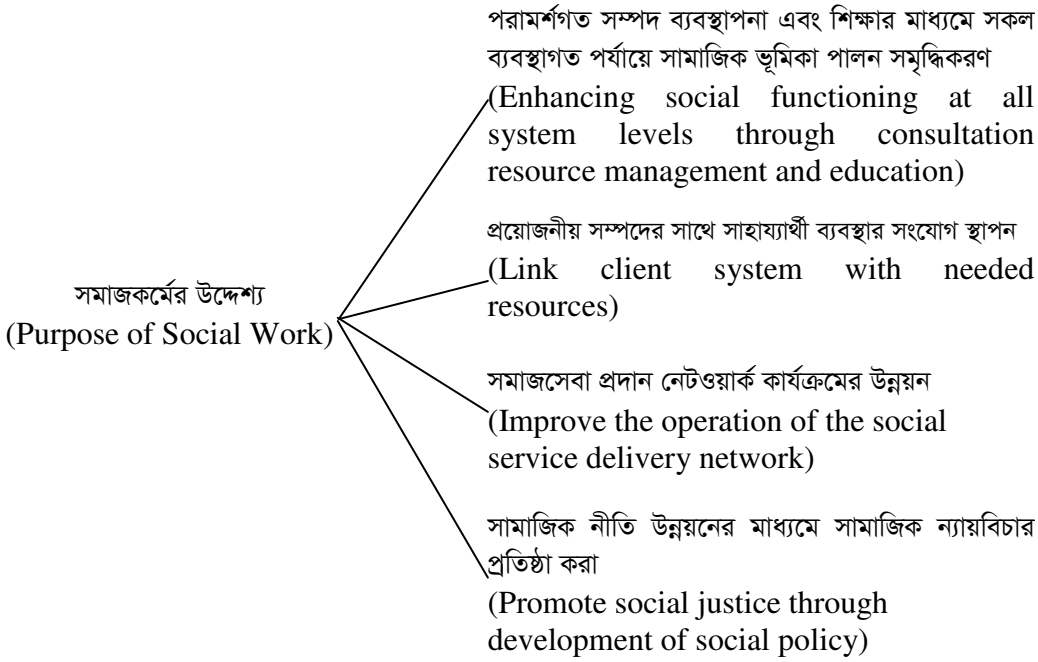
is to enhance, maintain, and restore the social functioning and promote social justice of individuals, families, groups, communities, organizations, and society at large with special emphasis on vulnerable populations।"

মনীষী A. T. Morales এবং B.W. Sheafor (১৯৮৬) এর মতে, সমাজকর্মের আবির্ভাব হয়েছে সমাজস্থ অপেক্ষাকৃত অসহায় (more helpless) ও অসুবিধাগ্রস্ত (vulnerable) জনগোষ্ঠীকে সাহায্য প্রদানের জন্য। তাঁদের মতে, সমাজকর্ম যত্ন (caring), নিরাময় (curing) এবং পরিবর্তন (changing) এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমাজকর্মের উদ্দেশ্য।

সমাজকর্ম একটি গতিশীল পেশা (dynamic profession) হিসেবে সময়ের প্রয়োজনে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিবর্তন এসেছে। National Association of Social Workers (NASW) ১৯৮১ সালে সমাজকর্মের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করেছে :

১. জনগণের সমস্যা সমাধান, উপযোজন এবং ক্ষমতার উন্নয়ন সাধন (To enhance problem solving, coping and developmental capacities);
২. সম্পদ, সেবা ও সুযোগের সাথে মানুষের সংযোগ ঘটানো (To link people with resources, services and opportunities);
৩. কার্যকর মানবসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা (To promote an effective human service system);
৪. সামাজিক নীতির বিকাশ ও উন্নয়ন (To develop and improve social policy)।

এ প্রসঙ্গে Brenda DuBois এবং Karla Krogsrud Miley (1992 : 4-5) তাঁদের গ্রন্থ *æSocial Work : An Empowering Profession"*-এ উল্লেখ করেন, সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা (addressing social problems), পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসন (resolving interpersonal conflicts), বিচার্য বিষয়সমূহকে মোকাবিলা (confronting issues) এবং মানবীয় চাহিদা পূরণ করা (meeting human needs) হচ্ছে সমাজকর্মের উদ্দেশ্য। তাঁরা আরো বলেন, সমাজকর্ম পেশার সুস্পষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে মানবীয় অবস্থায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি করা (improvement of the quality of life in the human condition is envisioned as an explicit goal of the profession)। তাঁরা নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে সমাজকর্মের উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরেছেন :




**চিত্র : ১.৩.১ সমাজকর্মের উদ্দেশ্য (সূত্র : DuBois & Miely; 1992 : 23)**

মূলত মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কই হচ্ছে সমাজকর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মূল ভিত্তি। মানুষকে সামাজিক অবস্থানের সাথে সংগতি বিধান করে যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলাই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য।

সমাজকর্ম হচ্ছে একটি এমপাওয়ারিং (empowering) পেশা, যা সমাজের দুঃস্থ, অসহায়, বঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ মানবগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের জন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজকর্ম বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, সমাজকর্ম অনুশীলনের উদ্দেশ্য হলো সাংগঠনিক বা প্রশাসনিক পরামর্শ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নীতি, সেবা, সম্পদ এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও অনুসরণ করা; যাতে ঝুঁকিপূর্ণ মানব গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে।

সমাজকর্ম একটি মানবোচিত (humanizing) এবং কর্মমুখী (action-oriented) কর্মকাণ্ড হিসেবে সামাজিক নীতি পরিবর্তন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অবদান রাখে। মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ও সামাজিক সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে সমাজকর্ম সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিকসহ সকল দিকের প্রতি নজর দিয়ে থাকে। সমাজে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সমাজকর্ম কাজ করে।

সমাজের পরিকল্পিত ও গঠনমূলক পরিবর্তন আনয়ন সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য। সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানুষের সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্যে সমাজকর্ম প্রয়াস চালায়।

## সারসংক্ষেপ

**সারসংক্ষেপ**

সমাজকর্ম সমাজস্থ মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পরিকল্পিত, প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাদার প্রচেষ্টা চালায়। সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা সমাজস্থ মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করা, যাতে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তারা নিজেই নিজের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়ে উঠে। বস্তুত সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের বিভিন্নমূখী সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক তথা সার্বিক সমাধান নিশ্চিত করা। সংক্ষেপে বলা যায়, the mission of social work is human betterment।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম পেশার মূল লক্ষ্য কোনটি?

ক) মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা খ) নির্ভরশীল মনোভাব সৃষ্টি করা

গ) মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করা ঘ) জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা

২। NASW কর্তৃক ১৯৮১ সালে সমাজকর্মের কয়টি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে?

ক) দুইটি খ) তিনটি

গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

# পাঠ-১.৪ সমাজকর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Social Work)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১.৪.১ সমাজকর্ম পেশার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১.৪.২ সমাজকর্ম পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

## ১.৪.১ সমাজকর্মের প্রকৃতি

সমাজকর্ম হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলনির্ভর বিজ্ঞান, কলা ও পেশাদার সেবাকর্ম। অন্যান্য পেশা যেমন– আইন-সহায়তা, চিকিৎসা, ও শিক্ষকতার ন্যায় সমাজকর্মেরও সুনির্দিষ্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সমাজকর্মকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করেছে। বর্তমান বিশ্বে ভিন্নধর্মী একটি পেশা হিসেবে সমাজকর্ম সম্প্রসারিত হচ্ছে। উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত সকল দেশে পেশা হিসেবে সমাজকর্ম বিকাশমান। সমাজভেদে প্রায়োগিকদিক থেকে এর কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও তাত্ত্বিক জ্ঞানের দিকে সমাজকর্ম বিশ্বব্যাপী অভিন্ন রূপে বিদ্যমান।

সমাজকর্ম একটি গতিশীল (dynamic) ও প্রায়োগিক (applied) সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজস্থ মানুষের সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়। শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়ে দ্রুত শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ, আত্মসচেতনতা ও অধিকারবোধ তথা ক্ষমতায়নজনিত কারণে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপরীতে মানুষের সমাজজীবনে নানাধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি মনো-সামাজিক সংকটেরও সৃষ্টি হয়। এছাড়া পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংকট চরম আকার ধারণ করার ফলে সমস্যাগুলো জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যার কার্যকর ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের প্রয়াস হিসেবে পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। সমাজকর্ম হচ্ছে মানবতাবাদী মূল্যবোধভিত্তিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর একটি পেশাগত কর্মকাণ্ড, যা সামাজিক হস্তক্ষেপ (social intervention), সামাজিক উপযোজন (social adaptaion), সামাজিক উদ্ভাবন (social innovation) এবং পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন (planned social change) কৌশলসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সাহায্যার্থীকে সক্ষম করে তুলে। সমাজকর্ম মানুষের সমস্যা সমাধানে বিস্তৃত অনুশীলন ক্ষেত্রে (versatile practice perspective) কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সমাজকর্ম পেশার আবির্ভাবের মূলে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, মানবহিতৈষী প্রচেষ্টা ও সমাজকল্যাণমূলক মনোভাব ভিত্তি হিসেবে কাজ করলেও বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে এটি ধর্মনিরেপক্ষ ও সর্বজনীন মানবাধিকার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্বতন্ত্র পেশা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের একটি ব্যবহারিক শাখা হিসেবে পরিচিত। তবে একথা সত্য ও স্বীকার্য যে, মানবতাবোধ ও ধর্মীয় অনুশাসন সমাজকর্মের দার্শনিক ভিত্তি তৈরি ও সমাজকর্ম দর্শন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

## ১.৪.২ সমাজকর্ম পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বিশ্বে সমাজকর্ম একটি মানব সেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন স্বীকৃত। অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্ম পেশার সুনির্দিষ্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা সমাজকর্মকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় পরিচিতি দান করছে।

সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া (enabling process) হিসেবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, কৌশল, নীতি ও মূল্যবোধ এবং জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে সাহায্য করে যাতে তাদের সুপ্ত প্রতিভা (latent quality) ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে সক্ষম হয়। যেমন– একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত ধূমপান করছে। সমাজকর্মী এই ব্যক্তিকে সাহায্যার্থী হিসেবে গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে সাহায্যার্থীর ধূমপান সমস্যা নিরসনে তার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবে। আর সাহায্যার্থী যেহেতু শিক্ষিত তাই তার এই অবস্তুগত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সমস্যা সমাধান করে তার কাঙ্খিত সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলায় প্রয়াস চালাবে। সমাজকর্ম পদ্ধতিগতভাবে মানুষের সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী। সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার। যথা– ১. মৌলিক পদ্ধতি ও ২. সহায়ক পদ্ধতি; যা পেশাটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম, এবং সমষ্টি সংগঠন। তবে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে বর্তমানে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতিটি সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দলকেন্দ্রিক সমস্যার ক্ষেত্র দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টিকেন্দ্রিক সমস্যার ক্ষেত্রে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি (সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন) প্রয়োগ করা হয়। মৌলিক পদ্ধতির সফল ও যথাযথ অনুশীলনের জন্য সাহায্যকারী পদ্ধতি হিসেবে সামাজকল্যাণ প্রশাসন, সমাজকর্ম গবেষণা ও সামাজিক কার্যক্রমের সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে।

সমাজকর্ম মূলত একটি কল্যাণধর্মী পেশা হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালনে তথা কল্যাণে কাজ করে, যা পেশাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই সমাজকর্মকে humanitarian পেশা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সমাজকর্ম পেশার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক পেশা।

সমাজকর্ম অনুশীলনে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পেশাগত সম্পর্ক (rapport) স্থাপন। সমাজকর্ম অনুশীলনে নিয়োজিতদের সমাজকর্মী বলা হয়। সমাজকর্মী তাঁর কাছে সাহায্য নিতে আসা সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করেন, যা অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রে তেমন দেখা যায় না। সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী পেশা হিসেবে সাহায্যার্থীর প্রকৃত সমস্যা নির্ণয় করে সমস্যা সমাধানে প্রয়াস চালায়। তাই এক্ষেত্রে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে কার্যকর পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর প্রচেষ্টা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। এই পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন সমাজকর্মের একটি শৈল্পিক বিষয় (artistic matter) হিসেবে বিবেচিত। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সহমর্মিতা (empathy), আত্মবিযুক্ত ভালবাসা (non-possessive warmth), উষ্ণতা (warmth), আন্তরিকতা (genuiness), সৃজনশীলতা (creativity), কল্পনা শক্তি (imagination), নমনীয়তা (flexibility), কর্মশক্তি (energy), বিচারবোধ (judgement), ব্যক্তিগত ভঙ্গিমা (personal style) ইত্যাদি শৈল্পিক দক্ষতা প্রয়োগ করেন, যা পেশাগত সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে পেশাগত সম্পর্কের দিক থেকে সত্যিকার অর্থেই সমাজকর্ম অন্যান্য পেশা থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র ও গতিশীল পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সমাজকর্ম সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একটি মানব-ক্ষমতায়নমুখী (human-empowering) পেশা হিসেবে স্বীকৃত। ব্যক্তি তথা মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণ আনয়নে সমাজকর্ম সার্বিক প্রয়াস চালায়, যা পেশাটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সমাজকর্ম পেশার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি (base) রয়েছে, যা সমাজকর্মকে স্বতন্ত্র পেশার মর্যাদা এনে দিয়েছে; তা হলো মূল্যবোধভিত্তি (value base), জ্ঞানভিত্তি (knowledge base) এবং দক্ষতাভিত্তি (skill base)।

সমাজকর্ম একটি মূল্যবোধ নির্দেশিত (value guided) পেশা। এর অর্থ হচ্ছে– পেশাগত অনুশীলনের ক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী তার নিজস্ব বিশ্বাস যেমন– ধর্মীয়, জাতিগত ও রাজনৈতিক পরিচয় বা অন্য যেকোন ব্যক্তিগত/ সমষ্টিগত বিশ্বাসের উর্দ্ধে উঠে শুধুমাত্র সমাজকর্মের স্বীকৃত মূল্যবোধের আলোকে সেবাকার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ বা সমাজকর্ম শিক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন। এক কথায়, পেশাগত অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের নির্দেশিত মূল্যবোধের বাইরে ব্যক্তিগত কোনো বিশ্বাস অনুশীলনের সুযোগ নেই। সমাজকর্মের এসব মূল্যবোধ পেশাটিকে অন্যান্য পেশা হতে পৃথক ও স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি; ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার; জাতি-ধর্ম-বর্ণ- লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ প্রদান; আত্মপরিপূর্ণতার সুযোগ; সমাজের প্রতি ব্যক্তি ও ব্যক্তির প্রতি সমাজের কর্তব্য; পর্যাপ্ত সুযোগ; জীবন সংক্রান্ত সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি; আত্মনির্ভরতা; এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হচ্ছে সমাজকর্মের স্বীকৃত পেশাগত মূল্যবোধ। এসব পেশাগত মূল্যবোধসমূহ পেশাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও বটে।

সমাজকর্ম অনুশীলনে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের পাশাপাশি বিভিন্ন কৌশল (strategy) অনুসরণ করে থাকে, যা সমাজকর্ম কৌশল (social work strategy) হিসেবে পরিচিত। সামাজিক হস্তক্ষেপ বা সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ (social intervention or social work intervention), সামাজিক উপযোজন (social adaptation), সামাজিক উদ্ভাবন (social innovation) এবং পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন (planned social change) হচ্ছে সমাজকর্ম পেশার কৌশল যেগুলো সমাজকর্মের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র কৌশল হিসেবে পরিচিত।

কিছু ব্যবস্থার (system) মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান করে থাকে। সেগুলো হচ্ছে পরিবর্তন প্রতিনিধি ব্যবস্থা (change agent system), সাহায্যার্থী ব্যবস্থা (client System), লক্ষ্য ব্যবস্থা (target system) ও কার্যক্রম ব্যবস্থা (action system)। সমাজকর্মী পরিবর্তন প্রতিনিধি (change agent) হিসেবে

সমস্যাগ্রস্ত বা সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে অনুঘটকের (catalyst) ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে সমাজকর্মী আউটরিচার (outreacher), সক্ষমকারী (enabler), সংযোগকারী (broker), মধ্যস্থতাকারী (mediator), ক্ষমতায়নকারী (empowerer), সমন্বয়কারী (coordinator), গবেষক (researcher), সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকারী (facilitator), সম্পদ সমবেতকারী (resource mobilizer), তথ্য সংগ্রহকারী (data manager), প্রশাসক (adminitrator), শিক্ষক (educator), পক্ষ সমর্থনকারী (advocate), সূত্রপাতকারী (initiation), আপোসকারী (negotiator), আচরণে পরিবর্তন আনয়নকারী (behavior changer), পরিবর্তনকারীসহ (activist), জনগণের মুখপাত্র (public speaker) হিসেবে ভূমিকা পালন করে, যা পেশাটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান শিল্পসমাজে সমাজকর্মের অনুশীলন ও প্রয়োগক্ষেত্র প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হচ্ছে। পরিবারকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, নারীকল্যাণ, যুবকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ, বয়স্ককল্যাণ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, মাদকাসক্তি, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, সংশোধনমূলক কার্যক্রম, এবং সামরিক ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ হচ্ছে। সমাজকর্মীরা প্রশাসন, নীতি ও গবেষণা ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করছে।

সমাজ প্রতিনিয়ত গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। গতিশীল ও পরিবর্তনশীল সমাজে মানুষ যখন সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আন্তক্রিয়ার সক্ষম হয় না, তখন সমাজকর্মী পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় (change process) তাকে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী গ্রহণ ও সংযুক্তি (intake and engagement), তথ্য সংগ্রহ ও অবস্থা নিরূপণ (data collection and assessment), পরিকল্পনা ও চুক্তি (planning and contracting), হস্তক্ষেপ ও পরিবীক্ষণ (intervention and monitoring) এবং মূল্যায়ন ও সমাপ্তিকরণ (evaluation and termination) ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট ধাপসমূহ অনুসরণ করে থাকে, যা সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

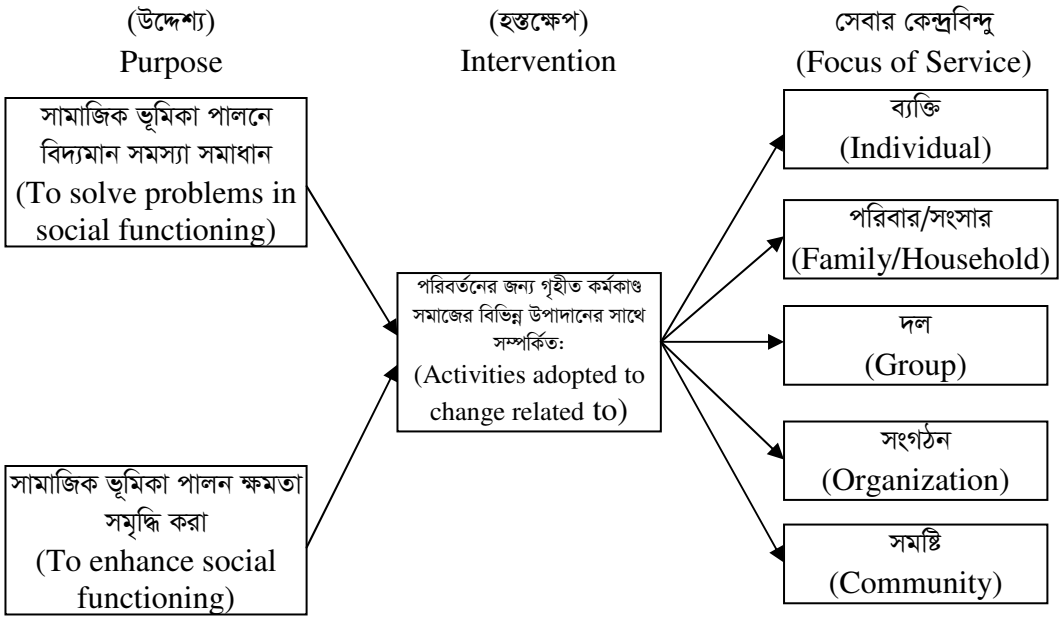
জাতিসংঘের সামাজিক কমিশন (Social Commission of the United Nations) ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক জরিপের ভিত্তিতে সমাজকর্মের তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। তা হলো :

১। সমাজকর্ম হচ্ছে একটি সাহায্যাকারী কার্যক্রম (Social Work is a helping activity);

২। সমাজকর্ম হচ্ছে একটি সামাজিক কার্যক্রম, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য; মুনাফা অর্জনের জন্য নয় (Social Work is a social activity established for the benifit of community, not for profit motives);

৩। সমাজকর্ম হচ্ছে একটি সংযোগকারী কার্যক্রম, যার মাধ্যমে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি ও দল তাদের প্রয়োজন পূরণে সমষ্টির সম্পদকে কাজে লাগাতে পারে। (Social Work is a liasion activity through which the disadvantaged individuals and groups may tap community resources.)

আবদুল হাকিম সরকার (২০০৮ : ১৬) তার *"সমাজকর্ম অনুশীলন : রীতি ও গতিপ্রবাহ"* গ্রন্থে নিম্নোক্ত একটি ছকের মাধ্যমে সমাজকর্ম অনুশীলনকে তুলে ধরেছেন :




চিত্র : ১.৪.১ সমাজকর্ম অনুশীলন

উপরিউক্ত চিত্র হতে সমাজকর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সমাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা মানুষকে সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে সাহায্য ও সক্ষম করা।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম হচ্ছে একটি মূল্যবোধ নির্দেশিত মানবিক পেশা যা মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির আওতায় সামাজিক বা সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ, সামাজিক উপযোজন, সামাজিক উদ্ভাবন এবং পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন কৌশল প্রয়োগ করে সমাজস্থ মানুষের বিশেষত অসুবিধাগ্রস্ত ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান ও যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে। সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মী পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্মে সমাজকর্মীর শৈল্পিক বিষয় কোনটি?

ক) ভালোবাসা খ) স্নেহ-মমতা

গ) সহমর্মিতা ঘ) উত্তেজনা

২। সমাজকর্মের কৌশল কোনটি ?

ক) সামাজিক হস্তক্ষেপ খ) নীতি প্রণয়ন

গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সামাজিক গবেষণা

## পাঠ-১.৫ সমাজকর্মের পরিধি (Scope of Social Work)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১.৫ সমাজকর্মের পরিধি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১.৫ সমাজকর্মের পরিধি

সমাজকর্মের পরিধি বলতে সাধারণত সমাজকর্মের অনুশীলন বা প্রয়োগক্ষেত্রকে (fields of social work practice) বোঝায়। সমাজকর্মের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিক নিয়েই এর পরিধি নির্ধারিত হয়। পেশা হিসেবে সমাজকর্ম মানুষকে তার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকরভাবে আন্তঃক্রিয়ায় সাহায্য করে, তাই এর পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ প্রসঙ্গে R. A. Skidmore এবং M. G. Thackeray বলেন, "বৃহৎ দৃষ্টিকোণ হতে সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের দৈহিক, মানসিক, আবেগীয়, আধ্যাত্মিক ও আর্থিক প্রয়োজনপূরণ এবং কল্যাণ সাধনই সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত।" (Social work, in a broad sense, encompasses the well being and interests of large number emotional, spiritual and economic needs.) অন্যদিকে মনীষী Elizabeth Wickenden বলেন, "সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত হলো সেসব আইন, কর্মসূচি, সুযোগ-সুবিধা ও সেবামূলক কার্যক্রম, যেগুলো জনগণের কল্যাণের জন্য স্বীকৃত মৌলিক প্রয়োজনাদি পূরণের নিশ্চয়তা বিধান বা জোরদার ও উত্তম

সামাজিক শৃংঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত।" (Social Work includes those laws, programs, benefits and services which assure or strengthen provisions for meeting social needs recognized as basic to the wellbeing of the population and the better function of the social order.) সমাজকর্ম পেশার বিকাশে State Boards of Charities, Charity Organization Society (COS) এবং Settlement House Movement কার্যক্রমগুলো কতগুলো ধারা (dimensions) যেমন– যত্ননির্ভর (caring), প্রতিকারধর্মী (curing), পরিবর্তনমূলক (changing), সেবামূলক (servicing) ও ক্ষমতায়নমূলক (empowering) সংযুক্ত করেছে, যা সমাজকর্মের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত ও ব্যাপক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে মানুষ ও তার পরিবেশ (environment) এবং এমনকি প্রতিবেশ (ecology), যা মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সমাজ ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে সমাজকর্ম আলোচনা করে থাকে। সামাজিক সমস্যার স্বরূপ, প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণে প্রয়োজন সামাজিক গবেষণা। তাই সমাজকর্মের বিস্তৃত পরিধির আওতায় সামাজিক গবেষণা অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য। সামাজিক নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ব্যতীত সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করে সামাজিক উন্নয়ন আনয়ন সম্ভব নয়। এজন্য সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, সমাজ সংস্কার, সমষ্টি উন্নয়ন, সংশোধনমূলক কার্যক্রম ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সমাজকর্মের আওতাভুক্ত।

সমাজকর্মের পরিধি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে Brenda DuBois এবং Karla Krogsrud Miley (১৯৯২) তাঁদের *"Social Work : An Empowering Profession"* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, পরিবার ও শিশুদের সেবা (family and children's services), স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন (health and rehabilitation), মানসিক স্বাস্থ্য (mental health), তথ্য ও প্রেরণ (information and raferral), জীবিকাভিত্তিক সমাজকর্ম (occuption social work), কিশোর ও অপরাধী সংশোধন (juvenile and adult corrections), বয়স্ক বা প্রবীণ সেবা (gerotogical services), স্কুল সমাজকর্ম (school social work), বাসস্থান (housing), আয় নির্বাহ (income maintnance) এবং সমষ্টি উন্নয়ন (community development) হচ্ছে সমাজকর্মের প্রধান অনুশীলনক্ষেত্র।

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) প্রকাশিত *Encyclopedia of Social Work*-এ সমাজকর্মের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে :

১. মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবা (Services for control, prevention and treatment of drug addiction);
২. বয়স্ক সেবা (Services for aging);
৩. শিশু ও পরিবার কল্যাণ সেবা (Child and family welfare services);
৪. সমষ্টির কল্যাণ ও মানবসেবা পরিকল্পনা (Community welfare and planning human for services);
৫. অপরাধ ও কিশোর অপরাধী সংশোধন সেবা (Correctional services for crime and delinquency);
৬. প্রতিবন্ধী ও দৈহিক প্রতিবন্ধী সেবা (Services for disability and physical handicap);
৭. সমাজকর্ম পেশার উন্নয়নে শিক্ষা সেবা (Educational services for professional development of social work);
৮. পরিবেশ এবং সামাজিক পরিকল্পনা (Environment and social planning);
৯. পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা পরিকল্পনা (Family planning and population planning);
১০. পরিবারিক সেবা– পারিবারিক শিক্ষা, পরামর্শ (Family services- family life education, counseling);
১১. স্বাস্থ্য সেবা– কমিউনিটি মানসিক স্বাস্থ্য, প্রজনন পরামর্শ, স্বাস্থ্য ও হাসপাতাল পরিকল্পনা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য), জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি (Health services- community mental health, genetic counseling, health and hospital planning maternal and child health, public health program);
১২. গৃহায়ন ও গৃহকেন্দ্রিক সেবা (Housing and home maker services);

১৩. মানসিক স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সেবা (Services for mental health and retardation);
১৪. অভিবাসী পুনর্বাসন সেবা (Migration and resettlement services);
১৫. প্রতিবেশি সেবা (Neighborhood services);
১৬. শিশু ও প্রবীণ সংরক্ষণ সেবা (Protective services for children and adults);
১৭. সরকারি সমাজকল্যাণ সেবা (Public welfare service);
১৮. সামাজিক সাহায্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা সেবা (Public assistance and social security services);
১৯. চিত্তবিনোদন এবং পরিবেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Recreation and environmental planning);
২০. সমাজকর্ম গবেষণা (Research in social work);
২১. বিদ্যালয় সমাজকর্ম (School social work);
২২. সামাজিক নীতি উন্নয়ন (Social policy development);
২৩. যুবসেবা এজেন্সী এবং কর্মসূচি (Youth service agency and programs);
২৪. শ্রমকল্যাণ, শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম সেবা (Social work services in labour, business and industry);
২৫. সংখ্যালঘু সেবা (Services for minorities);
২৬. পল্লী সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান (Rural social services agency)।

কানাডার মন্ট্রিলে ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত International Federation of Social Workers (IFSW) এর সাধারণ সভায় সমাজকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যক্তি সমস্যা, সমাজে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা, বৈষম্য, অবিচারসহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করা হয়।

সমাজকর্ম পেশা মানবকল্যাণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব নির্যাতন ও মানব বঞ্চনা অবসানসহ মৌলমানবিক চাহিদা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। সমাজকর্ম সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে গবেষণাধর্মী একটি পেশা হিসেবে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যা সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। এ প্রসঙ্গে Armondo T. Morales এবং Bradford W. Sheafor (1986 : 119) বলেন, "Field of social work practice is a phrase used to describe a group of practice setting that deal with similiar client problems."

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম যেহেতু মানুষ ও তার সমস্যা নিয়ে কাজ করে, তাই এর পরিধি বিস্তৃত। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সমস্যা জটিল ও বহুমুখী রূপ লাভ করায় এর প্রয়োগক্ষেত্র তথা পরিধি বিস্তার লাভ করছে। মানব জীবনের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে নিজ সমস্যা সমাধানে নিজেকেই সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রচেষ্টা হিসেবে সমাজকর্মের পরিধি বিস্তৃত ও প্রসারিত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত কোনটি?
ক) মানুষ ও সমস্যা খ) রাষ্ট্র ও আইন
গ) শিক্ষা ও সম্পদ ঘ) সমস্যা ও সম্পদ

২। সমাজকর্ম কোন ধরনের প্রচেষ্টা চালায়?
ক) প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক খ) প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সেবামূলক
গ) আন্দোলন, কার্যক্রম ও উন্নয়নমূলক ঘ) উন্নয়নমূলক ও প্রতিবাদমূলক

# পাঠ-১.৬ সমাজকর্মের গুরুত্ব (Importance of Social Work)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১.৬ সমাজকর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ১.৬ সমাজকর্মের গুরুত্ব

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও জটিল সমাজের সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের পারিবারিক বিশৃংখলা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অপরাধ, কিশোর অপরাধসহ সৃষ্ট অন্যান্য সমস্যা কার্যকর মোকাবিলার লক্ষ্যে সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব হয়েছিল। কালের পরিক্রমায় সমাজকর্মের মাত্রা, গতি ও প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হয়েছে যুগোপযোগী ভিন্নতা। সমাজকর্মের পরিধি ও প্রয়োগমাত্রা বিশ্লেষণ করলেই এর গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়।

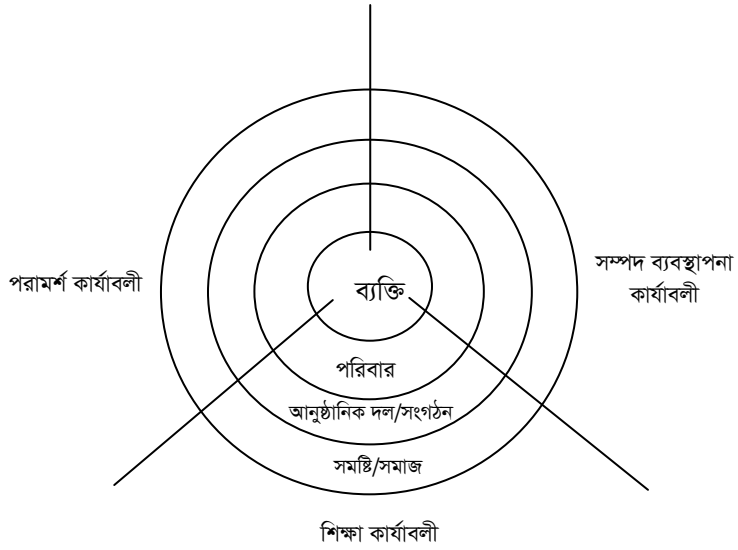
সমাজকর্ম মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার উন্নয়নে পেশাগত সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে পরিকল্পিত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে তাদের নিজস্ব সমস্যা নিজেদেরকেই সমাধানে সক্ষম করে তোলা হয়। সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিকল্পিত প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকর্মীরা বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে, যা যেকোনো সমাজব্যবস্থার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, জ্ঞান ও কৌশলের সমন্বয়ে একটি আধুনিক সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান, যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে কাঙ্খিত সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে। সুতরাং অসুবিধাগ্রস্ত (disadvantaged), দুস্থ (destitute) তথা অনগ্রসর (backward) জনগোষ্ঠীর সমস্যার দীর্ঘ স্থায়ী সমাধানে সমাজকর্ম পেশার আবশ্যকতা রয়েছে। সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, দরিদ্র তথা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা ফলপ্রসূ।

সমাজকর্ম মানবতাবাদী (humanitarian) পেশা হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সম্পদের সুষম বন্টন, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সকলের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সমাজকর্ম পেশা তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজকর্ম পেশা হিসেবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিনির্ভর সেবাদানে বিশ্বাসী। যার ফলে সমাজকর্ম সনাতন ও বদন্যতানির্ভর সেবাদান প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্নধর্মী। সমাজকর্ম পেশায় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরনির্ভরশীল ও পরমুখাপেক্ষী না করে সাবলম্বী ও আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে তোলা হয়, যা প্রতিটি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে সমস্যার গতি, প্রকৃতি ও মাত্রায় পরিবর্তন ও ভিন্নতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুতরাং উন্নত বিশ্বের মনো-সামাজিক সমস্যার ন্যায় উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

K.K. Miley *et al.* (২০০১ : ৮) তাঁদের *"Generalist Social Work Practice : An Empowering Approach"* গ্রন্থে বলেন, æSocial work focuses an releasing human power in individuals to reach their potential and contribute to the collective good of society; social institution, and social policy which in turn, create opportunities for individuals।" তাঁরা সমাজকর্ম পেশার কার্যাবলী একটি চিত্রের সাহায্য তুলে ধরেছেন, যা থেকে ব্যক্তি, পরিবার, দল বা সংগঠন ও সমষ্টি বা সমাজ পর্যায়ে পরামর্শ, সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ও শিক্ষা কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর বহুমুখী ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। নিম্নে চিত্রটি তুলে ধরা হলো :




চিত্র : ১.৬.১ সমাজকর্ম কার্যাবলী

বর্তমানে সমাজকর্মের অনুশীলন বা পেশাগত দিক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেসব দেশে সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি রয়েছে সেসব দেশে সমাজকর্মীরা ডাক্তার-আইনজীবীদের মতো রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে পেশাদার কর্মী হিসেবে সমস্যার সমাধানে মানুষকে সক্ষম করে তোলেন। অসুবিধাগ্রস্ত, সুবিধাবঞ্চিত, পশ্চাদপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্রঋণের ব্যবহার, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া মাদকাসক্তি, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মানব-পাচার, পরিবেশ-জীববৈচিত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ অধিক ফলপ্রসূ। NASW এর মতে æSocial Work is based on humanitarian, democratic ideals. Professional social workers are dedicated to service for the wellfare of mankind, to the disciplined use of a recognized body of knowledge about human beings and their interactions, and to the marshaling of community resources to promote the well-being of all without discrimination।" বস্তুত NASW এর উক্ত উদ্ধৃতি থেকে সমাজকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

## সারসংক্ষেপ

বর্তমান শিল্পসমাজের পরস্পর জটিল ও বহুমুখী সমস্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সমাধানের ক্ষেত্রে গতিশীল ও সাহায্যকারী পেশা হিসেবে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা সমাজস্থ মানুষের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের প্রয়োগ অনস্বীকার্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম প্রধানত কোন ধরনের জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করে?
ক) অসুবিধাগ্রস্ত, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত খ) ধনী, সম্ভ্রান্ত ও সুবিধাপ্রাপ্ত
গ) আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ঘ) বস্তিবাসী

২। সমাজকর্ম সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যার কোন ধরনের সমাধান দিয়ে থাকে?
ক) ক্ষণস্থায়ী ও তাৎক্ষণিক খ) তাৎক্ষণিক ও অসংগঠিত
গ) দীর্ঘস্থায়ী ও সংগঠিত ঘ) ক্ষণস্থায়ী ও অসংগঠিত

# পাঠ-১.৭ সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Social Work Education)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১.৭ সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ১.৭ সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সমাজকর্ম হচ্ছে মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার অভিপ্রায়ে প্রতিশ্রুতিশীল একটি বহুমুখী পেশা। মানবজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পেশাগত মূল্যবোধ ও দক্ষতাভিত্তিক ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সমাজকর্ম শিক্ষা ও তার প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বর্তমান বিশ্বের বহুমুখী সমস্যার বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান করে সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সমস্যা মোকাবিলায় বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান বিশেষভাবে উপযোগী।

সনাতন বদ্যন্যতানির্ভর সমাজকল্যাণ ব্যবস্থায় মানুষের সমস্যার সাময়িক ও তাৎক্ষণিক সমাধানে চেষ্টা চালানো হয়। এতে করে প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমস্যার কোনো সমাধান হয় না বললেই চলে। অন্যদিকে আধুনিক সমাজকর্ম টির্মওর্য়াক অ্যাপ্রোচের (team work approach) মাধ্যমে উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে মানুষের সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়। তাই বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্য, জনসংখ্যাস্ফীতি, নিরক্ষরতা, মাদকাসক্তি, পারিবারিক বিশৃংখলা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মানব পাচার, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে চিকিৎসা, আইন, প্রকৌশল প্রভৃতি পেশার মতো সমাজকর্ম পেশাকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। সেসব দেশে সমাজকর্মে ডিগ্রিধারীরা রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলন করেন; যা সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে এখন পর্যন্ত ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সমাজকর্মে উচ্চশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে মনো-সামাজিক সমস্যা যেমন– দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, হতাশা, মানসিক দ্বন্দ্ব, আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি সমাধানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে আর্থ-সামাজিক সমস্যা যেমন– দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ ইত্যাদি সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে অদ্যবধি আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রায় দুই হাজারের অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে উচ্চ শিক্ষা চালু রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী সমাজকর্মে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। সমাজকর্মে উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জাপানের টোকিওতে কলেজ অব সোশ্যাল ওয়ার্ক নামে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। চীনে ২০০৯ সালে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিভাগ খোলা হয়েছে এবং ২০১২ সাল থেকে ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে; যা সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছে। বাংলাদেশেও উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। বাংলাদেশে পাঁচটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় একশতটির মতো কলেজে সমাজকর্মে স্নাতক প্রোগ্রাম চালু আছে। এছাড়া কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও সমাজকর্ম শিক্ষা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে BCSWE নিয়মিত ভাবে সেমিনার, কনফারেন্স ও জার্নাল প্রকাশ করছে। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## সারসংক্ষেপ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে সমাজের বহুমুখী ও জটিল সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিনির্ভর দীর্ঘস্থায়ী ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বের মনো-সামাজিক সমস্যা এবং উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম শিক্ষার যাত্রার শুরু হয় কখন?
ক) উনবিংশ শতাব্দীর শেষে খ) উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে
গ) বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঘ) বিংশ শতাব্দীর শেষে

২। কলেজ অব সোশ্যাল ওয়ার্ক নামে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কোথায়?
ক) চীন খ) জাপান গ) কোরিয়া ঘ) বাংলাদেশ

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বর্তমানে সমাজকর্মের বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা কে প্রদান করেছেন?
ক) Encyclopedia of Social Work খ) A. T. Morales & B. W. Sheafor
গ) The Dictionary of Social Work ঘ) NASW

২। কোনটি সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য?
ক) মানব সম্পদের উন্নয়ন খ) মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করা
গ) সাম্য, গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা ঘ) সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা

৩। নিচের কোনটি সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য?
i. বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিনির্ভর
ii. সমস্যার সাময়িক সমাধান
iii. ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সমাজকর্মে কোন পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়–
i. ব্যক্তিগত ii. দলগত iii. সমষ্টিগত

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। সমাজকর্ম শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারি–
i. মানুষের সমস্যার কারণ ও সমাধান
ii. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার
iii. সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক দিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

রাহাত সাহেব একটি বিষয় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান খুলে সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানে সংগঠিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি সকল স্তরের মানুষের সামাগ্রিক কল্যাণ আনয়নের ভূমিকা পালন করছেন।

৬। উদ্দীপকে রাহাত সাহেবের পঠিত বিষয় কোনটি?

ক) সমাজকল্যাণ খ) সমাজকর্ম

গ) মনোবিজ্ঞান ঘ) অর্থনীতি

৭। উদ্দীপকে রাহাত সাহেব সকল স্তরের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ আনয়নে ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টা থেকে তার পেশার কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে?

ক) Humanitarian profession খ) Helping profession

গ) Enabling profession ঘ) Value guided profession

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিশ্চিতপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য কবলিত। ফলে তারা মৌলিক-মানবিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। বেসরকারি উদ্যোগে লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি সংগঠন গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগঠিত ও সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা করছে। বর্তমানে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সাবলম্বী হয়ে উন্নত জীবনযাপন করছে।

ক) NASW এর পূর্ণরূপ কি? ১

খ) পেশা বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে কোন বিষয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানের যে শাখার আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার পরিধি বিশ্লেষণ করুন।৪

২। জালাল সাহেব একটি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন। তিনি তার বক্তবে বর্তমান শিল্পসমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যা যেমন– পারিবারিক বিশৃংখলা, সামাজিক বিছিন্নতা, অপরাধ, কিশোর আপরাধ, মাদকাসক্তি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশের দিকটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন।

ক) সমাজকর্ম কোন ধরনের বিজ্ঞান? ১

খ) শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরুন। ৩

ঘ) বর্তমান শিল্পসমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যার সমাধানে সমাজকর্ম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"– উক্তটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ : ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ : ১। খ ২। ক ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ : ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ : ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬ : ১। ক ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৭ : ১। গ ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১ : ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। খ ৭। ক

# সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
## (Historical Background of Social Work Profession)

**ইউনিট ২**

### ভূমিকা


স্যার উইলিয়াম বিভারিজ

আধুনিক সমাজকর্মের জন্মকালের ব্যাপ্তি বেশি দিনের না হলেও মানুষের মধ্যে কল্যাণ বা সেবার মনোভাবের সূত্রপাত ঘটে সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই। মানব সভ্যতার প্রারম্ভেই পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সেবার সহজাত মনোবৃত্তি মানুষকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। আর এ ধরনের কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা থেকেই সমাজকল্যাণের যাত্রা শুরু। এই প্রচেষ্টাই পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও সুসংগঠিত পেশাদার সমাজকর্ম হিসেবে বিকশিত হয়েছে। তবে এর বীজ অংকুরিত হয় মূলত ইংল্যান্ডে। প্রাথমিক পর্যায়ে দানশীলতা থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়, কিন্তু সময়ের আবর্তে মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেবামূলক কার্যক্রম ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় অতিক্রম করে সরকারের হস্তক্ষেপে আইন প্রণয়ন ও নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে একটি স্থায়ী ও বৈজ্ঞানিক রূপরেখা লাভ করে। আর এই সেবামূলক কর্মসূচি পরবর্তিতে আমেরিকায় আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ-২.১ : দরিদ্র আইনের ধারণা
পাঠ-২.২ : সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দরিদ্র আইনের ভূমিকা– ১৬০১, ১৮৩৪, ১৯০৫ এবং ১৯৪২
পাঠ-২.৩ : সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দানসংগঠন সমিতির ভূমিকা ও কার্যক্রম
পাঠ-২.৪ : সমাজকর্ম পেশার বিকাশে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স'র ভূমিকা ও কার্যক্রম
পাঠ-২.৫ : সমাজকর্ম পেশার বিকাশে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'র ভূমিকা ও কার্যক্রম
পাঠ-২.৬ : শিল্পবিপ্লবের ধারণা
পাঠ-২.৭ : আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব
পাঠ-২.৮ : সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা

## পাঠ-২.১ দরিদ্র আইনের ধারণা (Concept of Poor Law)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.১.১ দরিদ্র আইন কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২.১.২ দরিদ্র আইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ২.১.১ দরিদ্র আইন কী?

প্রাক-শিল্পযুগে ইংল্যান্ডে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দরিদ্র সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সুসংগঠিত উপায়ে সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি কার্যক্রমের বেশির ভাগই ছিল শাস্তি ও দমনমূলক। যার ফলে ১৩৪৯ থেকে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে ইংল্যান্ডে

শাসক শ্রেণি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, দমনমূলক পদ্ধতি নয় বরং জনগণের সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। আর এ ধরনের মনোভাবের প্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডে পরবর্তী সময়ে বেশ কতগুলো কার্যকরী আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনগুলো সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের সেবায় নিয়োজিত। সুতরাং বলা যায় যে, দরিদ্র আইন হলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দরিদ্রদের সাহায্যদানের জন্য একটি আইনগত পদক্ষেপ যা ইংল্যান্ডের অসহায় ও দরিদ্র জনগনের অভাব মোচনের জন্য একটি সরকারি অনুশাসনের দৃষ্টান্ত।

### ২.১.২ দরিদ্র আইনের ধারণা

মূলত বিশ শতকের পূর্বে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকাতে সরকার প্রণীত দরিদ্রদের নিয়ন্ত্রণ ও দমনমূলক আইনের সমষ্টি দরিদ্র আইন হিসেবে পরিগণিত হতো। দরিদ্রদের অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক সেবা প্রদান, দরিদ্রদের নিয়ন্ত্রণ অথবা দারিদ্র্য প্রসার প্রতিরোধকল্পে গৃহীত আইনগত সেবা ব্যবস্থাকে দরিদ্র আইন নির্দেশ করা হয়। দরিদ্র আইন দরিদ্রাগার স্থাপন, ত্রাণ ও সাহায্য পাওয়ার যোগ্য ও অযোগ্য হিসেবে দরিদ্র শ্রেণিবিভাগ এবং ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের আইনগত ভিত্তি দান করে।

দরিদ্র আইনগুলোর মধ্যে রাজা অষ্টম হেনরী প্রণীত দরিদ্র আইন, এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন, শ্রমিক আইন এবং দরিদ্র আইন সংস্কার ১৮৩৪ তে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। চতুর্দশ শতকে ইংল্যান্ডে এমন কতগুলো সমস্যার উদ্ভব হয় যা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সামন্ততন্ত্রের অবসান, ভিক্ষাবৃত্তির প্রচলন, কর্মসংস্থানের অভাব, কালো মৃত্যু, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব, শিল্পবিপ্লবের সূচনা প্রভৃতি দারিদ্র্য অবস্থাকে চরম পর্যায়ে উপনীত করে। আর এই সমস্যা মোকাবিলায় ১৩৪৯ সালে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড সর্বপ্রথম শ্রমিক আইন প্রণয়ন করেন। এটা তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান দারিদ্র্য সমস্যার মূলোৎপাটনে গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

ইংল্যান্ডে সরকারি পর্যায়ে দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবিলায় সর্বপ্রথম গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন রাজা অষ্টম হেনরী। ১৫৩১ সালে তিনি যে আইন প্রণয়ন করেন সেটিই অষ্টম হেনরী আইন নামে পরিচিতি। ১৫৩৬ সালে রাজা অষ্টম হেনরী দরিদ্রদের সাহায্য দানের জন্য অপর একটি আইন পাস করে প্রকাশ্যে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করার একটি ভিত্তি স্থাপন করেন। এছাড়াও ১৫৫৩, ১৫৭২, ১৫৭৬ ও ১৫৯৭ সালের আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে সরকারি উদ্যোগে পর্যায়ক্রমে সার্বিকভাবে দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গঠনমূলক সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়।

## সারসংক্ষেপ

দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের অন্যতম বাহক দরিদ্র আইনসমূহ। যদিও ধর্মীয় অনুভূতি ও মানবসেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দানশীলতা ও অন্যান্য সেবাকার্যক্রম প্রচলিত ছিল তথাপি সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যাকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। তাই এসব সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যায় বহুগুণে। এরই ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত হয় দরিদ্র আইনসমূহ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দারিদ্র্য শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

ক) Poor খ) Want

গ) Poverty ঘ) Promotion

২। রাজা অষ্টম হেনরী কত সালে আইন প্রণয়ন করেন?

ক) ১৫৩১ খ) ১৫৩২

গ) ১৫৩৩ ঘ) ১৫৩৪

# পাঠ-২.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দরিদ্র আইনের ভূমিকা– ১৬০১, ১৮৩৪, ১৯০৫, এবং ১৯৪২ সালের আইনসমূহ (Role of Poor Laws in The Development of Social Work Profession- Laws of 1601, 1834, 1905 and 1942)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.২.১ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দরিদ্র আইনের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
২.২.২ ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
২.২.৩ ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
২.২.৪ ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
২.২.৫ ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

## ২.২.১ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দরিদ্র আইনের ভূমিকা

একটি পরিপূর্ণ পেশা হিসেবে সমাজকর্ম একদিনে বিকশিত হয়নি। পেশাদার সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় ইউরোপে আর এর পূর্ণতা ঘটে আমেরিকায়। যদিও পেশাদার সমাজকর্মের কেন্দ্রস্থল আমেরিকা তথাপি সমাজকর্মকে পেশাদার মর্যাদায় উন্নীত করার পেছনে ইংল্যান্ডের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ইংল্যান্ড দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন এবং ভিক্ষাবৃত্তি ও দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য কতিপয় বিশেষ আইন প্রণয়ন করে। এসব আইনের মধ্যে ১৫৩৬, ১৫৭২, ১৫৯৮, ১৬০১, ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইনসমূহের ভূমিকা অন্যতম।

দরিদ্র আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে সরকারি দায়িত্বের স্বীকৃতি ও ভূমিকার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সনাতন সমাজকল্যাণ আধুনিক সমাজের বহুমুখী জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে পেশাদার সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। ধর্মীয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠানাদির পাশাপাশি যেমন দরিদ্র আইনসমূহের বিকাশ ঘটে এবং দরিদ্রদের সাহায্যকার্যে সরকারের পরিকল্পিত পদক্ষেপ ও কর্মসূচির ভিত রচনায় উক্ত আইনসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে তেমনি বিশেষ স্থান দখল করে আছে এবং সমাজকর্মের ইতিহাসে এক বিবর্তনস্বরূপ পেশাগত মান অর্জনে সহায়তা করেছে। ইংল্যান্ডের দরিদ্রদের সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেরিকানরা তাদের দেশে সমাজসেবা শুরু করে। কালক্রমে এই সেবা পেশাগত আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। যার জন্য আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই আইন সমাদৃত।

## ২.২.২ ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন

ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে ক্রমবর্ধমান দরিদ্র সমস্যা সমাধান, ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে ও বেকারত্ব রোধ এবং দুঃস্থদের সহায়তার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনগুলোর মাধ্যমে দরিদ্রদের সাহায্যার্থে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান, তহবিল গঠন, শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট কার্যনীতি, স্থানীয় ইউনিট ও ওভারসিয়ার নিয়োগের মাধ্যমে সাহায্যকার্য পরিচালনা করা হতো। এছাড়া দরিদ্রদের এলাকাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করে সমাজকল্যাণ বা সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনাসহ সক্ষম ভিক্ষুকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজে নিয়োগসহ বহুমুখী কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইংল্যান্ডে ১৩৪৯ থেকে ১৫৯৭ সাল পর্যন্ত প্রণীত বিভিন্ন দরিদ্র আইনের পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি কার্যকরী দরিদ্র আইন ১৬০১ গৃহীত হয়। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এটিই বিখ্যাত ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন নামে পরিচিত।

### ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের বিধানসমূহ ও সাহায্যদান নীতি

ক. সেইসব দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্যদানের তালিকাভূক্তি হতে বিরত রাখা যাদের পরিবার বা সম্পদশালী আত্মীয়স্বজন তাদের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম।
খ. প্যারিশ শুধুমাত্র সেইসব দুঃস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্যদানের জন্য তালিকাভুক্ত করবে যারা প্যারিশের বাসিন্দা অথবা তিনবছর ধরে সংশ্লিষ্ট প্যারিশে বসবাস করছে।
গ. সক্ষম ভিক্ষুক ও স্বচ্ছল আত্মীয় স্বজনসম্পন্ন ভিক্ষুকদের সাহায্য দেয়া ও নেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
ঘ. ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দুঃস্থ ও দরিদ্রদেরকে সাহায্য দানের সুবিধার্থে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় :

১. **সক্ষম দরিদ্র :** এ আইনে যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম কিন্তু কাজ না করে ভিক্ষাবৃত্তি করে তাদেরকে সক্ষম দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এদেরকে ভিক্ষাদানে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং অন্য প্যারিশ (এলাকা) থেকে আগত দরিদ্রদের নিজ প্যারিশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের দরিদ্রদের সংশোধনের জন্য সংশোধনাগার কিংবা শ্রমাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হয় এবং অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কারাগারে প্রেরণ করে শাস্তি দেওয়া হতো।

২. **অক্ষম দরিদ্র :** যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে কোনো কাজ করতে অক্ষম তাদেরকে অক্ষম দরিদ্র বলা হয়। রুগ্ন, বৃদ্ধ, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, শিশুসন্তানসহ মা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ দিয়ে দরিদ্রাগারে রাখা হতো এবং ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হতো। যাদের বাসস্থান ছিলো এবং যদি মনে হতো তাদেরকে স্থানে রেখে ভরণপোষণ কম ব্যয়বহুল তাহলে তাদেরকে ওভারসিয়ার (সরকার নিযুক্ত সমাজকর্মী) এর তত্ত্বাবধানে বহিঃসাহায্য প্রদানের বিশেষত খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হতো।

৩. **নির্ভরশীল বালক-বালিকা :** এতিম, পরিত্যক্ত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তান– যাদের পিতামাতা পলায়ন করেছে বা ভরণপোষণে অক্ষম এ ধরনের দুঃস্থ বালক-বালিকারাই এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ আইনের আওতায় এসব বালক-বালিকাদের ভরণপোষণের ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়। যেমন :

**প্রথমত :** কোনো স্বচ্ছল নাগরিক বিনা খরচে নির্ভরশীলদের দায়িত্ব নেয়ার ইচ্ছাপোষণ করলে শর্তহীনভাবে তাদের নিকট দত্তক দেয়া হতো।

**দ্বিতীয়ত :** অনুরূপ সম্ভব না হলে সবচেয়ে কম খরচে দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হতো।

**তৃতীয় :** আট বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের বালক-বালিকারা যারা গৃহস্থালি বা অনুরূপ কাজের যোগ্য তাদেরকে শিক্ষানবীশ হিসেবে কোনো নাগরিকের নিকট চুক্তিবদ্ধ করে দত্তক দেয়া হতো। এই চুক্তি অনুযায়ী ছেলেরা ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত এবং মেয়েরা ২১ বছর বা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য থাকতো।

### ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইনের তাৎপর্য

ইংল্যান্ড তথা সারাবিশ্বে দরিদ্রদের কল্যাণে গৃহীত প্রথম পরিকল্পিত আইনগত পদক্ষেপ হলো ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে সরকারি দায়-দায়িত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই আইনটির তাৎপর্য বর্তমানেও গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয়। সামন্তসমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ও শিল্পবিপ্লবের পূর্বলগ্নে ইংল্যান্ডে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রণ, ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে নিয়ন্ত্রণ এবং দুঃস্থ অসহায়দের কার্যকরী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রবর্তন করা হয়। সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কর্মী (ওভারসিয়ার) নিয়োগের সূচনাও হয় সম্ভবত এই আইনের মাধ্যমে। অনেকেই ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটিকে পেশাদার সমাজকর্মের জন্ম-ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

### ২.২.৩ ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কার

রাজা অষ্টম হেনরীর ১৫৩১ সালে দরিদ্র আইন প্রণয়ন হতে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে শিল্পায়ন ও শহরায়নের প্রসার, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন, নতুন নতুন দার্শনিক মতবাদ, প্রচলিত দরিদ্র আইনের ব্যর্থতা ইত্যাদি ঘটনার প্রভাবে সমাজ জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গিত অনুভূত হতে থাকে। এছাড়াও এ সময়ে দরিদ্র আইন অনুশীলনের তীব্র বিরোধিতা, দরিদ্র কর সম্পর্কে জনগণের অসন্তুষ্টি, দারিদ্র্যের প্রসার এবং প্রচলিত সাহায্য দান প্রক্রিয়া দরিদ্রদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যার ফলে সরকারকে দরিদ্র আইন প্রণয়নের দুই শতাব্দী পরে এসব আইন সংস্কারের জন্য নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হয়। যার প্রেক্ষিতেই ১৮৩২ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক দরিদ্র আইনসমূহের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা অনুসন্ধান বিষয়ক জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রচলিত দরিদ্র আইনগুলো বাস্তবায়নের দুর্বলতা অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা। কমিশন দীর্ঘ দু'বছর প্রচলিত দরিদ্র আইন প্রশাসন এবং ইংল্যান্ডের প্রতিটি কাউন্টির কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করে ১৮৩৪ সালে দরিদ্র আইন সংশোধন সম্মলিত সুপারিশমালা পেশ করেন। কমিশন প্রচলিত সাহায্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ছয়টি সুপারিশ পেশ করেন। এগুলো হলো :

১. ১৭৯৫ সালের স্পিন হ্যামল্যান্ড এ্যাক্ট কর্তৃক প্রচলিত আংশিক সাহায্য ব্যবস্থার বিলোপ সাধন;

২. সকল সক্ষম ও কর্মক্ষম সাহায্য প্রার্থীকে শ্রমাগারে প্রেরণ করা;

৩. শুধুমাত্র অক্ষম, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও সন্তানসন্ততিসহ বিধবাদের বহিঃসাহায্যের ব্যবস্থা করা;
৪. দরিদ্র আইন ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্যারিশের সাহায্য ব্যবস্থার প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
৫. সাহায্যপ্রার্থীর জীবনমান ও সামাজিক মর্যাদা নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ে রাখা; এবং
৬. রাজা কর্তৃক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা।

১৮৩২ সালে গঠিত রাজকীয় কমিশনের সুপারিশগুলোই পরবর্তীতে ১৮৩৪ সালে ১৪ আগস্ট আইনে পরিণত হয়, যা ইংল্যান্ডের ইতিহাসে ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইনসংস্কার নামে পরিচিত।

### ১৮৩৪ সালের দরিদ্র সংস্কার আইনের বৈশিষ্ট্য

এই সংস্কার আইনেও ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইনের বিধানসমূহের ন্যায় সক্ষম দরিদ্রদের জন্য কঠোর পরিশ্রমের শর্ত আরোপ করা হয়। তাদের সাথে কয়েদিদের ন্যায় আচরণ, মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে দরিদ্রদের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানা হয় এবং তাদের প্রতি কঠোর ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অনেকের মতে এই আইনে দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নের চেয়ে দরিদ্র সাহায্য খাতে ব্যয় হ্রাস করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়।

### ১৮৩৪ সালের দরিদ্র সংস্কার আইনের নীতি

রাজকীয় কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইনসংস্কার কার্যকরীকরণে কর্মযোগ্যতার নীতি, শ্রমাগার পরীক্ষা পুণঃপ্রবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভুক্তকরণ নীতিসমূহকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়াও এই আইনের মাধ্যমে সরকারের দরিদ্র আইন বাস্তবায়নের ব্যয়ভার অনেকাংশে হ্রাস করতে সক্ষম হয়। রোগ প্রতিরোধের জন্য সরকারিভাবে টিকাদানের ব্যবস্থা করা হয়। দারিদ্র্য দূর করা হয় এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে দরিদ্ররা নিজেদের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়।

## ২.২.৪ ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন

ইংল্যান্ডের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সৃষ্ট দারিদ্র্য সমস্যার পাশাপাশি বেকারত্ব সমস্যা বিভিন্ন সময়ে ত্রাণসাহায্য কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ সময় ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের উন্নত প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ইংল্যান্ডের অধিকাংশ জনপ্রিয় কয়লার খনিগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিশাল সংখ্যক শ্রমিক বেকারত্বের শিকার হয়ে পরিবার পরিজনসহ সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। এমতাবস্থায় শ্রমাগার ও বেসরকারি দান সংগঠনগুলোতে অনির্দিষ্টকালীন আশ্রয় ও সাহায্যদানের অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতীয় জরুরি তহবিল গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বেকারত্বের এমন জটিল পরিস্থিতিতে তখনকার ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দরিদ্র আইন সংস্কার ও বেকারদের সহায়তাদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। ফলশ্রুতিতে ১৯০৫ সালে লর্ড জর্জ হ্যামিল্টনকে সভাপতি করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট Royal Commission of the Poor Laws and Relief of Distress গঠন করেন। কমিশন নিচের সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করেন।

১. দরিদ্র আইন ইউনিয়ন ও অভিভাবক বোর্ডের কাউন্টি পরিষদ গঠন এবং স্থানীয় ত্রাণ সাহায্য প্রশাসনের সংখ্যা কমিয়ে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা।
২. প্রচলিত শাস্তিমূলক দরিদ্র সাহায্য কর্মসূচির বিলোপ সাধন করে মানবীয় সরকারি সাহায্য কর্মসূচির প্রবর্তন করা।
৩. মিশ্র দরিদ্রাগারের বিলোপ সাধন করে মানসিক প্রতিবন্ধী ও মানসিক অসুস্থদের হাসপাতালে চিকিৎসা করা এবং শিশুদের দত্তক পরিবার অথবা আবাসিক স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করা।
৫. প্রবীণদের জন্য জাতীয়ভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা, দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে হাসপাতাল সুবিধা, বেকার ও অক্ষমদের জন্য সামাজিক বীমা কর্মসূচি ও বিনামূল্যে সরকারি কর্মসংস্থান সেবা সুবিধা প্রবর্তন করা।

১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের উপর্যুক্ত বাস্তবমুখী সুপারিশমালা ইংল্যান্ডের সমাজসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। দরিদ্রদের সাহায্যদানের চেয়ে নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন

কমিশনের সুপারিশমালার পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডে ১৯০৫ সালের খাদ্য আইন, ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইন, ১৯০৮ সালের বৃদ্ধকালীন পেনশন আইন, ১৯০৯ সালের শ্রমিক বিনিময় আইন, ১৯১১ সালের জাতীয় বীমা আইন, ১৯২৫ সালের বিধবা, এতিম ও বৃদ্ধ পেনশন আইন ও ১৯৩১ সালের জাতীয় অর্থনীতি আইনসমূহ গৃহীত হয় যা দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়।

## ২.২.৫ বিভারিজ রিপোর্ট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাপক সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। ফলে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ একদিকে যেমন জটিলরূপ ধারণ করে। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মতো নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। আর এটা প্রতিরোধের জন্য প্রচলিত সেবামূলক কর্মসূচির পরিকল্পিত ও গঠনমূলক সংস্কার সাধন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। প্রচলিত সমাজসেবার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে একটি বাস্তবমুখী নতুন ধারা প্রবর্তনে ও ফলপ্রসূ সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতির উদ্ভাবনে বিভারিজ রিপোর্ট ইংল্যান্ডের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ১৯৪১ সালে ইংল্যান্ডে তৎকালীন লেবার পার্টির পুনর্গঠন মন্ত্রী আর্থার গ্রীনউড পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্যার উলিয়াম হেনরী বিভারিজ এর নেতৃত্বে সামাজিক বীমা ও সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পর্কিত আন্তঃবিভাগীয় কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির উপর ব্রিটিশ সমাজসেবা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। স্যার উলিয়াম বিভারিজের নামানুসারে এটি বিভারিজ কমিটি নামে খ্যাত। বিভারিজ কমিটি ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে রিপোর্ট পেশ করেন যা সমাজসেবার ইতিহাসে বিভারিজ রিপোর্ট হিসেবে পরিচিত। বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশের মূল লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে অভাবমুক্ত করা এবং কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকসমূহ অপসারণের মাধ্যমে সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। উক্ত রিপোর্টে বিভারিজ সমাজকল্যাণের প্রতিবন্ধক প্রধান ৫টি সমস্যাকে 'পঞ্চ দৈত্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই পঞ্চ দৈত্যসমূহ হলো– অভাব, রোগ-ব্যাধি, অজ্ঞতা, মলিনতা এবং অলসতা। এই পঞ্চ দৈত্যসমূহ মানবসমাজের অগ্রগতিতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। বিভারিজের মতে এ পাঁচটি দৈত্য অপসারণের মাধ্যমেই সমাজের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা যায়।

ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে রিপোর্টে ৫ ধরনের নিরাপত্তা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হয়। এগুলো হলো :

১. একটি একীভূত, সমন্বিত ও পর্যাপ্ত সামাজিক বীমা কর্মসূচি প্রবর্তন করা;
২. জাতীয় বীমার সুবিধা বহির্ভূত জনগণের জন্য জাতীয় কর্মসূচিভিত্তিক সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করা;
৩. প্রথম শিশুর পরবর্তী প্রত্যেক শিশুর জন্য সাপ্তাহিক শিক্ষা ভাতা প্রদান করা;
৪. সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও পূনর্বাসন সেবা প্রদান করা; এবং
৫. অর্থনৈতিক বিপর্যয়কালে ব্যাপক গণবেকারত্ব প্রতিরোধে সরকারিভাবে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল শুধু বিশেষ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন নয় বরং সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা। বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশ মোতাবেক পারিবারিক ভাতা দান, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ও জাতীয় সাহায্য এই তিনটি কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। এই রিপোর্টের মূল বৈশিষ্ট্য হলো জনসাধারণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির প্রবর্তন ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন। সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সমাজজীবনকে আর্থ-সামাজিক মুক্তির দারপ্রান্তে পৌঁছানোর একটি কার্যকরী নকশা প্রণয়ন করে বিভারিজ রিপোর্ট। বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তীতে যেসব সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয় তা হলো :

ক. ১৯৪৫ সালের পারিবারিক ভাতা আইন
খ. ১৯৪৫ সালের জাতীয় বীমা আইন
গ. ১৯৪৬ সালের জাতীয় বীমা (শিল্পদুর্ঘটনা) আইন
ঘ. ১৯৪৬ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা আইন।
ঙ. ১৯৪৮ সালের জাতীয় সাহায্য আইন

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্ট ব্রিটিশ জনগণের অভাব এবং অন্যান্য সামাজিক ক্ষতির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেয় এবং পরবর্তীতে ইংল্যান্ডকে কল্যাণ রাষ্ট্রে রূপান্তরে সহায়তা করে।

## সারসংক্ষেপ

দরিদ্র আইন মূলত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনে সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। সমাজসেবার ক্ষেত্রে এই দরিদ্র আইনসমূহে দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে সময়ের দাবিতে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হলেও পরবর্তীতে দরিদ্রদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি পৃষ্ঠ-পোষকতায় বিভিন্ন সময়োপযোগী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গঠনমূলক সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়। শুধু তাই নয় এসব আইনে দরিদ্র সাহায্যকে সরকারি দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করে নেয়ায় একদিকে যেমন সরকারি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে সমাজসেবার ক্ষেত্রে নতুনমাত্রা সংযোজিত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন রাজা প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করেন?
ক) রাজা অষ্টম হেনরি খ) রাজা জুয়ান কার্লেস
গ) পঞ্চম হেরাল্ড ঘ) তৃতীয় এডওয়ার্ড

২। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৩। কত সালে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন সংস্কার করা হয়?
ক) ১৮৩০ সালে খ) ১৮৩২ সালে
গ) ১৮৩৪ সালে ঘ) ১৮৩৬ সালে

৪. বিভারিজ রিপোর্টে কয় ধরনের নিরাপত্তা সুপারিশ পেশ করা হয়?
ক) ৩ ধরনের খ) ৫ ধরনের
গ) ৭ ধরনের ঘ) ৯ ধরনের

## পাঠ-২.৩ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দান সংগঠন সমিতির কার্যক্রম ও ভূমিকা (Activities and Role of Charity Organization Society in the Development of Social Work Profession)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.৩.১ দান সংগঠন সমিতি কী সে সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

২.৩.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দান সংগঠন সমিতির কার্যক্রম ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ২.৩.১ দান সংগঠন সমিতি কী?

আধুনিক সমাজকল্যাণের বিবর্তনে এবং সমাজকর্মকে পেশার পর্যায়ে উপনীত হতে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার দান সংগঠন আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সনাতন সমাজকল্যাণের ধারাকে পেশাগত মর্যাদা ও বৈজ্ঞানিক রূপ প্রদানে দান সংগঠন সমিতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দানশীলতা মানবসেবার সবচেয়ে প্রাচীন ও সনাতন প্রথা। পূর্বে

সমাজসেবা কার্যক্রম অসংগঠিত উপায়ে পরিচালনা করা হতো। পরবর্তীতে আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সমাজসেবা কার্যক্রম সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যেই ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় উনবিংশ শতাব্দীতে দান সংগঠন আন্দোলন গড়ে উঠে। এই আন্দোলনের ফলেই গড়ে উঠে নতুন সমাজকল্যাণ সংগঠন Charity Organization Society (COS)। দান সংগঠন সমিতি ১৮৬৯ সালে যেমন ইংল্যান্ডের দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায়দের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সাহায্য দানে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ ও ভূমিকা পালন করে তেমনি ইংল্যান্ডের অনুকরণে আমেরিকাতেও ১৮৭৭ সালে দান সংগঠন সমিতি গড়ে উঠে।

## ২.৩.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দান সংগঠন সমিতির কার্যক্রম ও ভূমিকা

পেশাগত সংগঠন যে কোনো পেশার বিকাশ ও উন্নয়নে অপরিহার্য। পেশাদার ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বার্থ সংরক্ষণে পেশাগত সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় সমাজকর্ম পেশার বিকাশে যেসব আন্দোলন ও সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেগুলোর মধ্যে দান সংগঠন সমিতি অন্যতম। ১৮৯৩ সালে এ্যানা এল. ডয়েস শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমাজকর্মে প্রশিক্ষণ দানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৮৯৮ সালে নিউইয়র্ক শহরে সমাজকর্মের উপর প্রথম প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমেই পেশাগত সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে এটি নিউইয়র্ক স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক এ উন্নীত হয়। আর্থ-সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য দান সংগঠন সমিতির স্বেছাসেবকগণকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের প্রয়োজনীয়তা থেকেই পরবর্তীতে এ্যানা এল. ডয়েস সমাজকর্মে প্রশিক্ষণদানের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এভাবেই সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দান সংগঠন সমিতি প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

### ইংল্যান্ডে দান সংগঠন সমিতি

চার্চভিত্তিক সংগঠন এবং মানবহিতৈষী সমিতিগুলোর মধ্যে মতভেদ ও বিবাদ দূরীকরণ এবং সরকারি বেসরকারি সংস্থার কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ১৮৬৮ সালে রেভারেন্ড হেনরি সলি একটি বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৬৯ সালে লন্ডনে "ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ ও ত্রান সংগঠন সমিতি" গঠিত হয়। উক্ত সমিতিকে পরবর্তীতে দান সংগঠন সমিতি নামে পুনঃনামকরণ করা হয়। মূলত দান সম্পর্কিত বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটানো, ব্যক্তিগত ও সরকারি ত্রাণব্যবস্থার সমন্বয়ের উন্নয়ন, অনুকূল পরিবেশে দরিদ্রদের সাহায্য করার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও সেবার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্রদের দরিদ্র দশা থেকে উত্তোরণের জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যেসব মনীষীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁদের মধ্যে স্যার স্টুয়ার্ট লুই, রিচার্ড গ্রীন, ওকটাভিয়া হিল, এডওয়ার্ড ডেনিসন, স্যামুয়েল বানেট উল্লেখযোগ্য।

দান সংগঠন সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন ত্রাণ সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এছাড়াও এই সমিতির উদ্দেশ্য হলো :

১. পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য লন্ডনের বিভিন্ন দান সংগঠন সমিতির কার্যাবলির সমন্বয় সাধন;
২. প্রত্যেক সংস্থাকে সংস্কার কাজের সাথে পরিচিত করা;
৩. সকল সাহায্যদানের বিষয়ে একটি রেজিষ্ট্রি ব্যুরো স্থাপন করা;
৪. বস্তুগত সাহায্যদানের পরিবর্তে দরিদ্রদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে ব্যক্তিগত সেবা প্রদান; এবং
৫. দারিদ্র্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত হওয়া।

### আমেরিকার দান সংগঠন সমিতি

১৮৬১ সালে আমেরিকায় সৃষ্ট গৃহযুদ্ধ মানুষের সামগ্রিক জীবনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ফলশ্রুতিতে ১৮৭৩ সালে অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়। গৃহযুদ্ধের পর ১৮৬৯ সালে মন্দাবস্থা অনেক ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সমষ্টিগত সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে। অবস্থার প্রয়োজনে ইংল্যান্ডে ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত দান সংগঠন সমিতির অনুকরণে আমেরিকাতেও দান সংগঠন আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৭৭ সালে আর. এইচ. গার্টিন নিউইয়র্কের বাফেলো শহরে সর্বপ্রথম Charity Organization Society (COS) প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রধান তিনটি নীতিমালা অনুসরণ করে এই সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হতো :

১. স্থানীয় দান সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে বোর্ড গঠন করে এগুলোর মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা;
২. কেন্দ্রীয়ভাবে দরিদ্রদের গোপনীয় তালিকা প্রস্তুত করা এবং
৩. বন্ধুভাবাপন্ন পরিদর্শকের মাধ্যমে সকল সাহায্যার্থীর সামাজিক অবস্থা তদন্ত সাপেক্ষে সাহায্যের ধরন নিরূপণ করা।

## সারসংক্ষেপ

COS এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় অবদান হলো ইংল্যান্ডে ও আমেরিকাতে আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি স্থাপন ও বিকাশ সাধন। COS এর নীতিমালার আওতায় দরিদ্রদের প্রকৃত অবস্থা তদন্তের স্বার্থে সমাজকর্মের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হয়। এ্যানা এল. ডয়েস সর্বপ্রথম সমাজকর্মে সেবাদানের জন্য COS কর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। সুতরাং বলা যায় COS হলো পেশাগত সমাজকর্মের বিকাশের প্রস্তাবক, ধারক ও বাহক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ইংল্যান্ডে কত সালে COS বা দান সংগঠন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৮৬৯ সালে খ) ১৮৭৩ সালে
গ) ১৮৭৭ সালে ঘ) ১৮৮৩ সালে

২ আমেরিকায় কত সালে COS বা দান সংগঠন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৮৫৯ সালে খ) ১৮৭১ সালে
গ) ১৮৭৫ সালে ঘ) ১৮৭৭ সালে

# পাঠ-২.৪ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স'র কার্যক্রম ও ভূমিকা (Activities and Role of National Association of Social Workers in the Development of Social Work Profession)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.৪.১ ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স কী তা জানতে পারবেন।
২.৪.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে এর কার্যক্রম ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ২.৪.১ ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স কী ?

ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স বা জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি বিশ্বে পেশাগত সমাজকর্মীদের অন্যতম বৃহত্তম পেশাগত সংগঠন। সমাজকর্মের সদস্যনির্ভর এ সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ১৯৯১ সালে ১,৩০,০০০ এর উপর পৌঁছায়, ২০১২ সালে এই সদস্য সংখ্যা হয় প্রায় ১ লাখ ৪৫ হাজার।

সমাজকর্মের প্রথম পেশাগত সংগঠন আমেরিকান এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স ১৯২৯ সাালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষাকে সুসমন্বিত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আমেরিকায় ১৯৫২ সালে জাতীয় সমাজকর্ম শিক্ষা পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদ সমাজকর্মকে একক ও স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠনগুলোকে সমন্বিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পেশাদার সমাজকর্মীদের বৃহৎ সংগঠন জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) ১৯৫৫ সালে আমেরিকার কর্মরত সমাজকর্মীদের বিভিন্ন পেশাগত সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

### ২.৪.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে NASW'র কার্যক্রম ও ভূমিকা

NASW বা জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজকর্ম সেবার প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন; সমাজকর্ম শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন; সমাজকর্ম বিষয়ে জনগণের ধারণা বৃদ্ধি করা; সমাজকর্মীদের বেতন-ভাতাদি, কর্মপরিবেশ ও অবস্থার উন্নয়ন করা; পেশাগত মানদণ্ডের উন্নয়ন ও সমাজকর্মীদের যোগ্যতা প্রত্যায়িত করা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেশা হিসেবে সমাজকর্মের উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো।

সমাজকর্ম অনুশীলনের মান বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে NASW সমাজকর্মের পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড প্রণয়ন করে। ১৯৯৬ সালে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে নৈতিক মানদণ্ড গুলোকে বেশ কয়েকবার সংশোধন করে NASW কর্তৃক গৃহীত মানদন্ডসমূহ সমাজকর্মকে পেশার মর্যাদাদানের পাশাপাশি পেশার মানোন্নয়নে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

পেশাগত কার্যানুশীলনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি একটি আবশ্যকীয় বিষয়। সাধারণত পেশাগত লাইসেন্স বা রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের মাধ্যমে কোনো পেশাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। সমাজকর্মীদের সার্টিফিকেট ও রেজিষ্ট্রেশন প্রদান জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির দায়িত্ব। NASW ১৯৬১ সালে Academy of Certified Social Workers প্রতিষ্ঠা করে। ফলে এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সমাজকর্মীদের পেশাগত মান ও যোগ্যতা উন্নয়নের লাইসেন্স ও পেশাগত সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যেও NASW নিয়মিতভাবে পাঠ্যপুস্তক, জার্নাল এবং রেফারেন্স তথ্যাদি প্রকাশ করছে।

NASW এর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনী ত্রৈমাসিক প্রত্রিকা, "The Social Work"। এছাড়া সংগঠনটি প্রতিবছর Social Work Year Book নিয়মিত প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে "সমাজকর্মের বিশ্বকোষ (Encyclopedia of Social Work) প্রকাশ সমাজকর্ম পেশার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ সমিতির অনন্য অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে বর্তমানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়নে এ সমিতির অবদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের পেশাগত মর্যাদা দানে পেশাদার সংগঠনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পেশাদার সমাজকর্মের নৈতিক মানদন্ড প্রতিষ্ঠায়, সমাজকর্মকে পেশাগত স্বীকৃতি প্রদানে এবং সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ১৯২৯ সালে খ) ১৯৩৯ সালে

গ) ১৯৪৯ সালে ঘ) ১৯৫৯ সালে

২। সমাজকর্মীদের বৃহৎ সংগঠন NASW কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ১৯৪৫ সালে খ) ১৯৫৫ সালে

গ) ১৯৬৫ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

## পাঠ-২.৫ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'র কার্যক্রম ও ভূমিকা (Activities and Role of Council on Social Work Education in the Development of Social Work Profession)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.৫.১ কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন কী তা জানতে পারবেন।

২.৫.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে CSWE এর কার্যক্রম ও ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ২.৫.১ কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন বা CSWE কী?

Council on Social Work Education (CSWE) আমেরিকায় সমাজকর্ম শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের সংগঠন। এর প্রধান কার্যক্রম হলো শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা ও নতুন নতুন সমাজকর্ম কর্মসূচি প্রবর্তন। প্রচলিত সমাজকর্ম কর্মসূচি মূল্যায়ন, সমাজকর্ম শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রকাশনার ব্যবস্থাকরণ ও বিতরণ এবং সমাজকর্ম কর্মসূচি উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ প্রভৃতি। ১৯৫১ সালে CSWE সমাজকর্ম পেশাজীবীদের জন্য ন্যূনতম দুই বছরের মাস্টার্স কোর্সের শর্ত বেধে দেয়।

### ২.৫.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে CSWE এর কার্যক্রম ও ভূমিকা

সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং দক্ষ ও যোগ্য সমাজকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়নে এই কাউন্সিল নেতৃত্ব প্রদান করে চলেছে। এর উদ্দেশ্য হলো সমাজকর্ম শিক্ষার মান প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ। এটি আমেরিকার শিক্ষা দফতরের সহায়তায় কাজ করে। সংস্থাটি প্রতিবছর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সমাজকর্ম শিক্ষা সম্পর্কিত বার্ষিক সভার আয়োজন করে; সমাজকর্ম শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বই, বুকলেট এবং The Journal of Social Work Education প্রকাশ করছে। ১৯৮২ সালে CSWE আমেরিকার পেশাদার সমাজকর্মের curriculum policy statement গ্রহণ করে। যার মধ্যে সমাজকর্ম শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রধান দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। প্রতি দশ বছর পর পর কারিকুল্যাম পলিসি সংশোধন করে সমাজকর্ম পাঠ্যক্রমকে হালনাগাদ করা হয়। সমাজকর্ম শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং পেশাগত অনুশীলনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর প্রকাশনা সার্ভিস বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

CSWE পরিচালিত ক্যাথারিন এ. ক্যানডাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (Katherine A. Kendall Institute for International Social Work Education) বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম শিক্ষার ফেলোশিপ প্রদান করছে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সমাজকর্ম পাঠ দানে CSWE এর অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

### সারসংক্ষেপ

CSWE আমেরিকার পেশাদার সমাজকর্মের একটি অলাভজনক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৫২ সালে জাতীয় পেশাগত সংগঠন হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকর্মের শিক্ষার্থী, পেশাগত সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে CSWE গঠিত।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি সমাজকর্ম শিক্ষার অনুমোদন দেয়?
ক) IFSW খ) UN
গ) UNICEF ঘ) CSWE

২। CSWE কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হয়?
ক) আমেরিকায় খ) ইংল্যান্ডে
গ) জাপানে ঘ) চীনে

# পাঠ-২.৬ শিল্পবিপ্লবের ধারণা (Concept of Industrial Revolution)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১.৬.১ শিল্পবিপ্লব কী তা জানতে পারবেন।

১.৬.২ শিল্পবিপ্লবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

## ২.৬.১ : শিল্পবিপ্লব কী?

শিল্পবিপ্লবকে সহজ ভাষায় শিল্প সংশ্লিষ্ট বিপ্লব বলে অভিহিত করা যায়। বিপ্লব শব্দটি দ্বারা কোনো ক্ষেত্রের মৌল পরিবর্তনকে বুঝায়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্প সংশ্লিষ্ট যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে, যা উৎপাদন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে তাকে বিপ্লব বলাই শ্রেয়। শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবেদীন কাদের বলেন, ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে একটা সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী সামাজিক বিপ্লব বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন বয়ে আনে। আর এ ধরনের পরিবর্তন মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগে দেখা যায়নি। এর ফলে বদলে গেছে পৃথিবীর বাহ্যিক চেহারা, মৌল কাঠামোতে এসেছে পরিবর্তন। মানুষের জীবনাচারণ ও জীবনযাপন রীতিতে এসেছে বিরাট এক ভিন্নতা।

শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে Professor Lady Williams বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নয়ন এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে তার ব্যবহারের ফলে মানব জীবন যাত্রার যে পরিবর্তন এসেছে তাই শিল্পবিপ্লব।

The New Encyclopedia of Britannica তে বলা হয়েছে, শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক হস্তশিল্পনির্ভর অর্থনীতি থেকে যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া; যা অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শুরু হয়ে বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিস্তার লাভ করে।

সমাজকল্যাণ অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, শিল্পবিপ্লব হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনাদি, যা অষ্টদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কারখানা ব্যবস্থায় সূচনা ঘটেছে।

১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী সামাজিক বিপ্লব বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং শিল্প প্রসারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমেই শিল্পবিপ্লবের গতিময়তা বৃদ্ধি পায়। আর শিল্পবিপ্লব প্রত্যয়টির নামকরণ করেন আরনল্ড টয়েনবি।

## ২.৬.২ শিল্পবিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপট, কারণ, ধরন, প্রকৃতি এবং প্রভাব পর্যালোচনায় এর নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে :

১. **প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন** : উৎপাদন, যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে শক্তিচালিত যন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োগ করা হয়।

২. **মানব সভ্যতার দুটি ভাগ** : শিল্পবিপ্লব এর আগে ও পরের মানব সভ্যতার মধ্যে পুরোপুরি সীমারেখা টেনে পৃথক করে দেয়।

৩. **পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ** : সামন্তবাদের স্থলে পুঁজিবাদের প্রতিস্থাপন হয়। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ।

৪. **বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব** : গৃহকেন্দ্রিক ক্ষুদ্রাকৃতির উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বৃহৎ আকারে যন্ত্রচালিত উৎপাদন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়।

৫. **উৎপাদন ব্যয় কম** : শিল্পবিপ্লবের ফলে কায়িক শক্তির পরিবর্তে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার এবং কম সময়ে ব্যাপক উৎপাদনের ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যায়।

৬. **আমূল পরিবর্তন** : উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলে জীবনযাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

৭. **শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি** : কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে দ্রুত শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠে।

৮. **মজুরিভিত্তিক শ্রম** : কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে শ্রমের মজুরি নির্ণীত হয়।

৯. **প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি :** বৃহদায়তন শিল্পের ফলে একই পণ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানে উৎপাদিত হওয়ায় প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

১০. **কৃষির আধুনিকীকরণ :** প্রাচীন আমলের লাঙ্গল জোয়াল আর প্রকৃতিনির্ভর সেচ ব্যবস্থার পরিবর্তে ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার, গভীর নলকূপ ইত্যাদি উদ্ভব হওয়ায় কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রসার ঘটেছে।

## সারসংক্ষেপ

বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব সমাজ ও চিন্তার জগতে আমূল পরিবর্তন, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা, সামাজিক শ্রেণি ও সম্পর্কের উদ্ভব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, পুঁজিবাদী ও গণতন্ত্রের বিকাশ শিল্পবিপ্লবের অন্যতম দিক। এর ফলে মানুষের জীবন-যাপনে আসে আমূল পরিবর্তন। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে বৃহদায়তন শিল্পের। প্রযুক্তির ব্যবহার সহজ করেছে মানুষের জীবনাচরণ এবং সৃষ্টি করেছে প্রতিযোগিতার। ফলে পণ্য উৎপাদনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। শিল্পবিপ্লব প্রত্যয়টির নামকরণ করেছিলেন কে?
ক) আর. টি. শেফার খ) আরলন্ড গ্রিণ
গ) আরনল্ড টয়েনবি ঘ) এস. সি. হান্টিংটন

২। সমাজের অমূল পরিবর্তন সাধিত হয় কেন?
ক) কৃষিবিপ্লবের ফলে খ) শিল্পবিপ্লবের ফলে
গ) নগরায়নের ফলে ঘ) সবুজবিপ্লবের ফলে

## পাঠ-২.৭ আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব (Impact of Industrial Revolution on Socio-economic Life )

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.৭.১ আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৭.২ আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

### ২.৭.১ আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব

শিল্পবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান। শিল্পবিপ্লব এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে মানব আবিষ্কার ও বিভিন্ন প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে করেছে সহজতর, আরামপ্রদ, জীবনযাত্রার প্রণালীতে এনেছে ভিন্নতা, জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ। যদিও শিল্পবিপ্লব অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়; এটি ইতিবাচক ধারায় সমাজস্থ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে মানবকল্যাণের নব দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। নিচে মানবজীবনে শিল্পবিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরা হলো :

১. প্রাক-শিল্প যুগে অর্থনীতি ছিল গৃহকেন্দ্রিক, হস্তশিল্প নির্ভর, উৎপাদন ছিল মূলত নিজেদের চাহিদাকেন্দ্রিক, অর্থনীতি ছিল বদ্ধ, আর শিল্পবিপ্লব বদ্ধ অর্থনীতিকে উন্মুক্ত বাণিজ্যিক রূপে পরিবর্তিত করে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় বাণিজ্য।

২. প্রাক-শিল্প যুগে ছিল বিনিময় প্রথা বিদ্যমান ছিল। অর্থনীতি গতিশীল ছিল না। বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। শিল্পবিপ্লবের ফলে অর্থনীতির বিশ্বায়ন ঘটেছে। এক দেশের সাথে অন্য দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে।

৩. শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের আর্থিক পুঁজিগঠন ও বিনিয়োগে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রেখেছে।

৪. শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুন নতুন আবিষ্কার, উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যের গুণগত মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫. শ্রমের বিশেষায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬. ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে।
৭. শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হয়েছে।
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯. সমাজ ও মানুষের সম্পর্কে নতুন চিন্তা চেতনার উদ্ভব ঘটেছে। সংকীর্ণ জাতিগত বা ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে মানবতাবাদ, গণতন্ত্র, সাম্য, ধর্মনিরেপক্ষতা ইত্যাদি ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়েছে।
১০. আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ঘটেছে।
১১. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে।
১২. শিল্পায়ন ও নগরায়ন অবিচ্ছিন্ন ধারা, শিল্পবিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল শিল্পায়ন, আর শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শহর।
১৩. সামাজিক নিরাপত্তা ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ।

### ২.৭.২ আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব

আগেই বলা হয়েছে, শিল্পবিপ্লব অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে আমূল ইতিবাচক পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা হয়, শিল্পবিপ্লব শুধু আশীর্বাদই নয়, অভিশাপও বটে। নিম্নে নেতিবাচক প্রভাবসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. **শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি :** শিল্পবিপ্লবের ফলে সামন্ত প্রভুদের স্থান দখল করে নেয় পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ; ফলে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এবং এ সম্পর্কে নানামুখী দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সৃষ্টি হয় শ্রেণি বৈষম্যের।
২. **কুটির শিল্পের বিলুপ্তি :** শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে বৃহদায়ন শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে কুটির শিল্পের বিলুপ্তি ঘটে।
৩. **বেকারত্ব সৃষ্টি :** যন্ত্রের আবিষ্কার হস্তনির্ভর কর্মীকে সম্পূর্ণ বেকার করে দেয়। যে কাজ দীর্ঘসময় ধরে কয়েকজন শ্রমিক করত সেটি যন্ত্রের সাহায্যে স্বল্প সময়ে একজন শ্রমিক করতে পারে। ফলে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক বেকারত্ব বরণ করে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে।
৪. **বস্তির উদ্ভব :** শিল্পবিপ্লবের ফল হলো শহরায়ন বা নগরায়ন। আর নগরায়নের সৃষ্টি হলো বস্তি। আবাসিক সংকটের ফলে বস্তির উদ্ভব হয়।
৫. **পরিবেশ দূষণ :** শিল্প কলকারখানার বর্জ্য, কালো ধোঁয়া ও ময়লা-আবর্জনা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ও পরিবেশ দূষণ করে।
৬. **পারিবারিক বিশৃঙ্খলা :** যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গঠন, চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে দেখা দেয় পারিবারিক বিশৃঙ্খলা।
৭. **সাংস্কৃতিক শূন্যতা :** বস্তুগত সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে শিল্পবিপ্লবে সহায়তা করলেও সংশ্লিষ্ট অবস্তুগত সংস্কৃতি অবহেলিত হয়ে পড়ে। ফলে সাংস্কৃতিক শূন্যতা দেখা দেয়, যা সমাজজীবনে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি করে।
৮. **পেশাগত দুর্ঘটনা :** কলকারখানায় যন্ত্র ও শক্তির প্রয়োগ হওয়ায় পেশাগত দুর্ঘটনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
৯. **মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা :** শিল্প দুর্ঘটনা, নিরাপত্তাহীনতা ও বেকারত্বের ফলে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। বিভিন্ন সামাজিক চাপ এবং সমস্যার সৃষ্টি হয়। অসহায়ত্ব ও একাকীত্বের যন্ত্রনা ভোগ করে মানুষ।
১০. **সামাজিকীকরণের অভাব :** শিল্প সমাজব্যবস্থায় পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকল সদস্য ঘরের বাইরে কাজে নিয়োজিত হয়, বিধায় শিশু-সন্তানরা স্নেহ-যত্ন বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং এর ফলে তাদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয়।
১১. **নৈতিক অধঃপতন :** সম্পর্কের চেয়ে সম্পত্তি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণে শিল্পসমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে প্রায় সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা তথা নৈতিক অধঃপতন পরিলক্ষিত হয়।

## সারসংক্ষেপ

শিল্পবিপ্লবের প্রভাব সুদূরপ্রসারিত যা মানবজীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। শিল্পবিপ্লব যেমন মানুষকে উন্নত জীবন ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করেছে তেমনি সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে আধুনিক রূপ দান করেছে। তাই আমরা শিল্পবিপ্লবের ইতিবাচক ও নেতিবাচক রূপ লক্ষ্য করে থাকি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন দেশে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়?
ক) ইংল্যান্ডে খ) ইতালিতে
গ) জার্মানিতে ঘ) ফ্রান্সে

২। শিল্পবিপ্লব কোন শিল্পকে ধ্বংস করেছে?
ক) কুটির শিল্পকে খ) মাঝারি শিল্পকে
গ) বৃহৎ শিল্পকে ঘ) আধুনিক শিল্পকে

৩। শিল্পবিপ্লব কোন অর্থনীতির বিকাশ ঘটায়?
ক) মৌলিক অর্থনীতি খ) পুঁজিবাদী অর্থনীতির
গ) বিকাশমান অর্থনীতির ঘ) সহায়ক অর্থনীতি

## পাঠ-২.৮ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা (Role of Industrial Revolution in the Development of Social Work Profession)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.৮ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ২.৮ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা

শিল্পবিপ্লবের ফলে পৃথিবীর সার্বিক চেহারা বদলে গেছে এবং পরিবর্তন ঘটেছে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি সকল ক্ষেত্রেই শিল্পবিপ্লবের প্রভাব পড়েছে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাব পুরোটাই ইতিবাচক নয়, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। পারিবারিক ভাঙ্গন, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অস্থিতিশীলতা, সামাজিক অসঙ্গতি, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি বিপ্লব পরবর্তী সময়ে বেগবান হয়। এসব সমস্যার যৌক্তিক সমাধান দানশীলতা নির্ভর প্রাচীন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেয়া সম্ভব ছিল না; এবং এরই প্রেক্ষিতে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এবং সুস্থ্য সামাজিক পরিবেশ ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক ও মানসিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্ভব ঘটে আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মের। সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা হলো :

১. **সুসংগঠিত সেবা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা :** নতুন সুসংগঠিত সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বহুমুখী সমস্যা সমাধানে মানবতাবাদী ও ধর্মীয় অনুশাসনভিত্তিক সমাজসেবার পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সুসংগঠিত ও যৌক্তিক সমাজসেবা কার্যক্রম অপরিহার্য হয়ে উঠে। এরই ভিত্তিতে গড়ে উঠে পেশাদার সমাজকর্মের।

২. **সমাজকর্মের ব্যবহারিক শিক্ষার সূচনা :** শিল্পবিপ্লব পরবর্তী মনোসামাজিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সূচনা হয়। ১৯০০ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকার হাসপাতালগুলোতে Richmond ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের শুরু করেন।

৩. **সমাজকর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভব :** সমাজকর্ম বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পেশাদার সমাজকর্মীর চাহিদা পূরণের জন্য New York School of Social Work ও Tata Institute of Social Work এর মতো সমাজকর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রসার লাভ করে।

৪. **মনস্তাত্ত্বিক সমাজকর্মের উদ্ভব :** মানসিক হাসপাতালগুলোতে মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ প্রদানের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। ১৮৩৭ সালে এডওয়ার্ড সেগুয়ান মানসিক রোগীদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. **সমাজকর্ম পদ্ধতির উদ্ভব :** শিল্পবিপ্লবের ফলে উদ্ভূত নানাবিধ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মোকাবিলায় পেশাদার সমাজকর্মের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে।

**৬. অপরাধ বিজ্ঞানের বিকাশ :** শিল্পবিপ্লবের ফলে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

কার্যত শিল্পবিপ্লবের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্যাণকামী মানুষদের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা চিন্তাশীল মানুষের চিন্তার পরিসর বৃদ্ধি করেছে। মানুষ মানুষের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা, আলোচনা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা শুরু করে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সমস্যার গতি-প্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে এক রূপ থেকে অন্যরূপ ধারণ করে। ফলে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় পেশাদার সমাজকর্মীর। কার্যত, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজের সামাজিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সমাজকর্ম পেশাদারিত্ব লাভ করে।

## সারসংক্ষেপ

শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট জটিল ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে সমাজকর্মে পেশাগত শিক্ষা কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে। শিল্পবিপ্লবই সনাতন সমাজকল্যাণ ধারাকে সংগঠিত করে প্রাতিষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত ধারায় রূপান্তরিত করেছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত সমস্যা মোকাবিলায় অধিক যুক্তিযুক্ত উপায় কোনটি?
ক) প্রচলিত সেবা দান সম্প্রসারণ খ) সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
গ) সনাতন পদ্ধতির অনুশীলন ঘ) বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যের অনুশীলন

২। শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট জটিল ও বহুমুখী সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের যে পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে?
i. মৌলিক পদ্ধতি ii. প্রাথমিক পদ্ধতি iii. সহায়ক পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম পেশার সূত্রপাত হয় কোথায়?
ক) ইংল্যান্ডে খ) ভারতে গ) আমেরিকায় ঘ) জার্মানিতে

২। সমাজকর্মকে পেশার মর্যাদায় উপনীত হতে যে আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–
i. ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন
ii. ১৮৩৪ সালের দরিদ্র সংস্কার আইন
iii. ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সুপারিশে প্রণীত আইনসমূহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। নির্ভরশীল শিশু বলা হয়–
i. এতিমদের ii. বেওয়ারিশদের iii. বিকলাঙ্গদের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সমাজকর্মকে পেশার মর্যাদায় উপনীত করতে যে সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে–
i. COS ii. NASW iii. CSWE
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫-৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

সাগর ইংল্যান্ডের প্রথম দরিদ্র আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করে। সে দেখতে পায় এখানে দরিদ্রদেরকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই আইনটি দরিদ্রদের জন্য একটি গঠনমূলক পদক্ষেপ ছিল।

৫। উদ্দীপকে বর্ণিত দরিদ্র আইনটি প্রণীত হওয়ার সাল হিসেবে সমর্থনযোগ্য কোনটি?

ক) ১৩৪৯ সালে খ) ১৩৫২ সালে গ) ১৫০১ সালে ঘ) ১৬০১ সালে

৬। উক্ত আইনে দরিদ্রদেরকে বিভক্তিকৃত শ্রেণির সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৭। উক্ত আইনটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

ক) অধিকার আইন খ) সামাজিক আইন গ) শ্রমিক আইন ঘ) নিরাপত্তা আইন

৮। NASW গঠিত হয় কত সালে?

ক) ১৯৪৫ সালে খ) ১৯৫৫ সালে গ) ১৯৬৫ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

## খ.সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তুলারামপুর ইউনিয়নে অনেক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করে। সবগুলো সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি সাহায্যের পুনরাবৃত্তি রোধ করে। বিভিন্ন সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করে এই সমিতি। আর সমিতির লক্ষ্য হয় বস্তুগত সাহায্যের পরিবর্তে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টির।

ক) আমেরিকায় দান সংগঠন সমিতি গড়ে ওঠে কখন? ১

খ) শিল্পবিপ্লব কীভাবে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়? ২

গ) উদ্দীপকে তুলারামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সমাজকর্মের ইতিহাসের কোন সমিতির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) 'দারিদ্র্য নিরসনে সমাজকর্মের ইতিহাসের উক্ত সমিতি উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে' –উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। অনিদের এলাকায় চাষীরা এখন হালচাষে লাঙ্গল বলদের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার করে। আগে ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করে ঘরে বসে শিল্পদ্রব্য তৈরি হতো। এখন বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করা হয়।

ক) কত সালে দরিদ্র আইন সংস্কার করা হয়? ১

খ) CSWE সম্পর্কে ধারণা দিন। ২

গ) উদ্দীপকে অনিদের এলাকায় কিসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়?– ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) 'অনিদের এলাকায় ঘটে যাওয়া বিষয়টির অবিমিশ্র আশীর্বাদ রয়েছে'– উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ : ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ : ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ : ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ : ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬ : ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭ : ১। ক ২। ক ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮ : ১। খ ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ২ : ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। খ ৭। ঘ ৮। খ

# সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা
## (Values and Principles of Social Work Profession)

**ইউনিট ৩**

### ভূমিকা

'পেশা' বা 'profession' একটি সুপরিচিত শব্দ। সাধারণভাবে জীবনধারণ বা জীবিকা নির্বাহের উপায় বা পন্থাকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা হলেও সকল জীবিকা নির্বাহের উপায় পেশা নয়। কেননা জীবিকা নির্বাহের উপায় বা পন্থাকে বলা হয় বৃত্তি বা occupation। কোনো বৃত্তি তখনই পেশার মর্যাদা লাভ করবে যদি তার সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য, পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, পেশাগত সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ, পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ, জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সামাজিক স্বীকৃতি থাকে। এদিক থেকে সকল পেশাকেই বৃত্তি বলা গেলেও সকল বৃত্তিকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা যায় না। যেমন– রিক্সাচালক হচ্ছেন বৃত্তিজীবী এবং ডাক্তার হচ্ছেন পেশাজীবী। সকল পেশারই পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে, যা তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। সমাজকর্ম পেশার নিজস্ব কিছু পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে, যা পেশাগত অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদায় স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের জন্য সমান সুযোগ, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদি সমাজকর্ম মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ–৩.১ : পেশার ধারণা
পাঠ–৩.২ : পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক
পাঠ–৩.৩ : সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব
পাঠ–৩.৪ : মূল্যবোধের ধারণা ও ধরন
পাঠ–৩.৫ : সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা
পাঠ–৩.৬ : সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা এবং এর গুরুত্ব
পাঠ–৩.৭ : পেশা হিসেবে সমাজকর্ম


## পাঠ-৩.১ পেশার ধারণা (The Concept of Profession)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৩.১.১ বৃত্তি কী তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
৩.১.২ পেশা কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
৩.১.৩ পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন।

### ৩.১.১ বৃত্তি

বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'occupation'। বৃত্তি বলতে জীবন ধারণের সাধারণ উপায় বা অবলম্বনকে বুঝানো হয়। যার জন্য উচ্চতর তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। যেমন– কুলি, মজুর, রিক্সাচালনা, ঘরের কাজ, গৃহপরিচারিকার কাজ ইত্যাদি হচ্ছে বৃত্তির উদাহরণ। বৃত্তিজীবীরা ইচ্ছে করলেই তার বৃত্তি পরিবর্তন করে অন্য কোনো বৃত্তিতে সম্পৃক্ত হতে পারে। যেমন– একজন সক্ষম ভিক্ষুক ইচ্ছে করলেই ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে রিক্সা চালাতে পারে।

### ৩.১.২ পেশার ধারণা

বাংলা পেশা মূলত একটি ফারসি শব্দ। অন্যদিকে পেশার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Profession'। যার অভিধানিক অর্থ জীবিকা বা জীবন ধারণের বিশেষ উপায় (Occupation)। তবে জীবিকা নির্বাহের সকল উপায় বা পন্থা পেশা নয়।

যেমন– রিক্সাচালক ও ডাক্তারের কাজ উভয়ই জীবিকা নির্বাহের উপায় হলেও রিক্সচালকের কাজ বৃত্তি এবং ডাক্তারের কাজ পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা মানবজ্ঞানের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখার উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে সে জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তথা জীবন ধারণের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করলে তা পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে।

মনীষী এ. ই. বেন (A. E. Benn) এর মতে, "পেশা হলো অন্যকে নির্দেশনা, পরিচালনা বা উপদেশ প্রদানের এমন একটি জীবিকা যার জন্য বিশেষ জ্ঞানার্জন করতে হয়।" (Profession is a calling in which one professes to have acquired specialised knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others)

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "পেশা হলো এমন একদল জনগোষ্ঠী যারা নির্দিষ্ট সামাজিক প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণে অভিন্ন সাধারণ মূল্যবোধ, দক্ষতা, কৌশল, জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসরণ ও ব্যবহার করে।" (Profession is a group of people who use a common system of values, skills, techniques, knowledge and beliefs to meet a specific social need.)

এক্ষেত্রে Wilbert E. More তাঁর *æThe Profession : Roles and Rules"* গ্রন্থে পেশার সংজ্ঞায় বলেন "পেশা হলো একটি সার্বক্ষণিক কর্ম, যা সেবাদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সহযোগীদের আলাদা পরিচিতি, বিশেষায়িত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ এবং সেবামুখীতা ও দায়িত্বপালনের মাধ্যমে স্বাতন্ত্রবোধ।"

সুতরাং পেশা বলতে বিশেষ কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য, মূল্যবোধ, বিশেষ নীতি ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বৃত্তিকে বোঝায়, যা সাধারণত জনকল্যাণমূখী এবং পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যে কোনো পেশাকে পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়।

### ৩.১.৩. পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড

কোনো বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের উপায়কে পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে তার মধ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। কোনো বৃত্তি (occupation) পেশার (profession) মর্যাদা অর্জন করেছে কি না তা যেসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হয় সেগুলোকে পেশার মানদণ্ড বলা হয়। পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী আর্নেষ্ট গ্রীনউড (Earnest Greenwood) বৃত্তি সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে পেশার পাঁচটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (atributes) উল্লেখ করেন, তা হলো : ১) সুশৃঙ্খল তত্ত্ব (systematictheory), ২) পেশাগত কর্তৃত্ব (professional authority), ৩) সমাজের স্বীকৃতি (community sanction), ৪) পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড (ethical codes); এবং ৫) পেশাগত সংস্কৃতি বা সংগঠন (professional culture or organization)।

অন্যদিকে Warner Boehm এর মতে, জনকল্যাণমুখীতা, বিজ্ঞানভিত্তিক সুশৃংখল জ্ঞান ও তত্ত্ব, পেশাগত কর্তৃত্ব, সামাজিক স্বীকৃতি ও নৈতিক মানদণ্ড এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য যদি কোনো বৃত্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে সেটিকে পেশা হিসেবে গণ্য করা যায়। মনীষী Charles D. Garvin (১৯৯৮) তাঁর *æSocial Work in Contemporary Society*" গ্রন্থে পেশার বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে এর কতগুলো মানদণ্ড নির্ধারণ করেন। সেগুলো হলো সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা, উপার্জনশীলতা, পেশাগত সংগঠন, পেশাগত নিয়ন্ত্রণ, পরিমাপযোগ্য ও পর্যবেক্ষণযোগ্য ফলাফল, ঝুঁকিপূর্ণদের সংরক্ষণ এবং সমাজের স্বীকৃতি।

সমাজবিজ্ঞানী Willam E. Wickenden বলেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, নৈপূণ্য বা দক্ষতা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া মানসম্মত ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সুশৃঙ্খল নীতিমালা ও মূল্যবোধ, রাষ্ট্র বা সহকর্মীদের দ্বারা পেশাগত মর্যাদা এবং পেশাগত সংগঠন এই ছয়টি হচ্ছে পেশার বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন মনীষীদের প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণ করে পেশার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ডগুলো স্থির করা যায় :

১. **সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি :** প্রত্যেকটি পেশারই সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকতে হয়। যে জ্ঞান হবে প্রচারযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য এবং যা অর্জিত, গঠিত ও বিকশিত হয়। পেশাগত সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি পেশাদার ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালনে সক্ষম করে তোলে।

২. **বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য :** পেশাদার ব্যক্তির জ্ঞান ও যোগ্যতাকে বাস্তবে প্রয়োগের জন্য বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য অর্জন আবশ্যক। পেশাদার ব্যক্তির শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার দক্ষতা ও নৈপূণ্যতা অর্জন করতে হবে। পেশাদার ব্যক্তির এরূপ দক্ষতা অর্জন ও অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করার নৈপূণ্য একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসে।

৩. **পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা :** পেশাগত জ্ঞানকে পেশার উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তির পেশাগত দায়িত্ব। পেশাগত দায়িত্বের সাথে পেশাগত জবাবদিহিতা বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে কোনো পেশার উন্নয়ন ও বিকাশ যথাযথ পেশাগত দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পৃক্ত।

৪. **পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ :** পেশা নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতিমালা নির্ভর হয়ে থাকে। পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা একটি পেশাকে অপর পেশা থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা প্রদান করে। এছাড়া পেশাদার ব্যক্তির পেশাগত আচরণ নিয়ন্ত্রণে এই বৈশিষ্ট্য একান্ত আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন চিকিৎসক ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের আশায় রোগীকে অপ্রয়োজনীয় প্যাথলোজিক্যাল পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে পারেন না। অনুরূপভাবে একজন আইনজীবী বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে একই সঙ্গে উভয়পক্ষকে আইনী সহায়তা দিতে পারেন না।

৫. **পেশাগত নিয়ন্ত্রণ ও পেশাগত সংগঠন :** পেশাগত নিয়ন্ত্রণ যে কোনো পেশার পেশাগত মর্যাদা লাভের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এক্ষেত্রে বিধি-বিধান ও আইনের মাধ্যমে পেশার অন্তর্ভুক্তি, পেশাগত পরিচিতি, অনুশীলন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা উল্লেখযোগ্য। পেশাগত নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ হচ্ছে সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন। পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে পেশার সামাজিক উন্নয়ন, স্বার্থ সংরক্ষণ তথা সার্বিক বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। পেশাগত সংগঠন পেশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত।

৬. **সামাজিক স্বীকৃতি :** রাষ্ট্র বা সমাজকর্তৃক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো বৃত্তি পেশার মর্যাদা লাভ করতে পারে না। এই স্বীকৃতি সাধারণত সার্টিফিকেট, লাইসেন্স অথবা রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

৭. **জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা :** জনকল্যাণকে উদ্দেশ্য করে প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তি আয়ের উৎস হিসেবে তার অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকে। তাই জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা পেশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেমন– চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতার দিকটি লক্ষণীয়।

৮. **ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাস্তবমুখী জ্ঞান :** পেশাদার ব্যক্তির জ্ঞান অবশ্যই বাস্তবমুখী ও প্রয়োগ উপযোগী। এছাড়া প্রত্যেক পেশার পেশা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক পটভূমি বিদ্যমান। যার ফলে প্রতিটি পেশার নিজস্ব ঐতিহাসিক বিবর্তনের ইতিহাস গড়ে ওঠে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ডের আলোকে কোনো বৃত্তি বা জীবিকা পেশা কি না তা নির্ধারণ করা হয়। সেজন্য এগুলোকে পেশার মানদণ্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়।

## সারসংক্ষেপ

পেশা বলতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপূণ্য ও মর্যাদা সম্পন্ন কোনো বৃত্তিকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান নির্ধারিত সময়ে অর্জন করে সে জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে জীবিকা অর্জনের উপায় হচ্ছে পেশা। প্রত্যেক পেশার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট বা মানদণ্ড আছে, যা তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। পেশার বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ড সংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মত বিশ্লেষণ করলে পেশার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ, পেশাগত নিয়ন্ত্রণ ও পেশাগত সংগঠন, সামাজিক স্বীকৃতি এবং ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাস্তবমুখী জ্ঞান হচ্ছে পেশার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড যেগুলোর উপস্থিতিতে কোনো বৃত্তি পেশার মর্যাদা অর্জন করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পেশা শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?

ক) আরবি খ) ফারসি
গ) উর্দু ঘ) বাংলা

২। পেশা শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী?

ক) কাজ খ) জীবিকা
গ) খাদ্য ঘ) ব্যবসা

## পাঠ-৩.২ পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক (Relationship between Profession and Occupation)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৩.২.১ পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.২.২ পেশা ও বৃত্তির পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

### ৩.২.১ পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক

'পেশা' ও 'বৃত্তি' শব্দ দু'টি একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানব সভ্যতার শুরুর দিকে এই দুয়ের মধ্যে ততটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। তখন মূলত জীবিকা নির্বাহের নিমিত্তে যেকোনো কাজকেই পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এছাড়া প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী 'পেশা' ও 'বৃত্তি' একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। বর্তমান সময়ে বিশেষ করে উন্নত দেশে শব্দ দুটোর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করা সম্ভব হলেও আমাদের মতো দেশে সর্বক্ষেত্রে পৃথক করা দুরূহ বিষয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য ও সত্য যে কোনো পেশা বৃত্তি না হয়ে পেশার মর্যাদা লাভ করে না। আবার সকল বৃত্তি পেশার মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে না। তাই বলা হয়, "সকল পেশাই বৃত্তি কিন্তু সকল বৃত্তি পেশা নয়।" যেমন– ডাক্তারী একাধারে বৃত্তি ও পেশা কিন্তু রিক্সাচালানো শুধু একটি বৃত্তি; কখনো পেশা নয়। পেশা ও বৃত্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা যায়, শাব্দিক অর্থে ও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার আলোকে এদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও জীবিকা নির্বাহের অর্থনৈতিক পন্থা হিসেবে দুটির মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

### ৩.২.২ পেশা ও বৃত্তির পার্থক্য

পেশা (profession) বলতে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপূণ্য ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান সম্পন্ন বৃত্তিকে বোঝানো হয়। প্রতিটি পেশার পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধ থাকে যেগুলো এক পেশাকে অন্য পেশা হতে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করে। অন্যদিকে, বৃত্তি (occupation) বলতে জীবন নির্বাহের সাধারণ উপায়কে নির্দেশ করে যার জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞানের আবশ্যকতা নেই। সুতরাং পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

পেশার জন্য নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। পেশার সামাজিক উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক পেশারই পেশাগত সংগঠন রয়েছে। অন্যদিকে বৃত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জনের বাধ্যবাধকতা নেই। বৃত্তির জন্য পেশাগত সংগঠনের আবশ্যকতা নেই। পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রতিটি পেশা পরিচালিত হয়। এসব নীতিমালা ও মূল্যবোধ পেশাদার ব্যক্তিকে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ করে তোলে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে নৈতিক মানদণ্ড বা মূল্যবোধর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলেও তা পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পেশার ক্ষেত্রে জনকল্যাণমুখীতা ও জবাবদিহিতা আবশ্যক। তবে বৃত্তির ক্ষেত্রে জনকল্যাণ ও জবাবদিহিতা

অনুপস্থিত থাকতে পারে। কেননা তা ব্যক্তি নির্ভর হয়ে থাকে। পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সামাজিক স্বীকৃতি; সামাজিক স্বীকৃতি ব্যতীত কল্যাণকামী হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো বৃত্তি পেশার মর্যাদা নাও পেতে পারে।

কোনো পেশাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই পেশা পরিবর্তন করতে পারে না। অন্যদিকে, বৃত্তি সহজে পরিবর্তন করা যায়। যেমন– একজন প্রকৌশলী ইচ্ছা করলেই চিকিৎসক হতে পারবেন না। কিন্তু একজন দিনমজুর ইচ্ছা করলে রিক্সচালক হতে পারবেন। পেশার সঙ্গে দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি জড়িত হলেও বৃত্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যোগ্যতায় বিষয়টি ততটা মুখ্য বিষয় নয়। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে, পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায়, "প্রত্যেক পেশাই বৃত্তি, কিন্তু প্রত্যেক বৃত্তিই পেশা নয়।"

## সারসংক্ষেপ

সকল পেশাই বৃত্তি, তবে সকল বৃত্তিই পেশা নয়। বৃত্তি হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের সাধারণ উপায় বা পন্থা। অন্যদিকে পেশা হলো বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য, সুশৃঙ্খল জ্ঞান, নীতিমালা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন বৃত্তি। যেমন– রিক্সচালানোকে বৃত্তি বলা হবে এবং ডাক্তারীকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা হবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন :

১। নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?
- ক) সকল পেশাই বৃত্তি কিন্তু সকল বৃত্তি পেশা নয়
- খ) সকল পেশা বৃত্তি নয় কিন্তু সকল বৃত্তি পেশা
- গ) সকল বৃত্তিই পেশা কিন্তু সকল পেশা বৃত্তি নয়
- ঘ) সকল বৃত্তিই পেশা ও সকল পেশাই বৃত্তি

২। নিচের কোনটি সর্বজন স্বীকৃত পেশা?
- ক) শিক্ষকতা
- খ) ব্যবসা
- গ) দিনমজুর
- ঘ) রাজমিস্ত্রী

৩. নিচের কোন কাজটি বৃত্তি?
- ক) ওকালতি
- খ) ডাক্তারি
- গ) অধ্যাপনা
- ঘ) দিনমজুরি

## পাঠ-৩.৩ সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব (Characteristics and Importance of Social Work Profession)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৩.৩.১ সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৩.২ সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

### ৩.৩.১ সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য

সমাজকর্ম ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা বহুমুখী পেশা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানব হিতৈষী দর্শন এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধভিত্তিক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য পেশা থেকে পৃথক সত্ত্বা লাভ করেছে।

সমাজকর্ম শুধু একটি পেশাগত প্রচেষ্টা নয়; এটি একটি বিজ্ঞান ও কলা। সমাজকর্ম হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের সেই শাখা যার নিজস্ব সমন্বিত জ্ঞানভাণ্ডার ও পেশাগত মূল্যবোধ রয়েছে এবং যেখানে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষারও সুযোগ রয়েছে।

মানুষ ও তার পরিবেশ এবং সামাজিক ভূমিকার প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজকর্ম অনুশীলনে মানুষকে সামাজিক পরিবেশের আওতায় বিবেচনা করা হয়। মানুষ ও তার সমস্যাকে এককভাবে বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ æTotal person in the total enviroment" এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

সমাজকর্ম সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে একটি বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানবিক (humanitarian) এবং Empowering পেশা হিসেবে স্বীকৃত। ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে সমাজের সার্বিক কল্যাণ আনয়নে সমাজকর্ম প্রয়াস চালায়।

সমাজকর্ম সামাজিক উন্নতি (social betterment) আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে caring, curing এবং changing হচ্ছে সমাজকর্ম পেশার তিনটি বিশেষ দিক। সমাজকর্ম মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক পেশাগত কর্মকাণ্ড, যা সামাজিক হস্তক্ষেপ, সামাজিক উপযোজন, সামাজিক উদ্ভাবন এবং পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন কৌশলের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে।

সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিবর্তন প্রতিনিধি ব্যবস্থা (change agent system), সাহায্যার্থী ব্যবস্থা (client system), লক্ষ্য ব্যবস্থা (target system) এবং কার্যক্রম ব্যবস্থা (action system) পেশাটিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। সমাজকর্ম একটি সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিভিত্তিক পেশা যার পদ্ধতি মূলত দুই ধরনের। যথা– মৌলিক সমাজকর্ম পদ্ধতি এবং সহায়ক সমাজকর্ম পদ্ধতি। ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন হচ্ছে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি। অন্যদিকে, সমাজকর্ম প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম ও সমাজকর্ম গবেষণা হচ্ছে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি।

সমাজকর্ম পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে Charles Zastraw তাঁর *"Introduction to Social Work and Social Welfare"* গ্রন্থে বলেন, æSocial work is distinct from other professions (such as- Psychology and Psychiatry) by virtue of the reponsibility and mandate to provide social service।"

সমাজকর্মের সেবাদান কার্যক্রমে পেশাদার সমাজকর্মীর পাশাপাশি সাহয্যার্থীও সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সক্রিয়, বহুমুখী ও গতিশীল (dynamic) ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সক্ষমকারী, সংযোগকারী, সমন্বয়কারী, মধ্যস্থাকারী, পরামর্শ প্রদানকারী, পরিবর্তনকারীসহ অনুঘটের ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজকর্মী পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে সাহায্যার্থীর মধ্যে কাঙ্খিত ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নে করে যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে তাকে সক্ষম করে তোলে।

সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক (rapport) স্থাপন সমাজকর্ম পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য পেশায় সাহায্যার্থীর সাথে পেশাজীবীর সুনির্দিষ্ট পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন নেই বললেই চলে। সমাজকর্ম অনুশীলনে সাহায্যার্থীর প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন অত্যাবশক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া সাহায্যার্থীর সাথে সমাজকর্মীর এই পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন, সমস্যা অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয়, সমস্যা সমাধান, অনুসরণ ও মূল্যায়ন সকল স্তরে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজকর্ম মূল্যবোধ নিরক্ষেপ নয় বরং মূল্যবোধ নির্দেশিত (value guided) পেশা। সমাজকর্মের নিজস্ব পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের সমান সুযোগ, আত্মপরিপূর্ণতার সুযোগ, সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য, ব্যক্তির প্রতি সমাজের কতর্ব্য, পর্যাপ্ত সুযোগ, আত্মনির্ভরতা, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও জীবন সংক্রান্ত সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে সমাজকর্মের নিজস্ব মূল্যবোধ।

সমাজকর্ম অনুশীলনে শৈল্পিক দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্মীর সহমর্মিতা, আত্মবিযুক্ত ভালবাসা, উষ্ণতা, আন্তরিকতা, সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি, বিচারবোধ ও ব্যক্তিগত ভঙ্গিমা হচ্ছে শৈল্পিক দক্ষতা। বর্তমানে সমাজকর্মের ক্ষেত্র বিকাশ ও প্রসার লাভ করেছে। পরিবার ও শিশুসেবা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন, মানসিক স্বাস্থ্য, কিশোর অপরাধ ও অপরাধ সংশোধন, প্রবীণকল্যাণ, আবসনসহ নানা ক্ষেত্রে সমাজকর্ম অনুশীলন হচ্ছে। এছাড়া মানবিক সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজকর্মের কিছু শাখা যেমন– চিকিৎসা সমাজকর্ম, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম মিলিটারী সমাজকর্ম ও প্রবীণকল্যাণ, যা পেশাটির বৈচিত্র্যময় পরিধি তোলে ধরে।

বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম পেশার বিকাশ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে জাতীয় ও আন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পেশাগত সংগঠন সক্রিয় রয়েছে। সমাজকর্মীদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণে এসব সংগঠনসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এসব সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স, ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক এসোসিয়েশন, সোসাইটি ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এ্যান্ড রিসার্চ, এসোসিয়েশন অব ফ্যামেলী কেস ওয়াকার্স, এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়াকার্স, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স, ইণ্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুলস অব সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং এশিয়া পেসিফিক এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্ক। বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন নামে একটি পেশাদার সংগঠন বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে কার্যকর রয়েছে।

### ৩.৩.২ সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলন তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজকর্ম পেশার উন্নয়ন ও বিকাশে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুলস অব সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং এশিয়া প্যাসিফিক এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশনের মতো সংগঠনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে শিল্পসমাজের পরস্পর জটিল ও বহুমুখী সমস্যার পরিকল্পিত সমাধানে সমাজকর্ম পেশার উত্তরোত্তর প্রসার ঘটছে। বর্তমানে সমাজকর্ম বিশ্বব্যাপী একটি সর্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসেবে স্বীকৃত। সমাজকর্ম সমাজের অবহেলিত, অসুবিধাগ্রস্ত, বঞ্চিত, শোষিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর বাঞ্ছিত পরিবর্তন এবং স্বার্থ সংরক্ষণ তথা জীবনমান উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর প্রয়াস চালায়। ব্যক্তির মূল্যমর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টা হিসেবে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মানবধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নে সমাজকর্মীরা অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, প্রবীনকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ, প্রতিবন্ধীকল্যাণসহ সকল ক্ষেত্রেই সমাজকর্ম পেশার সফল প্রয়োগ লক্ষণীয়। আধুনিক সমাজে সমাজকর্ম একটি অপরিহার্য কল্যাণধর্মী পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বলা যায় যে, বর্তমান সমাজের বহুমুখী জটিল সমস্যার সমাধান ও বিভিন্ন মানুষের কল্যাণ সাধনে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একটি মানবিক ও এ্যাম্পাউয়ারিং পেশা, যা মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে। সমাজকর্ম একাধারে একটি বিজ্ঞান ও কলা হিসেবে caring, curing এবং changing এই ত্রিমুখী লক্ষ্যে এর জ্ঞান, মূল্যবোধ ও দক্ষতা প্রয়োগ করে। সমাজকর্মী পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকে। সামাজিক উন্নতি (social betterment) আনয়নের লক্ষ্যে মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন এবং সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সমাজকর্ম গবেষণা, সামাজিক কার্যক্রম ও সমাজকল্যাণ প্রশাসন প্রয়োগ করে থাকে। সমাজকর্ম কৌশলের মধ্যে রয়েছে সামাজিক হস্তক্ষেপ, সামাজিক উপযোজন, সামাজিক উদ্ভাবন ও পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন, যা সমাজকর্ম পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তাই ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিভিত্তিক প্রচেষ্টা হিসেবে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আধুনিক বিশ্বের জটিল মনো-সামাজিক ও আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের একটি জ্ঞান, পদ্ধতি ও দক্ষতাভিত্তিক প্রয়াস হিসেবে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) সামাজিক হস্তক্ষেপ খ) সাহায্য প্রদান

গ) নির্দিষ্ট জ্ঞান ঘ) নির্দিষ্ট দক্ষতা

# পাঠ-৩.৪ মূল্যবোধের ধারণা ও ধরন (Conccpt and Types of Values)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৩.৪.১ মূল্যবোধ ধারণাটি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩.৪.২ মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৩.৪.৩ মূল্যবোধের ধরন বর্ণনা করতে পারবেন ।

## ৩.৪.১ মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক ও বির্মূত ধারণা, যার মাধ্যমে মানুষের সামাজিক আচার-আচারণের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, মূল্যবোধ হলো সমাজকাঠামোর অপরিহার্য উপাদান, যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-আচারণকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী "মূল্যবোধ হলো সেসব প্রথা, আচরণের মানদণ্ড এবং নীতিমালা যেগুলো কোনো একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, দল অথবা ব্যক্তি প্রত্যাশিত বলে বিবেচনা করে।" (Values are the customs, standards of conduct and principles considered desirable by a culture, a group of people or individuals.)

আরমান্ডো টি. মরেলস ও বি. ডব্লিউ. শিফার (১৯৮৬) মূল্যবোধ সম্পর্কে বলেন, "মূল্যবোধ কর্মকাণ্ডের সুর্নিদিষ্ট কোনো লক্ষ্য নয় বরং লক্ষ্য নির্ণয়ের মানদণ্ড।" (Values are not the concret goals of action, but rather the 'criteria' by which goals are chosen.)

সমাজবিজ্ঞানী আর. এম. উইলিয়াম (R. M. William) এর মতে "মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড যার আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি পরিচালিত এবং যার মানদণ্ডে সমাজস্থ মানুষের কার্যাবলীর ভাল-মন্দ বিচার করা হয়।"

সুতরাং বলা যায়, মূল্যবোধ হলো মানুষের বিশ্বাসবোধ ও আচরণের মানদণ্ড ও যার আদর্শে মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত ও ভাল-মন্দ বিচার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ন্যায়পরায়নতা, সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি হচ্ছে মূল্যবোধ; এবং শ্রমের মর্যাদা, সহযোগিতা, সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ, সামাজিক সাম্য, আইনের শাসন ইত্যাদি হচ্ছে মূল্যবোধের ভিত্তি।

## ৩.৪.২ মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য

মূল্যবোধ সমাজস্থ প্রত্যেক মানুষের জীবন ধারণের নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মূল্যবোধ এক ধরনের বিশ্বাস, যা ব্যক্তি তথা মানুষের সার্বিক বিশ্বাস ব্যবস্থার (total belief system) কেন্দ্রে অবস্থান করে ব্যক্তির করণীয় অথবা মর্যাদা অর্জন সম্পর্কে বিশ্বাসবোধের জন্ম দেয়। বিভিন্ন সংজ্ঞা হতে মূল্যবোধের যে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় তা হলো :

১. মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস ও আদর্শের সমষ্টি;
২. মূল্যবোধ মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে;
৩. মূল্যবোধ একটি অলিখিত সামাজিক বিধান;
৪. মূল্যবোধ মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ বিচার করে;
৫. মূল্যবোধ একটি বিমূর্ত, অলিখিত ও আপেক্ষিক প্রত্যয়;
৬. মূল্যবোধের কোনো সর্বজনীন রূপ নেই– সমাজ ও সময়ভেদে পরিবর্তনশীল।

## ৩.৪.৩ মূল্যবোধের ধরন

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধকে আশ্রয় করে জীবন যাপন করে। সমাজজীবনে মানুষ চার ধরনের মূল্যবোধের মুখোমুখী হয়। যথা– সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও পেশাগত মূল্যবোধ।

**১. সামাজিক মূল্যবোধ :** সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের অন্যতম ভিত্তি, যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ক এবং আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণভাবে বলা যায়, সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেসব নীতিমালা, বিশ্বাস, দর্শন, ধ্যান-ধারণা ও সংকল্প, যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ই. ম্যারিল (Francises E. Meril) তাঁর *"Analysing Social Problems"* গ্রন্থে বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের দলীয় কল্যাণের জন্য আচরণ সংরক্ষণ করা, যা মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে।" সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫)

ব্যাখ্যানুযায়ী, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেসব প্রথা, আচরণগত মান এবং নীতিমালা যেগুলো ব্যক্তি বা কোনো একটি দল বা সংস্কৃতিতে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়।" (Social value is the customs, standards of conduct and principles considered desirable by a culture, a group of people or an individual.) সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তি ও সমাজের অভিন্ন আকাঙ্খার অভিব্যক্তি। আমাদের সমাজের মূলবোধের সাথে যেমন সৌদি আরবের মূল্যবোধের মিল পাওয়া যাবে না, তেমনি করে প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের সমাজের সামাজিক মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের সমাজে কারো সাথে কুশল বিনিময়ে সালাম, নমস্কার অথবা আদাব দেয়া হয়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে good morning, good afternoon অথবা good evening বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি সমাজের মূল্যবোধগত রীতি আরেকটি সমাজ হতে আলাদা করা যায়। সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে বিভিন্ন উপাদান যেমন– ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, স্থানীয় কৃষ্টি, ধর্মীয় বিশ্বাস, যুদ্ধ, সমস্যা, চাহিদা ও সম্পদ প্রভাব বিস্তার করে।

**২. ধর্মীয় মূল্যবোধ :** সাধারণভাবে ধর্মীয় অনুশাসন এবং নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামগ্রিক বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, রীতি-নীতি, আদর্শ, দর্শন, আচার-আচরণ, মতামত ইত্যাদির সমষ্টি হলো ধর্মীয় মূল্যবোধ। মূল্যবোধ হিসেবে ক্রিয়াশীল ধর্মীয় নীতি, নির্দেশনাগুলো সকল ধর্মেই প্রায় অভিন্ন প্রকৃতির। মানবীয় মর্যাদার স্বীকৃতি, সামাজিক দায়িত্ব, শ্রমের মর্যাদা, আর্তের সেবা, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি ধর্মীয় মূল্যবোধ হিসেবে স্বীকৃত।

**৩. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ :** ব্যক্তিগত মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ, যা ব্যক্তির বিশ্বাসবোধ, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও নীতিবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত মূল্যবোধের আলোকে ব্যক্তি তার জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। যেমন– আলম সাহেব ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করেন কিন্তু কালাম সাহেব ভিক্ষুককে ক্ষুদ্র পুঁজি দিয়ে সাহায্য করেন। এক্ষেত্রে দুজনেরই মূল্যবোধ দুস্থ-গরীব ও অসহায়কে সাহায্য করা। তবে দু'জন ভিন্নভাবে সাহায্য করেন।

**৪. পেশাগত মূল্যবোধ :** পেশাগত মূল্যবোধ প্রতিটি পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। পেশার উদ্দেশ্য ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে মূল্যবোধ পেশাগত কার্যক্রমকে স্বক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা হচ্ছে পেশাগত মূল্যবোধ। পেশাগত মূল্যবোধ এক পেশাকে অন্য পেশা থেকে পৃথক সত্ত্বা দান করে। যেমন– 'গোপনীয়তা বজায় রাখা' সমাজকর্ম পেশার একটি মূল্যবোধ।

## সারসংক্ষেপ

মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক ও বিমূর্ত ধারণা, যা মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ বিচারের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। এটি একটি অলিখিত সামাজিক বিধান। মূল্যবোধকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও পেশাগত মূল্যবোধ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মূল্যবোধ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি?

ক) Price খ) Values গ) Value ঘ) Abstract

# পাঠ-৩.৫ সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা (Concept of Social Work Values)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৩.৫ সমাজকর্ম মূল্যবোধ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ৩.৫ সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা (helping profession), যা সাহায্যার্থীর সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা সমৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে প্রাপ্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে থাকে। অন্যান্য পেশার ন্যায় সমাজকর্মেরও কতিপয় পেশাগত মূল্যবোধ রয়েছে, যা সমাজকর্ম মূল্যবোধ নামে পরিচিত। সমাজকর্ম অনুশীলনে পেশাগত মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীর জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার

ভিত্তিতে স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ কিছু মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে, যা পেশাগত আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণত যেসব আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা, মৌলিক নীতিমালা ও স্বীকার্য সত্যের উপর পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলোর সমষ্টিই হলো সমাজকর্ম মূল্যবোধ। সমাজকর্ম মূল্যবোধ সম্পর্কে জুডিথ সেভেন ও অন্যান্যরা তাঁদের *æSocial Work Skill : Demonstrated Begining Direct Practice"* গ্রন্থে বলেন, "সমাজকর্ম একটি অনুশীলনধর্মী পেশা, যা কিছু মৌলিক মূল্যবোধ যেমন– আত্মনিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতায়ন, গোপণীয়তা এবং সকল মানুষের মূল্য ও মর্যাদার বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।" সমাজবিজ্ঞানী চালর্স এ. লেভী (Charles S. Levy) তাঁর *æThe Value Base of Social Work"* গ্রন্থে বলেন, "জনগণের পছন্দ, ফলাফল, তাদের অধিকতর পছন্দের ধারণা ও জনগণের সাথে কাজ করার রীতিগত সমষ্টি হলো সমাজকর্ম মূল্যবোধ।"

সমাজকর্ম একটি মানবকল্যাণমুখী পেশাগত কর্মকাণ্ড। সমাজকর্ম অনুশীলন ও সমাজকর্মীর কাজের পরিধি নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশনা প্রদান ও পেশাগত কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সমাজকর্ম মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি বলা যায়, যেসব আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা, নীতিমালা ও স্বীকার্য সত্যের উপর পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলোর সমষ্টিই হলো সমাজকর্ম মূল্যবোধ। যেমন– ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, ব্যক্তির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের সমান সুযোগ দান, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদি।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে ও পেশাগত কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যেসব আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা, নীতিমালা অনুসরণ করা হয় সেগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে সমাজকর্ম মূল্যবোধ। যেমন– ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম মূল্যবোধ হচ্ছে–
- ক) সমাজকর্মীর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভিত্তি
- খ) সাহায্যার্থীর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভিত্তি
- গ) সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি
- ঘ) সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর আচার-আচরণ পরিচানলনার ভিত্তি

২। নিচের কোনটি সমাজকর্মের মূল্যবোধ?
- ক) সমান সেবাদান
- খ) সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার
- গ) আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ
- ঘ) আচার-আচরণ পরিচালনা

## পাঠ-৩.৬ সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা এবং গুরুত্ব (Values and Ethical Standards of Social Work Profession and Importance)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৩.৬.১ সমাজকর্ম মূল্যবোধের বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩.৬.২ সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩.৬.৩ সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৩.৬.১ সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধের বিকাশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশ শুরু হলেও ১৯২১ সালে পেশার নৈতিক বিধিমালা ও মূল্যবোধ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশার অন্যতম অগ্রদূত ম্যারী ই. রিচমন্ডের

(Mary E. Richmond) ভূমিকা অগ্রগণ্য। সমাজকর্মের নৈতিক বিধিমালা বা মূল্যবোধ প্রণয়নের প্রারম্ভিক প্রয়াস শুরু হয় ১৯২৩ সালে ব্যক্তি সমাজকর্মীদের জন্য একটি নীতিমালা প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে। আর এই নীতিমালার রূপকার ছিলেন ম্যারী ই. রিচমন্ড। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি সমাজকর্মীর নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন করে। এরপর বৃটেন, কানাডা, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়ায় নিজ দেশের অনুশীলনের পেক্ষাপটে সমাজকর্মের মূল্যবোধ প্রণয়ন করা হয়। তবে বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসরণ করা হয়। সময়ের আবর্তে বিভিন্ন সময়ে সমাজকর্মের নৈতিক বিধিমালায় বিভিন্ন পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সংশোধন করা হয় ১৯৭৯ সালে। এরপর ১৯৮৩, ১৯৯০ এবং সর্বশেষ ১৯৯৬ সালে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়।

### ৩.৬.২ সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা

প্রতিটি পেশার ন্যায় সমাজকর্ম পেশারও স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট কতিপয় পেশাগত মূল্যবোধ রয়েছে, যা সেবাদান প্রক্রিয়ার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) সমাজকর্ম পেশার নিম্নোক্ত মূল্যবোধসমূহ উল্লেখ করেছে :

১. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা (Worth and dignty of individual);
২. মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect to people);
৩. পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির সামর্থের মূল্যায়ন (Valuing individual's capacity for change);
৪. সেবাগ্রহণকারীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার (Client self-determination);
৫. গোপনীয়তা (Confidentiality and privacy);
৬. ব্যক্তি মানুষকে তাদের প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ প্রদান (Providing individuals with opportunity to realize their potential);
৭. মানুষের সাধারণ মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা (Seeking to meet individuals common human needs);
৮. সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক ন্যায়-বিচারের অঙ্গীকার (Commitment to social change and social justice);
৯. মৌলিক চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত সম্পদ ও সেবা প্রদানের প্রচেষ্টা (Seeking to provide individuals with adequate services and services to meet their basic needs);
১০. সাহায্যার্থীদের ক্ষমতায়ন (Empowerment of client/empowering client);
১১. সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান (Equal opportunity);
১২. বৈষম্য না করা (Non-discrimination);
১৩. মানব বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect to human diversity);
১৪. অন্যের নিকট পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রচারের সদিচ্ছা (Willingness to transmit professional knowledge and skills to others);

Anmando T. Morales এবং Bradford W. Sheafor (1986) তাঁদের, *æSocial Work : A Profession of Many Faces"* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, æSocial work orginates froms humanitarian ideals and democratic philosophy and has universal application to meet human needs arising from personal-societal interactions and to develop human potential।" তাঁরা সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধসমূহকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করে দেখিয়েছেন যথা– ক) মানুষের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ধারণা হিসেবে মূল্যবোধ (values as preferred conceptions of people); খ) মানুষের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ফলাফল হিসেবে মূল্যবোধ (values as preferred outcomes for people); এবং গ) মানুষের সাথে আচরণের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রক্রিয়া হিসেবে মূল্যবোধ (values as preferred instrumentalities for dealing with people)। নিম্নে সমাজকর্ম পেশার প্রধান মূল্যবোধসমূহ আলোচনা করা হলো :

**১। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি (Recognition of inherent worth and dignity of individuals) :** সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক মূল্যবোধ হচ্ছে প্রতিটি মানুষের সামাজিক মূল্য, সামাজিক সংশ্লিষ্টতা ও সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া। সমাজকর্মীরা প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী। কেননা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিলে ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং গঠনমূলক ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। তাই সমাজকর্মী প্রতিটি ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

**২। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (Rigth to self-determination) :** ব্যক্তির সমস্যা ও তার গভীরতা সম্পর্কে ব্যক্তি নিজেই বেশি অনুভব করতে সক্ষম। সমাজকর্ম অনুশীলনে ব্যক্তির সমস্যার সুষ্ঠু ও নিময়তান্ত্রিক সমাধান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। পেশাগত সম্পর্ক (rapport) স্থাপনের ক্ষেত্রে নীতিটির গুরুত্ব অত্যাধিক। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে নিজ সমস্যা সমাধানের কোনো না কোনো পরিকল্পনা, যা ব্যক্তির মধ্যে থাকে। এ নীতির মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটে। যার আওতায় ধরে নেয়া হয় যে, Client is able to make approriate decisions in relation to rely on others। তবে সমাজকর্মী তার অবস্থানগত মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রেক্ষিতে সাহায্যার্থীকে কোনো কাজ গ্রহণ ও বর্জনে প্রভাবিত করতে পারবেন। কেননা সাহায্যার্থী কখনো আবেগ তাড়িত হয়ে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যা নিজের ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হতে পারে।

**৩। সকলের সমান সুযোগ (Equal opportunity to all) :** জাতি-ধর্ম বর্ণ-বয়স-স্তর নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা সমাজকর্মের অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ। যদি সকলের সমান সুযোগের নিশ্চয়তা সাধন সম্ভব হয়; ব্যক্তি তার সামর্থ্য, দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের, পরিবারের ও সমাজের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এছাড়া ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। সমাজকর্মে সমন্বিত ও সমবেত প্রচেষ্টায় মানুষের মধ্যে স্বাছন্দ্য ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এই মূল্যবোধটি অনুসরণ করা হয়।

**৪। স্বনির্ভরতা অর্জন (Self-reliance) :** সমাজের মানুষকে স্বনির্ভর হতে উদ্বুদ্ধ করা সমাজের অন্যতম মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত। স্বনির্ভর বলতে মূলত আত্মনির্ভশীল হওয়ার প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়। ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা, ক্ষমতা, সুপ্ত প্রতিভা এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা অর্জন পারে। অন্যদিকে, স্বনির্ভর ব্যক্তি নিজের সৃজনশীলতা ও উন্নয়নকে উত্তরাত্তোর সমৃদ্ধিতে রূপন্তরিত করে তুলতে সক্ষম। সমাজকর্ম একটি ফলপ্রসূ ও টেকসই সমস্যা সমাধান প্রয়াসী পেশা যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে স্বনির্ভরতা অর্জন নীতি অনুসরণ করে। যেমন– ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মে নিয়োজিত করে স্বনির্ভর করা।

**৫। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার (Proper utilization of resources) :** সমাজকর্ম একটি গতিশীল পেশা হিসেবে মানুষকে স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম করার মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী ও ফলপ্রসূ সমাধানে প্রয়াসী। এ লক্ষ্যে সাহায্যার্থীকে তার বস্তুগত সম্পদ ও অবস্তুগত সম্পদ তথা অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে।

**৬। গোপনীয়তা (Confidentiality) :** সাহায্যার্থীর প্রদত্ত তথ্য ও তৎপরতা গোপন রাখা সমাজকর্মীর অন্যতম দায়িত্ব। সমাজকর্মীকে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীর অনেক সংবেদনশীল তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়; যা একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয়। অনেক সময় যা প্রকাশ পেলে সাহায্যার্থীর জন্য বিব্রতকর ও ক্ষতিকর হতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে গোপনীয় তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে। যদিও সমাজকর্ম অনুশীলনে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বিরল; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেবাদান কার্যক্রম 'আপেক্ষিক গোপনীয়তা সংশ্লিষ্ট' হয়ে থাকে যা সাহায্যার্থীর আত্মমর্যাদা ও স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক।

**৭। সামাজিক দায়িত্ববোধ (Social responsiblity) :** সামাজিক জীব হিসেবে প্রত্যেক মানুষকে তার ভূমিকা সংশ্লিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। মূলত ব্যক্তি নিজের ও সমাজের উন্নয়নের জন্য যে ভূমিকা পালন করে তার সমষ্টিই হচ্ছে সামাজিক দায়িত্ববোধ। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের নীতিবোধ, বিবেক, বুদ্ধি এবং মহানুভবতা থেকে যেসব দায়িত্ববোধ জন্ম নেয় তাই হচ্ছে সামাজিক দায়িত্ববোধ। যেমন– সমস্যাগ্রস্ত প্রতিবেশীকে সাহায্য করা। সাহায্যার্থীর সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন সামাজিক সুসম্পর্কের সৃষ্টি, অন্যের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান এবং সমস্যা সমাধানে প্রক্রিয়ার স্বক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্ববোধ সমাজকর্মের মূল্যবোধ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

**৮। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Holistic approach) :** সমাজকর্ম অস্থায়ী বা বিছিন্নভাবে কোনো সমস্যার সমাধান না করে স্থায়ী সমাধানে প্রয়াস চালায়। তাই ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সামগ্রিক জীবনধারাকে বিবেচনায় আনে। যেমন– দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য সমস্যা নিরসনে মাত্র ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করলে হবে না। তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন ও স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্যার সমাধান দিতে হবে তাহলে তা স্থায়ী হবে।

উপরোক্ত মূল্যবোধসমূহ সমাজকর্ম পেশার চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন সমাজকর্মী একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে মূল্যবোধসমূহ অনুসরণ করে।

NASW কর্তৃক ১৯৭৯ সালে প্রণীত সমাজকর্মের পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড নীতিমালাগুলো (ethical standard) নিম্নে তুলে ধরা হলো :

**১. পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে সমাজকর্মীর ব্যবহার ও সদাচার (**Conduct and Comportment as a social worker)
ক. সমাজকর্মী হিসেবে ব্যক্তি পর্যায়ে উত্তম আচরণ ও সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।
খ. সমাজকর্মীকে পেশাগত দক্ষতা ও নৈপূণ্য অর্জন এবং পেশাগত অনুশীলনের সাথে কর্ম সম্পাদনে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
গ. সমাজকর্মীকে পেশাগত দায়িত্ব পালনকে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
ঘ. সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে পেশাগত সততা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সমাজকর্মী দায়িত্ব পালন করবে।
ঙ. অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর নির্দেশনায় সমাজকর্মীরা শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত থাকবে।

**২. সাহায্যার্থীর প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব (The social worker's ethical responsibilities to clients)**
ক. সমাজকর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব হলো সাহায্যার্থীর স্বার্থের প্রতি সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া।
খ. সমাজকর্মীর প্রতিটি পদক্ষেপ সাহায্যার্থীর সর্বাধিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রহণ করা।
গ. সাহায্যার্থীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি সমাজকর্মীকে অবশ্যই যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং পেশাগত সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।
ঘ. সমাজকর্মীকে পারিশ্রমিক নির্ধারণের সময় অবশ্যই সততা ও যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হবে তা যেন সাহায্যার্থীর সামর্থ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়।

**৩. সহকর্মীদের প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব (The social worker's ethical responsibility to colleagues)**
ক. সমাজকর্মীরা তাদের সহকর্মীদের প্রতি সম্মান, স্বচ্ছতা, শিষ্টাচার ও বিশ্বস্ততা বজায় রেখে আচরণ প্রদর্শন করবে।
খ. পেশাগত দৃষ্টিকোন হতে সহকর্মীদের কাছে অজ্ঞাত সাহায্যার্থীদের প্রতিও সমাজকর্মীদের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকবে।

**৪. নিয়োগকারী ও নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমাজকর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব (The social worker's ethical responsibility to employers and employing organizations)**
ক. সমাজকর্মী নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন।

**৫. সমাজকর্ম পেশার প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব (The social worker's ethical responsibility to the social work profesion)**
ক. সমাজকর্মীকে অবশ্যই পেশাগত মূল্যবোধ, নৈতিক দায়িত্ব, জ্ঞান, ও লক্ষ্যকে ধারণ করতে হবে।
খ. সমাজকর্মীকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে পর্যাপ্ত সেবাদানে পেশাগত সংস্থাকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।
গ. সমাজকর্মীকে পেশার অনুশীলনে পেশাগত স্বকীয়তা, পেশার উন্নয়ন ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রয়োগে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

**৬. সমাজের প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব (The social worker's ethical responsibility to society)**
ক. সমাজকর্মীকে সমাজের সাধারণ কল্যাণে সচেষ্ট থাকতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, সমাজকর্মীর পেশাগত আচরণ, আশা-আকাঙ্খা, কার্যক্রম, প্রত্যাশা ও ভূমিকা সবকিছুই নৈতিক মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এগুলোকে সমাজকর্মের প্রাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

## ৩.৬.৩ সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালার গুরুত্ব

সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালাসমূহ সমাজকর্ম পেশার প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব মূল্যবোধের আলোকে সমাজকর্মীর আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সমাজকর্মীরা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কল্যাণে কাজ করার প্রেক্ষিতে এসব পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা গড়ে উঠেছে। সমাজকর্ম পেশার সফলতা নির্ভর করে এগুলো যথাযথ অনুশীলনের উপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন সমাজকর্মী একজন ভিক্ষুককে সাহায্যার্থী হিসেবে গ্রহণ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে সাহায্যার্থীকে ভিক্ষুক হিসেবে মূল্যায়ন না করে ব্যক্তি হিসেবে তার পূর্ণ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। তাকে আত্মনির্ভরশীল ও উপার্জনক্ষম হওয়ার জন্য সমাধান প্রক্রিয়ায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়ে সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ সমাধান দেয় হয় যা একজন ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবিন উইলিয়ামস (Robin Williams) সমাজকর্ম অনুশীলনে মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন– ১) মূল্যবোধ ধারণগত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যা অনুভূতি, আবেগ, প্রতিক্রিয়া অথবা তথাকথিত চাহিদার ঊর্ধ্বে। মূল্যবোধ ব্যক্তির তাৎক্ষনিক অভিজ্ঞতার নিয়ত পরিবর্তনেও নিরপেক্ষ থাকে;

২) মূল্যবোধ আবেগীয় প্রেষণা দ্বারা প্রকৃত অথবা প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত হতে পারে; ৩) মূল্যবোধ কার্যক্রমের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়; কিন্তু লক্ষ্য নির্ধারণের উপায় হিসেবে চিহ্নিত এবং ৪) মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ, অতি তুচ্ছ বা নগণ্য নয়।
সমাজকর্ম মূল্যবোধের পাশাপাশি সমাজকর্মের পেশাগত নীতিমালা ও সমাজকর্মীর জন্য অত্যাবশ্যক। এ সকল নীতিমালাগুলো সমাজকর্মীর ব্যবহার ও সদাচার নিয়ন্ত্রণ করে এবং নৈতিক দায়িত্ববোধকে প্রাধান্য দেয়। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীর সর্বাধিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চিয়তা প্রদানে এই নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ। সহকর্মীদের প্রতি সম্মান, স্বচ্ছতা, শিষ্ঠাচার ও বিশ্বাস রক্ষা এবং সাহায্যার্থীর প্রতি পেশাদারী আচরণের নির্দেশনা প্রদানে এই নীতিমালা তাৎপর্যপূর্ণ। আরমাণ্ডো টি. মারলস ও বি. ডব্লিউ. শেফর (১৯৮৬) এর মতে, "সমাজকর্ম একটি মূল্যবোধ পরিচালিত (value guided) পেশা। সমাজসেবা ব্যবস্থায় মূল্যবোধ সমাজকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতার মাঝে ছাঁকনি হিসেবে কাজ করে।" (Social work is a value guided profession. Values becomes a filter between the available knowledge and the skills used by the social worker in providing services)

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি মূল্যবোধ ও নীতিমালা নির্দেশিত পেশাদার কর্মকাণ্ড। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের সমান সুযোগ, স্বনির্ভরতা অর্জন, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার গোপনীয়তা রক্ষা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ হচ্ছে সমাজকর্মের প্রধান মূল্যবোধ। এছাড়া পেশাগত নীতিমালার মধ্যে রয়েছে পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে সমাজকর্মীদের ব্যবহার ও সদাচার, সাহায্যার্থীর প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব, সহকর্মীদের প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব, নিয়োগকারী ও নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমাজকর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব এবং সমাজের প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব। সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে পেশাগত মান অর্জনের চাবিকাঠি হিসেবে এসব পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। NASW কর্তৃক প্রণীত সমাজকর্মের পেশাগত নীতিমালা কয় ভাগে বিভক্ত?
ক) পাঁচ ভাগে খ) ছয় ভাগে গ) সাত ভাগে ঘ) আট ভাগে

২। সর্বপ্রথম কত সালে সমাজকর্ম পেশার নৈতিক বিধিমালা ও মূল্যবোধ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়?
ক) ১৯২০ খ) ১৯২১ গ) ১৯২২ ঘ) ১৯২৩

# পাঠ-৩.৭ পেশা হিসেবে সমাজকর্ম (Social Work as a Profession)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৩.৭.১ পেশাগত মানদণ্ডের আলোকে সমাজকর্ম পেশা কি না তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩.৭.২ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা কি না তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

### ৩.৭.১ পেশাগত মানদণ্ডের আলোকে সমাজকর্ম পেশা

বর্তমানে সমাজকর্ম একটি পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কারো কারো মতে, এটি একটি মানব সেবামূলক পেশা (a human service profession)। তবে অনেকের ধারণা, দান-খয়রাত, সাহায্য-সহায়তার মতো যে কোনো মানব কল্যাণমূলক ও সেবামূলক কাজই সমাজকর্ম। তাদের মতে, অর্থ, সামর্থ্য, সময় ও সদিচ্ছা থাকলে সে কেউই সমাজকর্ম করতে পারে। যে কারণে সমাজকর্মকে স্বতন্ত্র কোনো পেশার মর্যাদা দিতে তাদের আপত্তি রয়েছে। মূলত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দরুন তারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। নিঃসন্দেহে চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা ইত্যাদি পেশার ন্যায় সমাজকর্মও একটি পেশা। কেননা যে সকল মানদণ্ডের নিরিখে একটি জীবিকা বা বৃত্তিকে পেশা বলা হয়ে থাকে, সেই

বিশ্লেষণে সমাজকর্ম একটি পেশা। সমাজবিজ্ঞানী গ্রীনউড (Greenwood) ১৯৫৭ সালে এবং বোয়েহম (Bohem) ১৯৫৯ সালে পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমাজকর্মকে পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে গ্রীণউড বলেন, "প্রত্যেক পেশার যে পেশাগত মানদণ্ডের কথা বলা হয়, সমাজকর্মে তার সবগুলোর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।" সমাজকর্মের পেশাদারিত্ব সম্পর্কে W. A. Friedlander এবং R. Z. Apte বলেন, æSocial work as a profession does hold a major mandate to work toward social betterment through established methods and institusionalized roles।" পেশার পাঁচটি মৌলিক উপাদান যেমন– উদ্দেশ্য (purpose), মূল্যবোধ (values), ক্ষমতাদান (sanctions), জ্ঞান (knowledge) ও দক্ষতা (skills) সমাজকর্মের মধ্যে বিদ্যমান। এছাড়া সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ প্রয়োগ করে সাহায্যার্থীর মধ্যে ইতিবাচক ও পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নে কাজ করে থাকে। নিম্নে পেশার মানদণ্ড বা বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমাজকর্ম কীভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা তা তুলে ধরা হলো :

**১. সুশৃংখল জ্ঞানভাণ্ডার (Systematic body of knowledge) :** প্রত্যেক পেশার মতো সমাজকর্মের সুশৃংখল, সুস্পষ্ট ও প্রচারযোগ্য জ্ঞান (systematic, clarified and transmisible body of knowledge) রয়েছে। সমাজকর্ম অনুশীলনে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধান করে আত্মনির্ভরশীল করার ক্ষেত্রে মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। এছাড়া সমাজকর্মীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে পেশাগত যোগ্যতার অধিকারী হয়।

**২. তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoritical basis) :** সমাজকর্মে বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক তাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে। সমাজকর্ম পেশার অনুশীলনে ও জ্ঞানের সমৃদ্ধিতে এসব তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্মে তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন করে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর সমাজকর্মী হতে হয়। সমাজকর্মের বহুল ব্যবহৃত তত্ত্বগুলোর মধ্যে ব্যবস্থা তত্ত্ব (system theory) ও ভূমিকা তত্ত্ব (role theory) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পেশা হিসেবে সমাজকর্মের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে এসব তাত্ত্বিক ভিত্তি।

**৩. বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতা (Special art & skills) :** সকল পেশার পেশাজীবীদের বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। সমাজকর্মেও দক্ষ ও নৈপূণ্যের অধিকারী সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। একজন দক্ষ সমাজকর্মীর মধ্যে সহমর্মিতা (empathy), আত্মবিযুক্ত ভালোবাসা (non-possessive warmth), আন্তরিকতাসহ (genuiness) কিছু শৈল্পিক বিষয় থাকে যা পেশাগত নৈপূণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

**৪. পেশাগত দায়িত্ব (Professional responsibility) :** পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিটি পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা সমাজকর্মেও বিদ্যমান। বর্তমানে পেশাদার সমাজকর্ম কোনো দরদী বা দানশীল ব্যক্তির পূণ্য অর্জনের নিমিত্তে কোনো কাজ নয়। সমাজকর্মী পারিশ্রমিক প্রাপ্ত একজন পেশাদারকর্মী, যাকে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়।

**৫. পেশাগত মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড (Professional values and code of ethics) :** সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীরা কতগুলো পেশাগত মূল্যবোধ ও নৈতিক বিধিমালা অনুসরণ করে যা তাদের পেশাগত আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে পেশার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের সমান সুযোগ, সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধ। সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠন কর্তৃক প্রণীত পেশাগত নৈতিক বিধিমালা সমাজকর্মীরা অনুসরণ করেন। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম সমাজকর্মের নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন করে।

**৬. পেশাগত সংগঠন (Professional Organization)** : পেশার মানোন্নয়ন ও পেশাজীবীদের সার্থ সংরক্ষণে প্রতিটি পেশার পেশাগত সংগঠন থাকে। সমাজকর্ম পেশার বিস্তৃতি বিকাশ, মর্যাদা রক্ষা তথা মনোন্নয়নের জন্য সকল দেশেই পেশাগত সংগঠন রয়েছে। যেমন– আমেরিকায় National Association of Social Workers (NASW), Council for Social Work Education (CSWE) ও American Association of School Social Work (AASSW), যুক্তরাজ্যে BASW, বাংলাদেশে Bangladesh Council for Social Work Education (BCSWE), ফিলিপাইনে PASWI, অস্ট্রেলিয়ায় Australian Association of Social Worker (AASW), Australian Association for Social Work Education (AASWE) ও Australian Association for Social Work and Welfare Education (AASWWE), জাপানে Japaneese Association of Schools of Social Work, চীনে China

Social Workers Association (CSWA) ও China Association of Social Work Education (CASWE) ছাড়াও International Federation of Social Workers (IFSW), International Association of Schools of Social Work (IASW), APASWE, National Association of School of Social Administnation (NASSA) ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ১৯১৮ সালে আমেরিকায় হাসপাতাল সমাজকর্ম সমিতি গঠনের মধ্যে দিয়ে সমাজকর্মের প্রথম পেশাগত সংগঠনের সূত্রপাত হয়।

**৭. পেশাগত কর্তৃত্ব (Professional authority) :** সমাজকর্ম পেশায় পেশাগত কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব পরায়ণ যা সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় আস্থা আনয়নে বিশেষ উপযোগী। সমাজকর্মী বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ায় পেশাগত কর্তৃত্ব বজায়ে সক্ষম। স্কুল সমাজকর্ম, চিকিৎসা সমাজকর্মসহ অন্যান্য কোনো সমাজকর্মীরা পেশাগত কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ভূমিকা পালন করে।

**৮. জনকল্যাণমুখীতা (Mass welfare) :** সকল পেশারই অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনকল্যাণমুখীতা। সমাজকর্ম জনকল্যাণের সার্বিক দিক নিয়ে কাজ করে থাকে। জনকল্যাণের জন্য সমাজকর্ম পেশা সর্বদা নিয়োজিত। কেননা সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসংগঠিত সেবার মাধ্যমে সর্বাধিক উন্নত ও সুখী সমাজ গঠন করা।

**৯. উপার্জনশীলতা (Income oriented) :** পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপার্জনশীলতা, যা সমাজকর্মের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। সমাজকর্ম কোনো ইচ্ছা নির্ভর বা স্বেচ্ছাভিত্তিক কর্মকাণ্ড নয়। সমাজকর্মীরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সেবা প্রদান করে থাকে। এজন্য সমাজকর্মীকে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও নৈপূণ্য অর্জন করতে হয়। উন্নত বিশ্বে লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সমাজকর্মীরা সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

**১০. পেশাগত স্বীকৃতি (Professional recognition) :** বিশ্বের উন্নত ও কতিপয় উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম পেশার পেশাগত স্বীকৃতি রয়েছে। বর্তমানে আধুনিক উন্নত বিশ্বে সমাজকর্ম একটি গতিশীল ও পূর্ণাঙ্গ পেশার মর্যাদা অর্জন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬১ সালে সমাজকর্মকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, কানাডাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

সার্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, পেশার মানদণ্ডের আলোকে সমাজকর্ম একটি পেশা। সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার প্রাথমিক পর্যায় ছিল বিতর্কমূলক। উল্লেখ্য, সমাজবিজ্ঞানী Abram Flexner (১৯১৫), Ernet Hollis ও Alice Tylor (১৯৫১) প্রমুখ সমাজকর্মকে পূর্ণাঙ্গ পেশাগত মর্যাদা প্রদানে নেতিবাচক অভিমত রাখেন। কিন্তু পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে প্রায় সকল মনীষীর স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, সমাজকর্ম একটি পেশা; কারণ পেশার সকল বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড এটি পূরণ করেছে।

### ৩.৭.২ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা কি না

বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম যে একটি পেশা তা নিয়ে বির্তকের কোনো অবকাশ নেই। তবে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা কি না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে সমাজকর্মের নিজস্ব জ্ঞান ভান্ডার রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পেশাদার সমাজকর্মী তৈরির লক্ষ্যে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, এম.ফিল, ও পিএইচ.ডি. শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োগ করে বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার জন্য সমাজকর্ম শিক্ষায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কমপক্ষে ৬০ কর্মদিবস করে আবশ্যিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। অন্য যে কোনো পেশার চেয়ে সমাজকর্ম অধিক জনকল্যাণমুখী। বাংলাদেশেও সমাজকর্মী দ্বারা যেসব কর্মসূচি পরিচালিত হয় তা সমাজের মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মীরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যথাযথ পেশাগত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধগুলো বাংলাদেশের সমাজকর্মীরা পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনুসরণ করে থাকেন। এছাড়া তারা NASW কর্তৃক ১৯৬০ সালে নির্ধারিত পেশাগত নীতিমালা বা বিভিন্ন নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলেন। তবে বাংলাদেশে BCSWE ব্যতীত তেমন কোনো পেশাগত সংগঠন নেই। এছাড়া বিভিন্ন কারণে সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে এখনও পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। বাংলাদেশে সমাজকর্ম প্রায় সবগুলো বৈশিষ্ট্যপূরণ করলেও জোরালো পেশাগত সংগঠন ও সামগ্রিক স্বীকৃতি না পাওয়ার ফলে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা বলা যায় না। তবে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশার স্বীকৃতি লাভ করবে।

## সারসংক্ষেপ

বর্তমানে সমাজকর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃত। কেননা পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ডের আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, অন্যান্য পেশার মত সমাজকর্মও সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সমাজকর্ম সুশৃংখল জ্ঞানভাণ্ডার, তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতা, পেশাগত দায়িত্ব, পেশাগত কর্তৃত্ব, জনকল্যাণমুখীতা, উপার্জনশীলতাসহ সকল বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ায় পেশাগত স্বীকৃতি রয়েছে। তাই সমাজকর্ম নিঃসন্দেহে একটি পেশা। বাংলাদেশে শক্তিশালী পেশাগত সংগঠন ও সামাজিক স্বীকৃতি তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অভাবে পেশার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পূরণ করা সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে আশা করা যায় সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্মের অবস্থান কি?
ক) পেশাগত স্বীকৃতি প্রাপ্ত খ) পেশাগত স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয়
গ) পেশাগত স্বীকৃতি লাভের পর্যায়ে ঘ) পেশাগত স্বীকৃতি পাবে না

২। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা না হওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধকতা কোনটি?
ক) পেশাগত সংগঠনের অভাব খ) রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অভাব
গ) পেশাগত নীতিমালার অভাব ঘ) তাত্ত্বিক ভিত্তির অভাব

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সমাজে মানুষের আচরণের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে কোনটি?
ক) সামাজিক মূল্যবোধ খ) ধর্মীয় মূল্যবোধ গ) রাজনৈতিক মূল্যবোধ ঘ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

২। Armando T. Morales এবং Bradford W. Sheafor সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধকে কয়টি ধারায় বিভক্ত করেছেন?
ক) দুইটি খ) তিনটি গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

৩। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) প্রণীত সমাজকর্মের মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে–
i. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি ii. মানব বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন
iii. সুবিধাভোগীদের ক্ষমতায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সমাজবিজ্ঞানী Earnest Greenwood পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন–
i. সুশৃংখল জ্ঞান ভাণ্ডার
ii.পেশাগত কর্তৃত্ব
iii. পেশাগত সংস্কৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে–
i. পেশা হতে হলে বৃত্তি হতে হবে ii. সকল পেশাই বৃত্তি iii. সকল বৃত্তিই পেশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। সমাজকর্ম পেশা গুরুত্বপূর্ণ–
i. সমস্যার কার্যকর সমাধানে
ii. সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করায়
iii. কাঙ্খিত ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

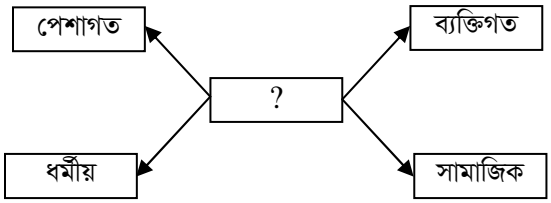
৭। সমাজকর্ম পেশা ও সমাজকর্মীর আচরণ-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে–

i. পেশাগত মূল্যবোধ ii. নীতিমালা iii. সংগঠন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**নিচের উদ্দীপটি পড়ুন এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**




৮। উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?

ক) আদর্শ খ) নীতিমালা গ) মূল্যবোধ ঘ) প্রথা

৯। উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে প্রত্যয়টির গুরুত্ব হলো–

i. ভালো-মন্দ নির্ধারক

ii. আচার-আচরণ পরিচালনা

iii. নৈতিক ও অনৈতিক দিক নির্ধারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

মাহমুদা আক্তার ঢাকা মেডিকেলের সমাজসেবা বিভাগে সমাজকর্মী হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হাসপাতালে দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের সাহায্য প্রদান করেন। কিন্তু তিনি প্রায়ই সাহায্যার্থীর সাথে খারাপ আচরণ করেন এবং আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগ করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ তাকে নোটিশ দিয়েছে।

১০। মাহমুদা আক্তারের আচরণে সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধটির অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়?

ক) ব্যক্তির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার খ) ব্যক্তির সমান সুযোগ দান

গ) ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি ঘ) সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

১১। উদ্দীপকটিতে সমাজকর্মের কোন শাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ক) সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্ক খ) স্কুল সোশ্যাল ওয়ার্ক

গ) মেডিকেল সোশ্যাল ওয়ার্ক ঘ) ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

ঊষা একজন গৃহিণী। তিনি তার চার সন্তান রাঙ্গা, ফুলু, শিলু ও রানাকে পড়ালেখা করিয়েছেন। তার স্বামী বিভু খুব একটা শিক্ষিত নন। তিনি একজন ব্যবসায়ী। ঊষার দুই সন্তান রাঙ্গা ও ফুলু শিক্ষকতা করেন। শিলু ও রানা ব্যাংকে কর্মরত আছে। ঊষাকে সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করে মণি নামের একটি মেয়ে। বিনিময়ে মণিকে প্রতি মাসে এক হাজার পাঁচশত টাকা দেয়া হয়।

১২। উদ্দীপকটিতে কাদের কাজকে বৃত্তি বলা হবে?

ক) ঊষা ও মণি খ) ঊষা, মণি ও বিভু গ) মণি ও বিভু ঘ) ঊষা ও বিভু

১৩। উক্ত কাজকে কেন বৃত্তি বলার কারণ–

i. বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতায় অভাব

ii. পেশাগত সংগঠনের অবশ্যকতা নেই

iii. জনকল্যাণমুখী নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৪। অরুন্ধতী একজন ব্যক্তি সমাজকর্মী হিসেবে টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে কর্মরত আছেন। তিনি উক্ত কেন্দ্রের নিবাসীদের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন না। তিনি প্রয়োজন মোতাবেক নিবাসীদের স্বাধীনতা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে অরুন্ধতী সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধটি অনুশীলন করছেন।

ক) স্বনির্ভরতা খ) ব্যক্তি মর্যাদার স্বীকৃতি গ) সকলের সমান সুযোগ দান ঘ) আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার

১৫। প্রফেসর ড. মোঃ আবুল হোসেন স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের ক্লাসে একটি বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। তিনি বিষয়টির ধারণা দিতে গিয়ে বলেন যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণ আচার, ব্যবহার ও রীতিনীতিকে পরিচালিত করে এবং সমাজভেদে পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক। বিষয়টি কী ?

ক) আদর্শ খ) নীতিমালা গ) মূল্যবোধ ঘ) সংস্কৃতি

**খ. সৃজনশীল**

১। নাসিমা আক্তার একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত অসহায় নারীদের নিয়ে কাজ করেন। মুনিরা বেগম একজন সেবাগ্রহীতা। তিনি তার দাম্পত্য জীবনের অনেক কথা নাসিমা আক্তারের কাছে বলেন। নাসিমা আক্তার বিষয়টি গোপন রাখেন এবং মুনিরা বেগমকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে সমাজে পুনর্বাসন করেন। ফলে মুনিরা বেগম তার জীবনের মূল স্রোতধারায় ফিরে এসেছেন। কেননা বর্তমানে সমাজ তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

ক) Rapport শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি? ১

খ) বৃত্তি বলতে কী বুঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে নাসিমা আক্তার কর্তৃক সেবাগ্রহীতায় সমস্যা সমাধানে প্রয়োগকৃত মূল্যবোধটির বর্ণনা দিন। ৩

ঘ) সেবাগ্রহীতার সমস্যা সমাধানে নাসিমা আক্তার আর কোন মূল্যবোধগুলো প্রয়োগ করেছেন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। অপূর্ব পাল এমবিবিএস পাশ করে একটি সরকারি হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি রোগীদের রোগ নিরাময়ে তার অর্জিত বিষয়ের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করেন। তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের একজন সদস্য। অন্যদিকে বাচ্চু মিঞা একজন ব্যবসায়ী। সে মুরগীর ডিম ও মুরগী বিক্রি করে তার জীবিকা নির্বাহ করেন।

ক) মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ লিখুন। ১

খ) সমাজকর্ম মূল্যবোধ বলতে কী বুঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত অপূর্ব পাল ও বাচ্চু মিঞার কাজের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন। ৩

ঘ) অপূর্ব পাল ও বাচ্চু মিঞার কাজের বৈসাদৃশ্যসমূহ উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ : ১। ক ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ : ১। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ : ১। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ : ১। ক ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৩ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ক ৮। গ ৯। ঘ ১০। গ ১১। গ ১২। ক ১৩। ক ১৪। ঘ ১৫। গ

# সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ
# (Concepts Related to Social Work )

**ইউনিট ৪**

## ভূমিকা

সাধারণ অর্থে প্রত্যয় বলতে কোনো কল্পনাকৃত ধারণা বা বিশ্বাসকে বোঝায়। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রত্যয় হলো তত্ত্বের অধীনস্ত বিষয়-ধারণা। সামাজিক তত্ত্বসমূহ বিভিন্ন প্রত্যয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কগত পর্যালোচনার ভিত্তিতেই কোনো সামাজিক বিষয়ের তত্ত্ব গঠিত হয়। সুতরাং একটি একাডেমিক বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভের জন্য সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেননা আধুনিক সমাজকর্মের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি অনুধাবনে এবং পেশাগত অনুশীলনে এ প্রত্যয়গুলোর জ্ঞান আবশ্যক।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ-৪.১ : সমাজকল্যাণের ধারণা
পাঠ-৪.২ : সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ-৪.৩ : সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ
পাঠ-৪.৪ : সমাজকর্ম ও সমাজসেবা
পাঠ-৪.৫ : সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তা
পাঠ-৪.৬ : সমাজকর্ম ও সামাজিক পরিবর্তন
পাঠ-৪.৭ : সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন
পাঠ-৪.৮ : সমাজকর্ম ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
পাঠ-৪.৯ : সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার
পাঠ-৪.১০ : সমাজসংস্কার আন্দোলন– সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ ও নারী শিক্ষা


## পাঠ-৪.১ সমাজকল্যাণের ধারণা (Concept of Social Welfare)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৪.১ সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।

### ৪.১ সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা

সমাজবদ্ধ জীবনযাপন থেকেই মানবকল্যাণ তথা সমাজকল্যাণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আর এর সাথে যুক্ত হয় ধর্মীয় অনুপ্রেরণা। বস্তুত অপরের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতি এবং ধর্মের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দরিদ্র অসহায় অক্ষম মানুষকে সহযোগিতার মনোভাব থেকেই ধীরে ধীরে সমাজকল্যাণ বৃহত্তর পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতিতে সমাজকাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে সেবা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রও পরিবর্তিত হয়। আর এর ফলে ধীরে ধীরে প্রয়োজন অনুভূত হয় আধুনিক সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার। মূলত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তিত নতুন নতুন ও জটিল সমস্যার সমাধানে বিকাশ ঘটে পেশাগত সমাজকর্মের। সমাজকল্যাণ সমাজকর্মের সনাতন রূপ আর সমাজকর্ম সমাজকল্যাণের পরিশীলিত বৈজ্ঞানিক রূপ। সমাজকল্যাণের ধারণা পেতে হলে অবশ্যই কতগুলো সংজ্ঞার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। W. A. Friedlander তাঁর *æIntroduction to social Welfare"* গ্রন্থে

বলেন, সমাজকল্যাণ হলো সমাজসেবা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের এমন এক সংগঠিত (সাহায্য) পদ্ধতি যা ব্যক্তি ও দলকে সন্তোষজনক স্বাস্থ্য ও জীবনমান লাভ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক অর্জনে সহায়তা করে, যা তাদের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম করে তোলে।

Robert L. Barker সম্পাদিত "*The Social Work Dictionary*" তে বলা হয়েছে, সমাজকল্যাণ হলো একটি দেশের বিভিন্ন কর্মসূচি, সুযোগ-সুবিধা ও সেবার একক ব্যবস্থা যা মানুষের ঐসব সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যগত চাহিদা পূরণে সহায়তা করে যেগুলো সমাজ সংরক্ষণের জন্য মৌলিক বলে বিবেচিত।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোতে সমাজকল্যাণের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ঘটে। শুধু ব্যক্তি, দল, সমষ্টি নয় গোটা সমাজের মানুষের কল্যাণে সমাজকল্যাণ নিয়োজিত।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকল্যাণ যেমন একটি সংগঠিত সাহায্য ব্যবস্থা তেমনি এটি একটি সুসংঘবদ্ধ জ্ঞানের শাখা বা পাঠ্য বিষয়। সমাজকল্যাণ একটি সমন্বিত বিষয়। বিভিন্ন জ্ঞান ও বিষয়ের সমারোহে এটি সমৃদ্ধ। এটি প্রধানত একটি বাস্তবধর্মী, কর্মমুখী এবং অনুশীলনধর্মী বিষয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। Welfare অর্থ কী?

ক) সমাজ খ) সেবা

গ) নিরাপত্তা ঘ) কল্যাণ

২। W. A. Friedlander এর বইয়ের নাম কী?

ক) Introduction to Social Welfare খ) Social Work Dictionary

গ) Social Work Year Book ঘ) Society Today

## পাঠ-৪.২ সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goals and Objectives of Social Welfare)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৪.২ সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

### ৪.২ সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মঙ্গলজনক অবস্থা সৃষ্টি করা। এ প্রসঙ্গে W. A. Friedlander এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হলো প্রতিটি মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ, সুস্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান অর্জন, অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন না করে সকল নাগরিকের সমান অধিকার এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আত্মমর্যাদা, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার নিশ্চায়তা বিধান করা।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা এবং সমাজকল্যাণের অন্যান্য সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো :

১. **মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা দান :** অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার মূল কারণ হলো মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণ না হওয়া। মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। তাই সমাজকল্যাণের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, দল, সমষ্টির প্রাথমিক ও মৌলিক চাহিদা পূরণে তাদের সচেষ্ট করে তোলা।

২. **উন্নত জীবনমান অর্জনে সাহায্য করা :** কোনো ভাবে বেঁচে থাকা নয় বরং সুস্থ ও উন্নত জীবনমান অর্জন করা সকল মানুষের কাম্য। সেজন্য সমাজকল্যাণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনযাত্রার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে সহায়তা করা।

৩. **স্বাবলম্বী মনোভাব সৃষ্টি করা :** সমাজকল্যাণ স্বাবলম্বন নীতি অনুসরণ করে। মানুষ যাতে নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের চাহিদা পূরণ ও সমস্যার প্রতিকার বা লাঘব করতে পারে সে লক্ষ্যে সমাজককল্যাণ কাজ করে।

৪. **সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন :** সমস্যা মোকাবিলা এবং জীবযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সমাজকল্যাণ ব্যক্তি ও দলের সক্রিয় ভূমিকার উপর জোর দেয়। এ লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করে।

৫. **অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা :** সমাজকল্যাণের বহুমুখী লক্ষ্যের মধ্যে মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং অন্যের অধিকার রক্ষা করে অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা অন্যতম।

৬. **সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা :** সমাজে মানুষের অবস্থান ও সামাজিক মর্যাদার ও সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিটি মানুষকে নানা ধরনের ভূমিকা পালন করতে হয়। তাই সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হলো মানুষকে তার ভূমিকা পালনে সহায়তা প্রদান করা।

৭. **কাঙ্খিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা :** মানুষের স্বাভাবিক ও কাঙ্খিত জীবন যাপনের জন্য সুস্থ আর্থ-সামাজিক পরিবেশ অপরিহার্য। যেসব প্রতিকূল অবস্থা এই স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে সেগুলো দূর করে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাই সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৮. **সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করা :** পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলার অক্ষমতা থেকেই বহুমুখী জটিল সমস্যা দেখা দেয়। তাই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যবিধানে সমাজকল্যাণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৯. **পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন :** মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১০. **সম্পদের সদ্ব্যবহার ও জনঅংশগ্রহণে উৎসাহিত করা :** সমাজকল্যাণ বিশেষ করে নিজস্ব সম্পদের দ্বারা সমস্যা সমাধানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। সমস্যা সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সুষ্ঠু ও সর্বোত্তমভাবে সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সমাজকল্যাণের লক্ষ্য।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গতিশীল। দেশ ও কালভেদে সমাজের প্রয়োজন, চাহিদা ও সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়। সমাজকল্যাণ মানুষের ব্যক্তিগত, দলগত, ও সমষ্টিগত সমস্যার সমাধান করে জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে– যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য উদ্দেশ্য?

ক) সর্বজনীন কল্যাণ সাধন করা খ) শ্রেণি বৈষম্য দূর করা
গ) মানবসম্পদ সৃষ্টি করা ঘ) স্বাবলম্বী করে তোলা

২। সমাজকল্যাণ কোন ধরনের সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে?

ক) সুষ্ঠু খ) দলীয়
গ) জটিল ঘ) সমষ্টিগত

# পাঠ-৪.৩ সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ (Social Work and Social Welfare)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৪.৩.১ সমাজকর্ম কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.৩.২ সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ৪.৩.১ সমাজকর্ম কী?

সমাজকর্ম হচ্ছে সমস্যা সমাধানের এক আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া। আধুনিক জীবনের নানাবিধ মনো-সামাজিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয়। এটি মূলত একটি পদ্ধতিনির্ভর ব্যবহারিক বিজ্ঞান। এর মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য প্রতিটি স্তরের জনগণকে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। আধুনিক শিল্পসমাজে পেশাগত সমাজকর্মীরা সাধারণত সমাজকর্মের নীতি আদর্শ এবং কৌশল অনুসরণ করে যুগোপযোগী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যার সমাধানে এবং সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে উদ্ভব ঘটে সমাজকর্মের, যা বর্তমানে একটি পেশাগত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

সমাজকর্ম সম্পর্কে ডব্লিউ. এ ফ্রিডল্যান্ডার বলেন, সমাজকর্ম হলো মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক এক পেশাদার সেবাকর্ম, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এককভাবে অথবা দলীয়ভাবে ব্যক্তিকে সহায়তা করে।

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি ১৯৭০ সালে সমাজকর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার এক পেশাগত কর্মকাণ্ড যা তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতাকে পুনরুদ্ধার ও শক্তিশালী করে এবং সামাজিক পরিবেশকে এই লক্ষ্যে উপযোগী করে গড়ে তোলে।

সুতরাং সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায় যে, সমাজকর্ম মূলত একটি পদ্ধতি এবং পেশাভিত্তিক কর্মকাণ্ড এবং মানুষকে সাহায্য করার এক প্রায়োগিক বিজ্ঞান যা সকল মানুষের কল্যাণ ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যাক্তি, দল ও সমষ্টিকে তার সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে এবং যথোপযুক্ত সামাজিক পরিবর্তন অর্জনে চেষ্টা করে।

## ৪.৩.২ সমাজকর্মের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক

সমাজকর্মের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। উভয়ই সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে নিবেদিত। সমাজকল্যাণ হলো সমাজকর্মের লক্ষ্য আর সমাজকর্ম হলো সমাজকল্যাণ সাধনের অন্যতম সক্ষমকারী প্রক্রিয়া। এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো :

১. সমাজকর্ম একটি পেশগত কার্যক্রম বা সেবা যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমধান ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। অন্যদিকে সমাজকল্যাণের জন্য সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা জরুরি নয় ফলে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থাকতে পারে।

২. সমাজকল্যাণমূলক কাজ সমাজের যেকোনো পেশাদার কিংবা অপেশাদার ব্যক্তি সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু সমাজকর্ম একটি পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতাভিত্তিক সেবাকার্যক্রম, যা পরিচালনার জন্য পেশাদার সমাজকর্মী প্রয়োজন।

৩. সনাতন সমাজকল্যাণ সাধারণত ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও মানবতাবোধ থেকে করা হয়। পেশাদার সমাজকর্মের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে সেবা প্রদান করা হয়। সমাজকর্ম পেশাগত নীতি ও মূল্যবোধ আশ্রিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া।

৪. সমাজকল্যাণ হলো একটা বৃহত্তম সিস্টেম। সমাজকর্ম হলো একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও পেশা। বৃহত্তর সমাজকল্যাণ সিস্টেমের একটা উপাদান হলো সমাজকর্ম।

৫. সমাজকল্যাণ ব্যক্তিগত, দলগত বা প্রাতিষ্ঠানিক যেকোনো উদ্যোগে সম্পাদিত হতে পারে। পক্ষান্তরে পেশাদার সমাজকর্ম সকল ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পদিত হয়। সমাজকর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে সেবাদান করে।

## সারসংক্ষেপ

শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থার জটিল ও বহুমুখী মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মের আবির্ভাব ঘটে। সনাতন সমাজকল্যাণমূলক সেবাব্যবস্থার পরিবর্তে বিজ্ঞানভিত্তিক সুশৃঙ্খল সেবাদানের একটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হলো সমাজকর্ম। দুইয়ের মধ্য পার্থক্য থাকলেও একে অপরের পরিপূরক। সামাজিক সম্পর্ক লাভে সমাজকর্ম মানুষের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটায় এবং এ লক্ষ্যে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি কত সালে সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন?

ক) ১৯৬৫ সালে খ) ১৯৬৭ সালে
গ) ১৯৬৯ সালে ঘ) ১৯৭০ সালে

২। কোনটি শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুপ্রেরণা বা দর্শন থেকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত?

ক) সমাজকল্যাণ খ) সমাজকর্ম
গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘ) ইতিহাস

## পাঠ-৪.৪ সমাজকর্ম ও সমাজসেবা (Social Work and Social Services)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৪.৪.১ সমাজসেবা কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
৪.৪.২ সমাজকর্মের সাথে সমাজসেবার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৪.৪.১ সমাজসেবা কী?

সমাজকর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলোর মধ্যে সমাজসেবা অন্যতম। অতীতে সমাজসেবা বলতে অসহায় ও দরিদ্রদের জন্য গৃহীত সেবাকার্যক্রমকে বোঝানো হতো। সনাতন সমাজসেবা ছিল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গৃহীত ঐচ্ছিক কার্যক্রম। এগুলো তেমন সংগঠিতও ছিল না। বর্তমানে সমাজসেবা বলতে সকল স্তরের মানুষের কল্যাণে এবং নিরাপত্তার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত সকল কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে। সমাজকর্ম অভিধানের ভাষায়, সমাজে মানুষের স্বাস্থ্য ও সার্বিক কল্যাণ বিধানে সমাজকর্ম এবং অন্যান্য পেশাধারীদের তৎপরতাই হচ্ছে সমাজসেবা।

এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটেনিকাতে বলা হয়েছে, সমাজসেবা প্রত্যয়টি ব্যাপক অর্থে সরকারি অথবা বেসরকারি কর্মপ্রচেষ্টা হিসেবে পরিচিত যার মাধ্যমে আয়মূলক কর্মকাণ্ড, চিকিৎসা সেবা, গৃহায়ন ও চিত্তবিনোদনের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিশেষ কোনো দলের যত্ন ও সুরক্ষামূলক সেবা প্রদান করা হয় যা ক্রমান্বয়ে শিল্পায়িত সমাজে সমষ্টির দায়িত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমাজের সকল শ্রেণির জন্যই সংগঠিত হয়। এটি প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠিত কার্যক্রম, এটি সরকারি বেসরকারি উভয় পর্যায়েই সংগঠিত হয়ে থাকে। সমাজসেবা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে। সমাজসেবার আওতায় যেসব সেবা দেওয়া হয় তা হলো– সামাজিক সাহায্য, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক বীমা, শিশুকল্যাণ, সংশোধনমূলক কার্যক্রম, মানসিক স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন, শ্রমিক সংরক্ষণ, গৃহসংস্থান প্রভৃতি।

### ৪.৪.২ সমাজকর্ম ও সমাজসেবার সম্পর্ক

সমাজসেবার ধারণাটি বেশ ব্যাপক এবং এটি সমাজকর্মের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো :

১. সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। সমাজসেবা সমাজকর্মের এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ সহায়তা করে।
২. উভয়ই মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ এবং এর সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কাজ করে।
৩. সমাজসেবা হলো মানবকল্যাণের জন্য গৃহীত কর্মসূচি। আর এ লক্ষ্য অর্জনে সমাজকর্মীরা সহায়তা করেন।
৪. সমাজকর্ম ও সমাজসেবা সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পর্যায়েই পরিচালিত হয়ে থাকে।
৫. সমাজসেবার পরিধি সমাজকর্মের চেয়ে ব্যাপক।
৬. মানবকল্যাণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য গৃহীত সাধারণ কার্যক্রম হলো সমাজসেবা। অন্যদিকে পিছিয়ে পড়া ও অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম পরিচালিত হয়।

### সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি পেশা এবং ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান; অন্যদিকে সমাজসেবা হলো কতগুলো সুসংগঠিত কার্যক্রম যেগুলো বস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলন করা হয়। সমাজসেবার লক্ষ্য হলো কাঙ্ক্ষিত ও আংশিক প্রয়োজনপূরণে সচেষ্ট হওয়া। সমাজকর্মের বিশেষ ধারা বা কার্যক্রমকেন্দ্রিক ব্যবহারিক রূপ হলো সমাজসেবা।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজসেবার সৃষ্টি–

i. দুঃস্থদের সেবা করার জন্য ii. কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য iii. সম্পদ আহরণের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩. সমাজসেবা ও সমাজকর্ম দুটি প্রত্যয় উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ফুটে উঠে–

i. অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ii. অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক iii. গভীর সম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৪.৫ সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তা (Social Work and Social Security)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৪.৫.১ সামাজিক নিরাপত্তা ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৫.২ সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন।

৪.৫.৩ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৪.৫.১ সামাজিক নিরাপত্তা কী?

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবমূল্য এ দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ যে ধারণার উদ্ভব হয়েছে তা হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বস্তুত বেশকিছু প্রতিকূল অবস্থা হতে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ব্যবস্থার নাম হলো সামাজিক নিরাপত্তা। আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রে সামাজিক

নিরাপত্তা প্রদান করা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের কর্তব্য, অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা লাভ নাগরিকদের মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। বেশ কিছু ঘটনা বা বিষয় যেমন– বেকারত্ব, রোগ, অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব, বার্ধক্য, কর্মকালীন দুর্ঘটনা ইত্যাদি মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য যেমন প্রতিকূল তেমন ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকিপূর্ণ ও সংকটময় জীবন বা পরিস্থিতি মানুষের অর্থনৈতিক, শারীরিক এবং নৈতিক ক্ষতিসাধন করে থাকে। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজ বা রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে বিশেষ বিপদকালীন সময়ে বিপদ হতে রক্ষার চেষ্টা করে।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, অসুস্থতা, বেকারত্ব, পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যের মৃত্যু, বার্ধক্য ও প্রতিবন্ধকতা, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সাধারণ জীবন বিপর্যয় হতে সদস্যদের রক্ষাকল্পে সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হলো সামাজিক নিরাপত্তা।

উইলিয়াম বিভারিজ বলেন, বেকারত্ব, অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা, বৃদ্ধবয়সে চাকরি হতে অবসর গ্রহণ, পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু; বা জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের সময় অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক ব্যয়ের কারণে যখন কোনো পরিবারের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন যে কর্মসূচির মাধ্যমে আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় তাকেই সামাজিক নিরাপত্তা বলে।

সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক নিরাপত্তা মূলত বেশ কিছু প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচির সমষ্টি যা সমাজ বা রাষ্ট্র নাগরিকদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য গ্রহণ করে। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচি শিল্পবিপ্লবের পর যার উন্মেষ ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এ বিষয়ে চিন্তা-চেতনা ও উদ্যোগ ঘনীভূত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কার্যকরভাবে এর প্রচলন শুরু হয়।

## ৪.৫.২ সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ

সামাজিক নিরাপত্তার সাধারণ লক্ষ্য হলো সামাজিকভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে রক্ষা করা। সামাজিক নিরাপত্তার এ লক্ষ্য অর্জনের দুটি পথ হলো– সামাজিক সাহায্য ও সামাজিক বীমা। তবে, এ দুটি পথ ছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনের আরও একটি পথ রয়েছে; সেটি হলো সমাজসেবা। অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তা তিন প্রকার। যথা– ক) সামাজিক বীমা, খ) সামাজিক সাহায্য ও গ) সমাজসেবা ।

**ক) সামাজিক বীমা :** সামাজিক বীমা এমন এক সাহায্যদান ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির অবদান সাপেক্ষে তাকে তার বিপদকালীন সময়ে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। সামাজিক সাহায্যে ব্যক্তির অবদান না থাকলেও সে বিপদকালীন সময়ে সাহায্য লাভ করে থাকে। কিন্তু সামাজিক বীমার আওতায় সাহায্য পেতে হলে অবশ্যই ব্যক্তিকে আর্থিক অবদান রাখতে হবে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

**খ) সামাজিক সাহায্য :** এটি মূলত সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত এক ধরনের সাহায্য ব্যবস্থা যেখানে সরকার তার রাজস্ব আয় বা নিজস্ব তহবিল থেকে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করে থাকে।

**গ) সমাজসেবা :** সামাজিক সাহায্য ও সামাজিক বীমা অপেক্ষা সমাজসেবার পরিধি ব্যাপক। এটি মূলত এমন এক সংগঠিত সেবাদান ব্যবস্থা যা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এটি ব্যক্তি ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে যেসমস্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো হলো :

ক. মাতৃত্ব সুবিধা;
খ. চিকিৎসা সুবিধা;
গ. শ্রমিক ক্ষতিপূরণ;
ঘ. সামাজিক বীমা: ১. প্রভিডেন্ট ফান্ড, ২. অবসর ভাতা, ৩. গোষ্ঠী বীমা, ৪. গ্রাচুয়িটি, ৫. বেনেভোলেন্ট ফান্ড;
ঙ. সামাজিক সাহায্য এবং
চ. সমাজসেবা।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মধ্যে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো চলমান কর্মসূচি। এছাড়াও বয়স্কভাতা ও বিধবাভাতা বর্তমানে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতাভুক্ত হয়েছে।

## ৪.৫.৩ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

**প্রথমত :** সমাজকর্ম মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যার সমাধানে সদা সচেষ্ট। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা অক্ষম ও অসহায়দের মৌল প্রয়োজন পূরণ ও জীবনযাত্রার গ্রহণযোগ্য মানের নিশ্চয়তা বিধান করে সুখী সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

**দ্বিতীয়ত :** সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের কল্যাণে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সমাজকর্ম মানুষের সুস্থ, স্বাভাবিক ও কাঙ্ক্ষিত জীবন যাপনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী অবস্থা দূর করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

**তৃতীয়ত :** সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো– সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে সৌহার্দ্যমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রকট অর্থনৈতিক বৈষম্য এক্ষেত্রে বিরাট বাধাস্বরূপ। সামাজিক নিরাপত্তা অর্থনৈতিক বৈষম্য কিছুটা কমিয়ে সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

**চতুর্থত :** সমাজকর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য সবর্জনীন কল্যাণমুখিতা। সামাজিক নিরাপত্তা বিভিন্নমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে জনকল্যাণে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে।

**পঞ্চমত :** সমাজকর্মের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে থাকে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজের মানুষের অক্ষমতা, দুঃস্থতা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে এবং বিপর্যয় মুহূর্তে রাষ্ট্র বা সমাজকর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও সমর্থনদানের ব্যবস্থা হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বেসরকারি পর্যায়েও এ ব্যবস্থা প্রচলিত হতে পারে। সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত করা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণসহ নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক নিরাপত্তা কেমন প্রতিষ্ঠান?

ক) আত্মকেন্দ্রিক খ) স্বেচ্ছামূলক

গ) মানবতামূলক ঘ) প্রতিরক্ষামূলক

২। সামাজিক নিরাপত্তা হলো রাষ্ট্রের নাগরিকদের আয় সহায়তা বিধান। এতে প্রকাশ পায়–

i. আর্থিক সহায়তা ii. সামাজিক বিধান iii. নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৪.৬ সমাজকর্ম ও সামাজিক পরিবর্তন (Social Work and Social Change)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৪.৬.১ সামাজিক পরিবর্তন কী তা জানতে পারবেন।

৪.৬.২ সামাজিক পরিবর্তনের কারণ আলোচনা করতে পারবেন।

৪.৬.৩ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ৪.৬.১ সামাজিক পরিবর্তন কী?

পরিবর্তন হলো এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর। সেদিক থেকে বলা যায় যে, সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজের এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর। তবে সমাজের এই রূপান্তর বা পরিবর্তন সব সময়ই একরকম হয় না। সমাজ কখনো উন্নতির পথে অগ্রসর হয় আবার কখনো সমাজের গতি ব্যাহত হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি, অনুশাসন ইত্যাদির সম্মিলিত বা সামষ্টিক রূপই হলো সমাজব্যবস্থা। সামাজিক পরিবর্তনে সমাজের এই সমস্ত উপাদানগুলো তার পুরাতন অবস্থা হতে

নতুন অবস্থায় উন্নীত হয়। সমাজবিজ্ঞানী স্যামুয়েল কোয়েনিং সামাজিক পরিবর্তন বলতে মানুষের জীবনযাপন রীতিতে সংঘটিত পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন যা সাধারণত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন উপাদানের কারণে হয়ে থাকে।

অন্যদিকে রবার্ট এল. বার্কার তাঁর সমাজকর্ম অভিধানে সামাজিক পরিবর্তন বলতে সময়ের ব্যবধানে একটা সমাজের আইন, আদর্শ, মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাতে যে পরিবর্তন আসে তাকেই বুঝিয়েছেন। পরিবর্তনের কারণ একটি নয় বরং বহুমাত্রিক। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র কখনো স্থায়ী, কখনো বা অস্থায়ী; কখনো প্রগতিশীল কখনো পশ্চাৎমুখী, কখনো পরিকল্পিত, কখনো অপরিকল্পিত; কখনো একমুখী, কখনো বহুমুখী হতে পারে। তবে এই পরিবর্তন একটি অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক ঘটনা। এ পরিবর্তন দু'ভাবে ঘটতে পারে। যেমন– ক) প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও খ) পরিকল্পিত পরিবর্তন ।

**ক. প্রাকৃতিক পরিবর্তন :** এটিকে অপরিকল্পিত পরিবর্তনও বলা হয়। সময়ের ব্যবধানে বা অন্যান্য কারণে রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি ও সামাজিক ব্যবস্থাতে যে পরিবর্তন ঘটে তাকেই প্রাকৃতিক সামাজিক পরিবর্তন বলে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

**খ. পরিকল্পিত পরিবর্তন :** উদ্দেশ্যমূলকভাবে সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে সমাজের যে পরিবর্তন আসে তাকে পরিকল্পিত পরিবর্তন বলা হয়। শিল্পায়ন ও নগরায়ন তার উদাহরণ। প্রাকৃতিক বা পরিকল্পিত যে ধরনেরই সামাজিক পরিবর্তন হোক না কেন সমাজজীবনে এগুলোর কম বেশি ভালো ও মন্দ উভয় প্রভাব থাকবেই।

## ৪.৬.২ সামজিক পরিবর্তনের কারণ

প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো একটি কারণকে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এককভাবে দায়ী করা চলে না। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিভিন্ন উপাদানের কথা বলেছেন। ব্যক্তির সচেতনতা, কাঠামোগত পরিবর্তন, বাহ্যিক প্রভাব, বিপ্লব, যুদ্ধ, অভিন্ন উদ্দেশ্য এই সমস্ত উপাদানের প্রভাবে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের অন্যান্য সাধারণ কারণগুলো হলো :

**ক. প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক কারণ :** ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। কোনো নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ু সে এলাকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

**খ. রাজনৈতিক কারণ :** রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সমাজকাঠামোর ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশের সমাজজীবনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

**গ. অর্থনৈতিক কারণ :** অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন– ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক অবস্থায় রুপান্তর ঘটলে সমাজকাঠামো, চিন্তাধারা ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে।

এছাড়া ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণ, জনসংখ্যা কাঠামোতে পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার, যুদ্ধবিগ্রহ, সমাজসংস্কার, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি নানা কারণে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হতে পারে।

সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক পরিবর্তন কখনো একটি কারণে আবার কখনো একাধিক কারণের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় সাধিত হতে পারে।

## ৪.৬.৩ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সমাজ সদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ভাবেই সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব নেতিবাচক হওয়ায় বা মঙ্গলজনক না হওয়ার ফলে সমাজে নানাবিধ জটিলতা ও সমস্যা তৈরি হয়। এই সমস্যা ও জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে আধুনিক পেশাগত সমাজকর্মের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া ও কৌশলের পরিবর্তন সার্ধিত হয়েছে যুগে যুগে। সমাজকর্মের সুচনাই হয়েছে শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলার জন্যই।

১. সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হলে অবশ্যই পরিবর্তন জরুরি। সমাজকর্ম সমাজের ও সমাজস্থ মানুষের কাঙ্ক্ষিত জীবনমান নিশ্চিতকরণ ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারকারী পরিবর্তন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য সমাজকর্মের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি একজন সমাজকর্মীকে সামাজিক পরিবর্তনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

২. পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। আর সমাজকর্মের অন্যতম কাজ হলো মানুষকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যবিধানে সচেষ্ট করে তোলা যাতে তারা নিজেরাই সক্ষম হতে পারে নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলায়।

৩. সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি সামাজিক কাঠামো, রীতিনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের অবনতি দেখা দেয়; আর তৈরি হয় বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা। সমাজকর্ম ঐ সমস্ত সমস্যা ও জটিলতা মোকাবিলা করে মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে সাহায্য করে।

## সারসংক্ষেপ

মূলত সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজের রূপান্তর। এই পরিবর্তনের গতি কোথাও দ্রুত, কোথাও ধীর-মন্থর। সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন, যেমন– সমাজের আয়তন, বিভিন্ন অংশের গঠন বা ভারসাম্য অথবা এর সংগঠনের ধরনের পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করে। আবার সামাজিক মূল্যবোধ, আদর্শ ও রীতিনীতি যেগুলো সমাজকাঠামোকে সুসংহত রাখে এবং এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনে সহায়তা করে, এগুলোর যেকোনো রূপান্তরও সামাজিক পরিবর্তন নির্দেশ করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি সমাজের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য?

ক) পরিবর্ধন খ) পরিমার্জন

গ) পরিবর্তন ঘ) রূপান্তর

২। সমাজিক পরিবর্তন মূলত–

i. সমাজকাঠামোর পরিবর্তন

ii. সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন

iii. সামাজিক কার্যাবলীর পরিবর্তন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৪.৭ সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন (Social Work and Social Development)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৪.৭.১ সামাজিক উন্নয়ন কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৭.২ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

## ৪.৭.১ সামাজিক উন্নয়ন কী?

সামাজিক উন্নয়ন ধারণাটি উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সরকারি, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মীর কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নয়ন মূলত একটি গতিশীল ধারণা এবং এটি সাধারণত অনুন্নত অবস্থা হতে উন্নত অবস্থায় উত্তরণকে নির্দেশ করে। উন্নয়ন হলো একটি ইতিবাচক পরিবর্তন প্রক্রিয়া।

অতএব বলা যায় সামাজিক উন্নয়ন হলো সমাজের এক ইতিবাচক পরিবর্তন যার মাধ্যমে সমাজ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অবস্থা হতে উন্নত অবস্থায় উপনীত হয়। একটি সমাজব্যবস্থায় তখনই সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে বলে ধরা হয় যখন ঐ সমাজের সাধারণ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, অভ্যাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচারণ সকল ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন আসে এবং একই সাথে জনগণের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পায়, বেকারত্ব হ্রাস পায়, ভোগের পরিমাণ

বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের অংশগ্রহণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। সামাজিক উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সকল দিকেরই ইতিবাচক পরিবর্তন।

*Encyclopedia of Social Work in India* এ বলা হয়েছে, সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে একটি সমষ্টিগত ধারণা, যা সমাজের প্রধান কাঠামোগত পরিবর্তন যেমন– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে এবং সুপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে সমাজে রূপান্তরিত ও প্রবর্তিত হয়।

জেমস মিজলে এর মতে, সামাজিক উন্নয়ন বলতে পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তনের এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যা গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল জনগণের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালায়।

সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক উন্নয়ন হলো, সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জনের জন্য এমন এক সুশৃঙ্খল পরিবর্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয়, জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটে এবং সামগ্রিকভাবে এগুলো তাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে।

### ৪.৭.২ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। দুটি প্রত্যয়ই মানবকল্যাণে কাজ করে। উভয়েরই লক্ষ্য হলো সমাজস্থ মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এছাড়াও :

ক. সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা এবং তাদের ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা। অপরদিকে সামাজিক উন্নয়ন হলো উক্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির দৈহিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সকল দিকের উন্নয়ন বা ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা। সুতরাং উভয়ের লক্ষ্য ও কর্মপরিধি এক ও অভিন্ন।

খ. সমাজকর্ম মানুষের মৌলিক ও মানবিক চাহিদা পূরণে সদা সচেষ্ট। অপরদিকে সামাজিক উন্নয়ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা ইত্যাদির গতিশীলতা আনয়নে সচেষ্ট। সুতরাং সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

গ. সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন মানবসম্পদ উন্নয়নে সচেষ্ট। সামাজিক উন্নয়ন, জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও সচেতনতা সৃষ্টি করে মানুষকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে। অন্যদিকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও উন্নত জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলতে, মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে এবং মানুষের ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করতে সমাজকর্ম তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ. সামাজিক উন্নয়ন জনকল্যাণে বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ সামাজিক উন্নয়ন হলো লক্ষ্য আর সমাজকর্ম হলো লক্ষ্য অর্জনের উপায়। কার্যকরভাবে সমাজকল্যাণ আনয়নের জন্য সমাজকর্মীদের সামাজিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা, কৌশল ও মূল্যায়ন বিষয়ে ধারণা রাখা প্রয়োজন।

## সারসংক্ষেপ

সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাহায্য ছাড়া সমাজের কল্যাণ সাধন কোনোভাবে সম্ভব নয়। আবার দুইয়ের মধ্য কিছু পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন– সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বিষয় অপরদিকে সামাজিক উন্নয়ন একটি তাত্ত্বিক ধারণা মাত্র। এই ধারণাকে বাস্তব রূপদানে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক উন্নয়ন একটি–

ক) মিশ্র ধারণা খ) গতিশীল ধারণা

গ) সনাতন ধারণা ঘ) সমষ্টিগত ধারণা

২। কেন সামাজিক উন্নয়নে মানবিক মূলধনের প্রয়োজন?

ক) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খ) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য

গ) সুষম উন্নয়নের জন্য ঘ) অংশগ্রহণের জন্য

# পাঠ-৪.৮ সমাজকর্ম ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Work and Social Control)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৪.৮.১ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৮.২ সমাজকর্ম ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ৪.৮.১ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কী?

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মূলত একটি পদ্ধতি বা কৌশল। এই পদ্ধতি বা কৌশল সমাজের সদস্যদের অসংযত ও সমাজ বিরোধী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে তাদের সাথে সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে সমাজকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। প্রত্যেকটি সমাজেই মানুষ কতগুলো নিয়মকানুন, রীতিনীতি মেনে চলে এবং এর ফলে সমাজব্যবস্থা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠে। অন্যদিকে, মানুষ যখন এগুলোর পরিপন্থী কাজ করে তখন সমাজে দেখা দেয় নানা বিশৃঙ্খলা আর এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সৃষ্টি।

Robert L. Barker সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে সমাজ বা সমাজের কিছু সদস্যদের এক সংগঠিত প্রয়াস বলে আখ্যায়িত করেছেন, যা সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করে।

Robertson বলেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো সমাজের সদস্যবৃন্দের সমাজস্বীকৃত পন্থায় কাঙ্খিত আচরণ করার একটি প্রক্রিয়া।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও বিরোধ হ্রাস করে সমাজের শান্তি সমুন্নত রাখে এবং সমাজকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনেক বাহন রয়েছে। এগুলো হলো– জনমত, গণমাধ্যম, রাষ্ট্র, আইন, আদালত, পুলিশ, জেলখানা, ধর্ম, আদব-কায়দা, পরিবার, উৎসব বা অনুষ্ঠান, শিল্পকলা, পৌরাণিক কাহিনী, প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতি, নিষেধাজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, পুরস্কার ও শাস্তি প্রভৃতি।

## ৪.৮.২ সমাজকর্মের সাথে সমাজিক নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বহুবিধ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। যেমন–

ক. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হলো সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। সমাজকর্মেরও লক্ষ্য হলো সামাজিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন সাধন করা।

খ. সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল, সমষ্টির আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধানে প্রয়াস চালায়, যা সমাজকে স্থিতিশীল করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণও তার বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনয়নে সচেষ্ট।

গ. সমাজকর্ম মানুষের ইতিবাচক আচরণ আনয়নে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান আচরণকে নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজের কাঙ্ক্ষিত ধারায় আচরণ করতে সাহায্য করে।

উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও পদ্ধতিগত দিক থেকে এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যও রয়েছে।

## সারসংক্ষেপ

প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মূলত প্রাথমিক দল যেমন– পরিবার, বন্ধু, সহপাঠী এদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে, পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মূলত সমাজের রীতিনীতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আবার ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে হয়। অন্যদিকে, শাস্তির মাধ্যমে যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হয় তা নেতিবাচক, যা আবার শোষণমূলক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে পরিচিত। মূলত প্রত্যেক সমাজেই সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কত প্রকার?

ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার

গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার

২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন হলো–

i. আইন ii. ধর্ম iii. রাষ্ট্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৪.৯ সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার (Social Movement and Social Reform)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৪.৯.১ সামাজিক আন্দোলন কী তা জানতে পারবেন।

৪.৯.২ সমাজসংস্কার কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৯.৩ সমাজসংস্কার ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

### ৪.৯.১ সামাজিক আন্দোলন কী?

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও দুটি ভিন্ন বিষয়। পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে যেসব উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাদের মধ্যে সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার অন্যতম। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন বা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। সামাজিক আন্দোলন হলো কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত উদ্যোগ। সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে *Oxford English Dictionary* তে বলা হয়েছে, কোনো নীতি বা লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একদল লোক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "সামাজিক আন্দোলন হলো এমন একটি যৌথ উদ্যোগ যাতে সমাজের অধিকাংশ মানুষ কোনো আইন বা সামাজিক আদর্শ পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করে থাকে।"

সুতরাং বলা যায় যে, বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন, সমস্যা সমাধান, অসন্তোষ দূরীকরণ ও শৃঙ্খলা আনয়নে মানুষের সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রয়াসই সামাজিক আন্দোলন।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়। বর্তমান সময়ে সামাজিক আন্দোলন হলো মানবাধিকার আন্দোলন, নারী অধিকার আন্দোলন, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন ইত্যাদি।

### ৪.৯.২ সমাজসংস্কার কী?

সংস্কার শব্দটির অর্থ হলো কোনো বিষয়ের ক্ষতিকর দিকগুলোর অপসারণ করে নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটানো অর্থাৎ সংস্কার হলো সংশোধন এবং এর মাধ্যমে সমাজব্যবস্থাকে অধিকতর কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার এক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ সমাজসংস্কার হলো সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শ, সমাজের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান,

সমাজের প্রথা ও প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর বা সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী তাকে সংশোধন ও পরিবর্তন করে সে স্থলে সমাজের কল্যাণ উপযোগী নতুন মূল্যবোধ, আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে তোলা। Robert L. Barker এর মতে, সমাজসংস্কার সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পূনর্গঠন করে এবং এর মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করে।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী সমাজসংস্কার হলো সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত ভূমিকা, সামাজিক আচার-আচরণের ধরন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের সুচিন্তিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্যক্রম।

সমাজসংস্কার একটি বহুমুখী পরিবর্তনকারী উদ্যোগ। সমাজসংস্কার বা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে সকল প্রকার কুসংস্কার এবং সমাজের কুপ্রথা বা অন্যায় পদক্ষেপসমূহ দূর করে সমাজে স্থিতিশীলতা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা অর্জন করা সম্ভব। যুগে যুগে সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলো এ লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। যেমন– সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন, হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন, আলীগড় আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন প্রভৃতি।

### ৪.৯.৩ সমাজসংস্কার ও সামাজিক আন্দোলনের সম্পর্ক

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার একে অন্যের পরিপূরক। সমাজসংস্কারের লক্ষ্যে গৃহীত সব কর্মসূচিই সামাজিক আন্দোলনের আওতাভুক্ত। সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের দুটি প্রক্রিয়া। উভয়ই ইতিবাচক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও–

১. সমাজসংস্কার সাধারণত সীমিত পরিধিতে পরিচালিত হয়; অন্যদিকে সামাজিক আন্দোলনের পরিধি ব্যাপক।
২. উভয়ই মানুষের কল্যাণ ও সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে।
৩. সামাজিক আন্দোলন সামাজিক কার্যক্রম বা কর্মসূচির মাধ্যমে ফল লাভ করে আর এরই মাধ্যমে সমাজসংস্কার সাধিত হয়।

## সারসংক্ষেপ

সমাজসংস্কার সাধারণত জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতির অবসান ঘটায়। আবার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠানের অবসান ঘটিয়ে সমাজসংস্কার করা হয়। জনমত গঠনের মাধ্যমে আইন প্রণেতাদের উপর চাপ প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা যায়। আবার আইন যদি সমাজসংস্কারের রক্ষাকবচ হয় তাহলে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে উক্ত আইন সমাজ সংস্কারের চূড়ান্ত লক্ষ্যার্জন করতে সহায়তা করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সকলের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে কী বলা হয়?
ক) অংশীদারিত্ব খ) সংশোধন
গ) পরিমার্জন ঘ) আন্দোলন

২। সংস্কার শব্দটির অর্থ কী?
ক) সংঘবদ্ধ খ) পরিবর্তন
গ) প্রগতি ঘ) পরিমার্জন

৩। কোনটি সংস্কার আন্দোলনের যুগ?
ক) অষ্টাদশ ও উনবিংশ খ) একবিংশ ও দ্বাদশ
গ) একাদশ ও দ্বাদশ ঘ) ষোড়শ ও উনবিংশ

# পাঠ-৪.১০ সমাজসংস্কার আন্দোলন– সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাবিবাহ ও নারী শিক্ষা আন্দোলন (Social Reform Movement– Sati Practice Band, Hindu Widow Marriage and Women Education Movements)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৪.১০.১ সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৪.১০.২ হিন্দু বিধবাবিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৪.১০.৩ নারী শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

## পাঠ–৪.১০.১ সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন

ঊনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রগতিশীল ও আধুনিক চিন্তাধারার অধিকারী বিশিষ্ট (হিন্দু ও মুসলিম) নেতাদের নেতৃত্বে অনেকগুলো সমাজসংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠে। এই সকল সংস্কার আন্দোলন বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণ, ধর্মীয় সংস্কার সাধন, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি উদ্দেশ্যে গড়ে উঠে। এই সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। এসব আন্দোলনের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এর সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন সমাজসংস্কারের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

সতীদাহ শব্দের অর্থ হলো সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে আগুনে দাহ করা। তৎকালীন হিন্দু সমাজে মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহমরণের প্রথাই সতীদাহ প্রথা। সাধারণত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রথানুযায়ী মৃত স্বামীর চিতায় সদ্যবিধবা স্ত্রীকে জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হতো। এভাবে জ্বলন্ত আগুনে সদ্যবিধবার মৃত্যু প্রথাকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়। এটি সহমরণ প্রথা নামেও পরিচিত। নিষ্ঠুর ও অমানবিক এ প্রথার বিলোপ সাধনের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৮২২ সালের ২০ শে মার্চ সমাচার দর্পন প্রত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৮১৫-১৮১৭ সালের মধ্যে শুধু ঢাকা, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বেনারস ও বেরেলিতে ১৫১৮ জন বিধবাকে জীবন্ত দাহ করা হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বর্ণনায় সতীদাহের আরও কিছু অমানবিক চিত্র ফুটে ওঠে।

১৮১১ সালে রাজা রামমোহন রায়ের 'ভাতৃবধূ দাহ' তাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তিনি এ কুপ্রথা উচ্ছেদে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং এ প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে নিয়মিত আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন। এ সময় জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন পত্র প্রত্রিকায় লেখালেখি, সেমিনারসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এর নেতিবাচক প্রভাব তুলে ধরেন। তিনি শুধু এ কুপ্রথার বিরোধিতাই করেননি বরং এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে জোরালো গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে গড়ে উঠা আন্দোলনের ফলে লর্ড বেন্টিং ১৮২৯ সালের ডিসেম্বরে আইন জারি করে সতীদাহ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন।

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইনটি প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং এই আইন বাতিলের আবেদন জানায়। এ আইনের বিরুদ্ধে বিলেতে গিয়ে গোঁড়া হিন্দুদের একটি দল 'King in Council' এর নিকট আপিল করেন। রাজা রামমোহন রায় এ আপিলের বিরুদ্ধে এবং সহমরণ প্রথা কার্যকরের সপক্ষে হিন্দুশাস্ত্রের আলোকে একটা প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং বিলেতের House of Commons এ জমা দেন। অবশেষে বিলেতের House of Commons গোঁড়া হিন্দুদের আপিল নাকচ করে দেন। এভাবে সতীদাহ প্রথা বা সহমরণ প্রথা রহিতকরণে রাজা রামমোহন রায় সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন।

## ৪.১০.২ হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন

ভারতীয় উপমহাদেশে সংগঠিত সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে দেখা যায় হিন্দুসমাজ ছিল নানাবিধ কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি আর পণ্ডিত ব্রাক্ষণদের দৌরাত্ম্যের লীলাভূমি। নারী জাতি ছিল অসহায় ও নির্যাতিত। রাজা রামমোহন রায়ের যুগান্তকারী সমাজসংস্কারের ফলে সতীদাহ প্রথা হিন্দুসমাজ

থেকে উচ্ছেদ হলেও বিধবা নারীরা এক নিদারুন অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করতো। সমাজ তাদেরকে এক পৃথক চোখে দেখতো।

তখনকার উচ্চ শ্রেণির ব্রাক্ষণরাও বহুবিবাহে অভ্যস্ত ছিল এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা কুলীন ব্রাক্ষণদের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে ধন্য হতো। অনেক হিন্দুসমাজে কুল বা বংশ রক্ষার জন্য ব্রাক্ষণদের মাঝে অল্প বয়সী কিশোরীদের বিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু পতি মৃত্যুবরণ করার ফলে অল্পবয়সী বিধবারা অমানবিকভাবে পূর্ণজীবন অতিবাহিত করত। তখন কোনো বিধবা পূণর্বিবাহ করলে এই দম্পতিদের সন্তান সমাজে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি পেত না। এমনকি উত্তরাধিকার হতেও বঞ্চিত হতো। এরই প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজের অধিকার বঞ্চিত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কুসংস্কার আচ্ছন্নতা থেকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূরীকরণে সমাজসংস্কারের কাজে ব্রতী হন। তিনি বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নে কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ সরকারের নিকট আবেদন করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হয়। বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন লর্ড ডালহৌসি।

বিধবা বিবাহ আইন পাস হবার পর এই আইন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজে বাস্তবায়ন করেন। বিদ্যাসাগর ১৮৭০ সালের ১১ই আগস্ট স্বীয়পুত্র নারায়নচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে এক বিধবার সাথে বিয়ে দিয়ে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

### ৪.১০.৩ নারীশিক্ষা আন্দোলন

নারীরা সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল দিক থেকেই তারা ছিল বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবমনে চিন্তাধারার যে পরিবর্তন ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সারা বিশ্বে নারী জাগরণের সূচনা ঘটে। ১৭৮৯ সালের অক্টোবর মাসের এক স্মারকলিপিতে নারীসমাজ উল্লেখ করে, নারীর শ্রমের ও কাজের অধিকারের জন্য ও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিয়োগের জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। ১৭৯৩ সালে ঘোষিত "মানুষের অধিকার" সংক্রান্ত কনভেনশনে প্রথমে নারীর অধিকার সংক্রান্ত কোনো কথা না থাকলেও পরবর্তিতে ফরাসি নারীদের আন্দোলনের মুখে ১৭ নং ধারায় নারীর অধিকার সংযোজন করা হয়। এসব অধিকারের অন্যতম হলো শিক্ষার অধিকার। শিক্ষিত নারী দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। নারী শিক্ষিত হলে দেশ ও জাতি শিক্ষিত হবে। তাইতো নেপোলিয়ান বলেছিলেন, "আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।" নারীশিক্ষায় অবদান রেখে আমাদের সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে নওয়াব ফয়জুন্নেসা ও বেগম রোকেয়া।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা কুমিল্লা জেলার সম্ভ্রান্ত নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নারী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। নারীদের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের জন্য তিনি নিজ গ্রামে মেয়েদের জন্য এম.এ. স্কুল, কুমিল্লায় ফয়জুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল ও একটি পাঠশালা, পশ্চিম গাঁওয়ে স্বীয় কন্যার নামে বদরুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয় ও বদরুন্নেসা মেমোরিয়াল হল প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলো নওয়াব ফয়জুন্নেসার অমর কীর্তি যা আজও নারী শিক্ষায় অবদান রাখছে।

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বেগম রোকেয়া উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মহিলাদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তাদের অধিকার সচেতন করে তোলা সম্ভব নয়। কাজেই তিনি নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এক দুঃসাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে স্বল্প পুঁজিতে মাত্র ৮ জন ছাত্রী নিয়ে স্বামীর নামানুসারে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও ১৯২৯ সালে কলকাতায় বেগম রোকেয়া 'মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৩১ সালে কলকাতায় পশ্চিম বঙ্গীয় মহিলা শিক্ষা সম্মেলনে বেগম রোকেয়া 'Education ldeals for the Modern Indian Girls' শীর্ষক এক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে নারী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তুলে ধরেন। বেগম রোকেয়া তাঁর সাহিত্যকর্ম দিয়ে তৎকালীন মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, ধ্যানধারণা, মূল্যাবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে চরম আঘাত হানেন। মতিচুর, পদ্মরাগ, অবরোধ বাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম । নারীকল্যাণের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার অবদান তাই অনস্বীকার্য।

## সারসংক্ষেপ

যুগে যুগে মানবহিতৈষী দর্শন ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সমাজ সেবায় মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কখনো নিজ প্রচেষ্টায় কখনো যৌথ প্রচেষ্টায় সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, কুপ্রথা, ক্ষতিকর রীতিনীতির মুলোৎপাটনের মাধ্যমে সমাজ জীবনকে সুচারুরূপে পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক ও মানব হিতৈষীগণ। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় আজ সমাজ পুনর্গঠিত হয়েছে; হয়েছে গতিশীল। তাই গতিশীল সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে উল্লেখিত মানবহিতৈষীদের অবদান অনস্বীকার্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সতী শব্দের অর্থ কী?
ক) সঙ্গী সাথী খ) আগুনে পোড়ানো গ) সতী-সাধ্বী স্ত্রী ঘ) সহমরণ

২। লর্ড বেন্টিঙ্ক কত সালে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন?
ক) ১৮১১ খ) ১৮২৯ গ) ১৮১৮ ঘ) ১৮১৯

৩। বাংলায় নারী জাগরণের অগ্রদূত কে?
ক) সামছুন্নাহার খ) নওয়াব ফয়জুন্নেসা গ) বেগম রোকেয়া ঘ) নওয়াব বদরুন্নেসা

৪। ভারতীয় উপমহাদেশে অন্যতম প্রথা সতীদাহ প্রথায় প্রকাশ পায়–
i. বর্বরতা
ii. অমানবিকতা
iii. ধর্মীয় গোঁড়ামী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আধুনিক সমাজকর্ম কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?
ক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি খ) অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ) প্রথা ঘ) কুসংস্কার

২। কত সালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাস হয়েছিল?
ক) ১৭২৯ সালে খ) ১৮২৯ সালে গ) ১৬২৯ সালে ঘ) ১৯২৯ সালে

৩। সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ হলো–
ক) বার্ধক্যের নির্ভরশীলতায় পরিচালিত কার্যক্রম খ) শিল্পদুর্ঘটনা ও বিকলঙ্গতায় গৃহীত কর্মসূচি
গ) বেকারত্বজনিত অক্ষমতায় প্রচলিত কর্মসূচি ঘ) অসুস্থতাজনিত সেবা কার্যক্রম

৪। সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ এর মধ্য সাদৃশ্য হলো উভয়েই–
i. মানবকল্যাণে নিয়োজিত
ii. সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সংগঠিত সেবা কার্যক্রম
iii. শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। কী কারণে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়?
i. প্রাকৃতিক কারণ
ii. ধর্মীয় আদর্শগত কারণ
iii. জনসংখ্যার পরিবর্তনজনিত কারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হলো–
i. পরিবার ii. রাষ্ট্র iii. গণমাধ্যম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত?
ক) একতা খ) সততা গ) শৃঙ্খলা ঘ) পরিবর্তনশীলতা

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। এশাদের গ্রামের নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে না। নানা বাধাবিঘ্নের কারণে নারীশিক্ষার হার কম। এশা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য উজ্জীবিত করে। গ্রামের বিত্তশালীদের সহায়তায় গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে।
ক) সামাজিক পরিবর্তন কয় ধরনের? ১
খ) সমাজসংস্কার বলতে কী বুঝেন? ২
গ) উদ্দীপকে এশা কোন মহীয়সী নারীর আদর্শে উজ্জীবিত?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) "সমাজকর্মে এই ধরনের উদ্যোগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ "– কথাটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। জনাব আইয়ুব হোসেন একজন ধর্মভীরু ধনী ব্যক্তি। তিনি ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় পরকালীন মুক্তির আশায় মানুষের সেবা করে থাকেন। অন্যদিকে জালাল সাহেব সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি তার সেবাকর্মের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন।
ক) ধর্ম গোলা কী? ১
খ) শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝায়? ২
গ) জনাব আইয়ুব হোসেনের সেবাকর্ম ও জালাল সাহেবের সেবাকর্মে সমাজকর্মের কোন কোন ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) জনাব আইয়ুব হোসেন ও জালাল সাহেবের সমাজকল্যাণমূলক কাজ সমাজকর্মের যে দুটি ধারণাকে প্রতিফলিত করে তাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১। ঘ ২।ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৮ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৯ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১০ : ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৪ : ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। ক ৫। ঘ ৬। ঘ ৭। ঘ

# ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ
# (Traditional Social Welfare Institutions)

**ইউনিট ৫**

**ভূমিকা**

সমাজকল্যাণের ধারণা প্রাচীন। মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই এর উৎপত্তি। ধর্মীয় অনুভূতি ও মানবতাবোধ থেকেই সমাজকল্যাণের যাত্রা শুরু হয়। মূলত ধর্মীয় অনুশাসন ও মানুষকে সাহায্য করার অনুপ্রেরণা থেকেই সনাতন সমাজকল্যাণের ধারণা গড়ে ওঠে। আর মানবকল্যাণে এ ধরনের কাজের ধারা থেকেই ঐহিত্যগত সমাজকল্যাণের উৎপত্তি। সমাজকল্যাণ বলতে প্রাক-শিল্পযুগের সমাজকল্যাণকে বোঝায়। সে যুগের বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সমাজসেবাই ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ নামে পরিচিত। দুঃস্থ ও আর্তমানবতায় ঐহিত্যগত সমাজকল্যাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দানশীলতা, সদকা, যাকাত, ধর্মগোলা, সরাইখানা, দেবোত্তর প্রথা, বায়তুলমাল, ওয়াক্ফ ও এতিমখানা উল্লেখযোগ্য।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ–৫.১ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দানশীলতা
পাঠ-৫.২ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সদ্কা
পাঠ-৫.৩ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাত
পাঠ-৫.৪ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মগোলা
পাঠ-৫.৫ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাইখানা
পাঠ-৫.৬ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর
পাঠ-৫.৭ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বায়তুলমাল
পাঠ-৫.৮ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াক্ফ
পাঠ-৫.৯ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতিমখানা


## পাঠ-৫.১ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দানশীলতা (Charity as a Traditional Social Welfare Institution)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৫.১.১ দানশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.১.২ দানশীলতার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

৫.১.৩ দানশীলতার সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

### ৫.১.১ দানশীলতা কী?

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দানশীলতা অন্যতম। মানুষ যখন থেকে সমাজবদ্ধ হয়েছে তখন থেকেই মানুষের কল্যাণে এগিয়ে এসেছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে যার যাত্রা শুরু দানশীলতার মাধ্যমে।

দানশীলতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Charity' যা ল্যাটিন শব্দ 'Charitas' থেকে এসেছে। যার অর্থ মানবপ্রেম। সাধারণভাবে দানশীলতা বলতে নিঃস্বার্থভাবে অপরের কল্যাণে দান করার প্রথাকে বোঝায়। অর্থাৎ সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও

অভাবগ্রস্তদের প্রতি দয়াপরাবশ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য প্রদানকে দানশীলতা বলা হয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী এম. জে. গজধর এর মতে, দুস্থ, অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণার্থে নিঃশর্তভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে প্রকাশিত মানবপ্রেমই হচ্ছে দানশীলতা।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, অসহায় ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য দ্রব্যসামগ্রী ও নিঃস্বার্থ সেবা প্রদানই হলো দানশীলতা। সুতরাং বলা যায় দানশীলতা হলো আর্তপীড়িত ও দুস্থদের সাহায্যদানের এক প্রক্রিয়া, যার ভিত্তি হলো ধর্মীয় অনুভূতি ও অনুশাসন।

### ৫.১.২ দানশীলতার গুরুত্ব

মানবজীবনে দানশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা দানশীলতার হাত ধরেই সমাজকল্যাণের যাত্রা শুরু। পাশাপাশি আধুনিক সমাজকর্মকে পেশাগত রূপদানের ভিত্তি হলো উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সমাজকর্ম শিক্ষার বিস্তারে ও বিকাশে দানশীলতা অবদান রেখেছে। এছাড়াও–

১. পরলৌকিক মুক্তি এবং অসহায় শ্রেণির দুর্দশা লাঘবে দানশীলতা পরিচালিত হয়।
২. ইসলামে দানশীলতাকে ইহকালীন মঙ্গল ও পারলৌকিক মুক্তির উপায়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।
৩. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে দানশীলতার অবদান অনস্বীকার্য।
৪. সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে দানশীলতার অবদান রয়েছে।
৫. দানশীলতার অনুপ্রেরণায় ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় 'দান সংগঠন আন্দোলন' গড়ে ওঠে এবং দান সংগঠন আন্দোলন থেকেই 'দান সংগঠন সমিতি' গড়ে ওঠে, যা আধুনিক ও পেশাদার সমাজকর্ম সৃষ্টির ধারক ও বাহক।

### ৫.১.৩ দানশীলতার সীমাবদ্ধতা

মানবকল্যাণে দানশীলতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও আধুনিক সমাজকর্মের দৃষ্টিকোন থেকে এর অনেক সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি রয়েছে। যেমন :

১. দানশীলতা অপরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্ন সমাজসেবা।
২. দানশীলতা দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, ব্যক্তির চাহিদা ও সমস্যা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়।
৩. সমস্যার স্থায়ী ও যৌক্তিক সমাধানে অপারগ।
৪. সাহায্যগ্রহীতাকে পরনির্ভর করে গড়ে তোলে।
৫. দানশীলতা করুণা ও আবেগ মিশ্রিত; ফলে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা বিঘ্নিত হয়।
৬. এটি মানুষকে শ্রমবিমুখ করে তোলে।

দানশীলতার উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে আর্তমানবতার সেবায় এর অবদান অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। এটি সমাজসেবার অনন্য উদাহরণ।

## সারসংক্ষেপ

দানশীলতার অনুভূতিই উনিশ শতকের শেষার্ধে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় বিভিন্ন আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জোগায় যা পরবর্তীতে পেশাদার সমাজকল্যাণের জন্ম দেয়। বর্তমান বিশ্বের অনুন্নত ও দরিদ্র দেশসমূহে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অত্যন্ত সীমিত বিধায় দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র শ্রেণির নিরাপত্তাবিধানে দানশীলতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি সনাতন বা ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের সবচেয়ে পুরোনো অথচ শক্তিশালী রূপ?

ক) বায়তুলমাল খ) সরাইখানা
গ) ধর্মগোলা ঘ) দানশীলতা

২। দানশীলতার মূলভিত্তি হলো–

i. সমাজসেবা ii. মানবপ্রেম iii. ধর্মীয় দর্শন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। সমাজের বঞ্চিত, পশ্চাৎপদ, দুঃস্থ ও অসহায় শ্রেণির কল্যাণে সাহায্য করা কথাটির মূল লক্ষ্য?

ক) দানশীলতার খ) বায়ুতলমালের

গ) যাকাতের ঘ) ধর্মগোলার

## পাঠ-৫.২ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সদ্‌কা (Sadqa as a Traditional Social Welfare Institution)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৫.২.১ সদ্‌কা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.২.২ সমাজকল্যাণে সদ্‌কার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৫.২.১ সদ্‌কা কী?

সদ্‌কা ইসলামী সমাজ ও জীবনব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আরবি 'সাদাকাহ্' শব্দ থেকে সদ্‌কা শব্দের উদ্ভব; যার অর্থ দান। দুস্থ, দরিদ্র ও অসহায় জনসাধারণের কল্যাণে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে এটি প্রচলিত রয়েছে। সদ্‌কা যাকাতের ন্যায় বাধ্যতামূলক নয়। এটি নফল ইবাদতের সমান। সাধারণত মহান আল্লাহতা'লার নৈকট্য লাভের আশায় স্বত্ব ত্যাগ করে কাউকে কিছু দান করাকে সদ্‌কা বলে। সদ্‌কার ক্ষেত্রে দান ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

স্বেচ্ছাধীন ও বাধ্যতামূলক (যাকাত, ফেতরা) সকল দান, মানত, যোগান নিয়ত, মাগফেরাত ও আরোগ্য কামনার্থে দান সবই সদ্‌কার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি হাদিস শরীফে নেক আমল, সদ্ব্যবহার, হাসিমুখে কথা বলা, আপন ভাইয়ের দিকে সুদৃষ্টিও সদ্‌কার শামিল। সাধারণত দু'রকমের সদ্‌কা রয়েছে। যথা :

১. ঐচ্ছিক সদ্‌কা

২. বাধ্যতামূলক সদ্‌কা

ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কোনো রকম বাধ্যবাধকতা ছাড়া যে দান করে, তাকে ঐচ্ছিক সদ্‌কা বলে। মানুষ সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ ও পাপমোচনের উদ্দেশ্যে এ সদ্‌কা প্রদান করে থাকে। যেমন– ফকির, মিসকিন ও ভিক্ষুককে দান করা ইত্যাদি।

আবার বিশেষ শর্তসাপেক্ষে ও বিভিন্ন ধর্মীয় উপলক্ষ্যে যে দান মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করার নিয়ম রয়েছে তাকে বাধ্যতামূলক সদ্‌কা বলে। যেমন– সদ্‌কাতুল ফিতর ও ঈদুল আযহার কোরবানির পশুর চামড়া বা তার মূল্য। এছাড়া মানতের সদ্‌কা দেওয়াও বাধ্যতামূলক।

### ৫.২.২ সমাজকল্যাণে সদ্‌কার গুরুত্ব

সদ্‌কা ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের বিশেষ প্রতিষ্ঠান। জনকল্যণে এর অবদান অপরিসীম। যেমন :

১. স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টের সেবা ইসলামের অন্যতম বিধান।সদকার মাধ্যমে একই সাথে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সন্তুষ্টি ও সেবা করা সম্ভব।

২. সদ্‌কা মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানকে উৎসাহিত করে, যাতে সমাজের প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

৩. সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদের একাংশ দুস্থ, অসহায়, দরিদ্র, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, শিশু, বিধবা, নারী প্রভৃতি শ্রেণির কল্যাণে ব্যয় করে, যা সমাজকল্যাণের লক্ষ্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. সদকার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ও সাময়িক সমাধান করা সম্ভব হয়। এতে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় যা সমাজকল্যাণে অতীব জরুরি।
৫. সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটলে শুধুমাত্র যাকাতের অর্থ দিয়ে সে পরিস্থিতি মোকাবিলা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সদ্‌কার সহায়ক ভূমিকা অতুলনীয়।
৬. সদ্‌কার মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য, শৃঙ্খলা, সাম্য, মৈত্রী ও সংহতি শক্তিশালী করা সম্ভব।

## সারসংক্ষেপ

আরবি অভিধানে আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পদের যে অংশ ব্যয় করা হয় তাকে সদ্‌কা বলে। সদ্‌কা যাকাতের ন্যায় ফরজ নয় কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী নফল ইবাদত। হাক্কুল ইবাদ ও হাক্কুল্লাহ বা সৃষ্টির সেবা ও স্রষ্টার ইবাদত দুটিই লাভ করা যায় সদকার মাধ্যমে। অর্থাৎ স্রষ্টার নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে মুসলমানগণ আর্তমানবতায় সেবায় বস্তুগত ও অবস্তুগতভাবে যা দান করে তাই সদ্‌কা, যা এতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্ব বহন করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি দানশীলতার ব্যাপক পরিধির অন্তর্ভুক্ত?
ক) ওয়াক্‌ফ খ) যাকাত গ) বায়তুলমাল ঘ) সদ্‌কা

২। ইসলামে সদ্‌কা হিসেবে বিবেচনা করা হয়–
i. স্বেচ্ছায় দান
ii. বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত দান
iii. স্বেচ্ছায় আর্থিক সাহায্য প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। বাধ্যতামূলক সদ্‌কার উৎস কয়টি?
ক) একটি খ) দুইটি গ) তিনটি ঘ) চারটি

## পাঠ-৫.৩ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাত (Zakat as a Traditional Social Welfare Institution)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৫.৩.১ যাকাত কী তা জানতে পারবেন।
৫.৩.২ যাকাত আদায়ের খাতগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
৫.৩.৩ যাকাত ব্যয়ের খাতগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
৫.৩.৪ সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

### ৫.৩.১ যাকাত কী?

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সর্বশেষ স্তম্ভ যার অর্থ হলো প্রশংসা করা, প্রাচুর্য লাভ করা ও সংশোধন করা। এছাড়াও যাকাতের অন্যতম দুটি অর্থ হলো পবিত্র করা ও বৃদ্ধি করা। ঐতিহ্যগত বা সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে যাকাত অন্যতম। ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি এবং মৌলিক ইবাদত হলো যাকাত, যা ইসলাম ধর্মের প্রধান কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ও প্রতিষ্ঠান।

যাকাত আদায় করলে অর্থ-সম্পদ ব্যক্তি বিশেষের হাতে কুক্ষিগত না থেকে সমাজে দরিদ্রদের হাতে সম্প্রসারিত হয় এবং এর সাহায্যে অনেক অসহায় ও দরিদ্র শ্রেণির অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়।

আবার পবিত্রতা অর্থে যাকাত মানুষের মধ্য হতে কৃপণতা, কপটতা, অপবিত্রতা ও লোভ লালসা থেকে মুক্ত করে পবিত্র রাখে।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, Zakat giving charitable clonations, requirement of those faithful to islam; that portion of a Muslims income that must be allocated for alms to poor people. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রা.) এর মতে, ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদের নিসাব পূর্তির পর যে কোনো মুসলিম দরিদ্রকে শরীয়তের নির্ধারণ অনুযায়ী সেখান থেকে ধনসম্পদ দেওয়াই যাকাত। তবে দরিদ্র মুসলিমটি হাক্কানী বংশোদ্ভূত হবে না।

ইসলামী শরিয়তের বিধানানুযায়ী কোনো মুসলমানের সম্পদ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর বার্ষিক নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে উদ্বৃত্ত থাকলে, নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে বিতরণ করাই যাকাত।

যাকাত ফরজ হওয়ার কতগুলো শর্ত রয়েছে, তা হলো :

১. মুসলিম হওয়া
২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া
৩. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া
৪. স্বাধীন হওয়া
৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া
৬. ঋণমুক্ত হওয়া
৭. এক বছর পূর্ণ মালিকানায় সম্পদ থাকা

### ৫.৩.২ যাকাত আদায়ের খাতসমূহ

ইসলাম ধর্মানুযায়ী আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কতগুলো খাতে যাকাত আদায় করা হয়; সেগুলো নিম্নরূপ :

**১. স্বর্ণ :** কোনো ব্যক্তির নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ থাকলে তার উপর শতকরা আড়াই ভাগ স্বর্ণ বা সমপরিমাণ মূল্য যাকাত দান করতে হবে।

**২. রৌপ্য :** সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য থাকলে শতকরা আড়াই ভাগ বা সমপরিমাণ মূল্য যাকাত হিসেবে দান করতে হবে।

**৩. স্বর্ণ ও রৌপ্য :** স্বর্ণ ও রৌপ্য মিলিতভাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হলে শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত দিতে হবে।

**৪. নগদ অর্থ :** বৎসর শেষে যাবতীয় খরচ বাদে যে পরিমাণ নগদ অর্থ ব্যাংক, বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বৈদেশিক মুদ্রা বা জমা অর্থ থাকে তার উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দান করা বাধ্যতামূলক।

**৫. উৎপন্ন ফসল :** সেচবিহীন উৎপন্ন ফসলের ১/১০ ভাগ এবং যান্ত্রিক সেচের ফলে উৎপন্ন ফসলের ১/২০ ভাগ যাকাত দান ফরজ।

**৬. গৃহপালিত পশু :** লাভজনক উদ্দেশ্যে পশুপালন করলে পশুর সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট হারে যাকাত দান করতে হবে।
ক. প্রতি ৩০টি গরু বা মহিষের জন্য এক বছরের অধিক বয়সের ১টি বাছুর যাকাত দান ফরজ।
খ. প্রতি ৪০টি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বার জন্য ১ বছরের অধিক বয়সের ১টি বাছুর যাকাত দান করা ফরজ।

**৭. ব্যবসায়িক পণ্য :** ব্যবসায়িক পণ্য বা মুলধনের পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্যের সমান হলে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দান বাধ্যতামূলক।

**৮. খনিজ দ্রব্য :** যে কোনো ভূমিতে খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন বা অনুরুপ সম্পদ পাওয়া গেলে তা ব্যবহারের পূর্বে ১/৫ ভাগ হিসেবে যাকাত দান ফরজ।

### ৫.৩.৩ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

ইসলাম ধর্মে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে যাকাত একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়। এটি ধনী মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক কর বিশেষ। যাকাতের অর্থ যেকোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না। আল্লাহ যাকাত বণ্টনের খাতগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর তা হলো :

১. ফকির বা নিঃস্ব ব্যক্তি;

২. মিসকিন বা দরিদ্র শ্রেণি;
৩. যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি;
৪. মুক্তিকামী ক্রীতদাস;
৫. অর্থসংকটে নিপতিত পথিক;
৬. আল্লাহর সাধনায় সদা নিবেদিত ব্যক্তি;
৭. ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তি; এবং
৮. ইসলাম গ্রহণ তথা ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে বিপন্ন ব্যক্তি।

### ৫.৩.৪ সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব

যাকাতের আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব অনন্য ও অপরিসীম। ইসলামের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনকল্যাণে যাকাত এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **সম্পদের সুষম বণ্টন :** ইসলাম ধনী কর্তৃক নিরঙ্কুশ সম্পদ সঞ্চয়কে সমর্থন করে না। বরং সম্পদের মালিককে তার মোট সম্পদের ২.৫ শতাংশ অসহায় ও দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে দান করার নির্দেশ দিয়েছে, যা সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে।

২. **ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধন সৃষ্টি :** যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, সমবেদনা ও সহনশীলতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির সাথে সম্পর্কের বন্ধন তৈরি হয়।

৩. **নিরাপত্তা ও কল্যাণ :** যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যাকাতের মাধ্যমে দুঃস্থ অসহায় শ্রেণির মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

৪. **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা :** যাকাত ধনীদের আরো ধনী ও গরীবদের/দরিদ্রদের আরো দরিদ্র হওয়া থেকে বিরত রাখে। সমাজের অস্বচ্ছলদের প্রতি দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছলদের উদ্বুদ্ধ করে। ফলে মানুষের মধ্যে সদ্ভাব ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. **নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ :** যাকাতের মাধ্যমে মানবমনের সুন্দর প্রবৃত্তিগুলো জাগ্রত হয় ফলে নৈতিক ও মানবিক মূল্যাবোধগুলো ভ্রাতৃত্বের অভাব মোচনে সক্রিয় থাকে।

## সারসংক্ষেপ

যাকাত ইসলামে অবশ্য পালনীয় একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে দরিদ্রের প্রতি ধনীদের দায়িত্ব-কর্তব্য প্রতিফলিত হয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ যথাযথভাবে যাকাত প্রদান করলে দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট অনেকটা হ্রাস পায়। এটি সামাজিক সাহায্যনির্ভর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্যতম দৃষ্টান্ত। ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হলো যাকাত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি?
ক) খয়রাত খ) সদ্‌কা গ) যাকাত ঘ) ওয়াক্‌ফ

২। কোনটি বিশ্বের সর্বপ্রথম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা?
ক) যাকাত খ) চ্যারিটি গ) ওয়াক্‌ফ ঘ) দেবোত্তর

৩। যাকাতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের–
i. সুসংগঠিত বৈশিষ্ট্য
ii. বিশৃঙ্খলার বৈশিষ্ট্য
iii. প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৫.৪ ঐহিত্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মগোলা (Dharmagola as a Traditional Social Welfare Institution)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৫.৪.১ ধর্মগোলার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৫.৪.২ ধর্মগোলার কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন।
৫.৪.৩ সমাজকল্যাণে ধর্মগোলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ৫.৪.১ ধর্মগোলা কী?

প্রাচীন ও ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মগোলা অন্যতম। বর্তমানে ধর্মগোলা নেই কিন্তু ধর্মগোলার নীতির উপর ভিত্তি করে বর্তমান গ্রামদেশে এখনো এ ধরনের সেবা কার্যক্রম বিদ্যমান। ধর্মগোলা এমন একটি বিশেষ শস্যভান্ডার যাতে মৌসুমের সময় স্থানীয়ভাবে উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহ করে মজুদ রাখা হয় এবং পরবর্তীতে খাদ্যাভাব দেখা দিলে দুর্গতদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বিশিষ্ট মানবপ্রেমীদের চিন্তাভাবনায় গড়ে ওঠে ধর্মগোলা। স্থানীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলা– এ নীতির উপর ভিত্তি করে ধর্মগোলার উদ্ভব। ভারত বিভক্তির পর থেকে ধর্মগোলার অস্তিত্ব ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং পোকামাকড়ের আক্রমণে ব্যাপক ফসলহানি ঘটে। যে কারণে কৃষক সমাজ চরম দুরবস্থার শিকার হয়ে পড়ে এবং তারা চড়া সুদে গ্রাম্য মহাজনদের নিকট থেকে অর্থ বা শস্য ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এটা বন্ধ করতে স্থানীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ধর্মগোলা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

## ৫.৪.২ ধর্মগোলার কার্যক্রম

ধর্মগোলার কার্যক্রমসমূহ হলো :

ক. ফসলের মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সমষ্টি শস্যভান্ডার গঠন করা।
খ. দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগকালে সংগৃহীত খাদ্যশস্য বিতরণ করা।
গ. অনাহার, মৃত্যু ও মহামারি প্রতিরোধ করা।
ঘ. গ্রামীণ মহাজন ও সুদখোরদের হাত থেকে কৃষককূলকে রক্ষা করা।
ঙ. নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ও সমষ্টিগত বিপর্যয় মোকাবিলা করা।

## ৫.৪.৩ সমাজকল্যাণে ধর্মগোলার গুরুত্ব

ধর্মগোলা শুধু আপতকালীন খাদ্য সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সমাজসেবা ও কল্যাণকর পদক্ষেপ হিসেবে সমাজকল্যাণে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে প্রচলিত খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মগোলার ধারণা ও নীতি অনুসরণ করা যায়। এছাড়াও–

১. স্থানীয় প্রচেষ্টায় দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি মোকাবিলায় ধর্মগোলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।
২. এটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বিনাসুদে ঋণদান ও মহাজন ও সুদখোরদের কবল থেকে কৃষকদের রক্ষা কবচ।
৩. দুঃস্থ ও অসহায়দের কল্যাণে নিবেদিত।
৪. সমষ্টিগত উদ্যোগে সমস্যা মোকাবিলা ও চাহিদা পূরণে ধর্মগোলার গুরুত্ব রয়েছে।

সুতরাং বলা যায় যে, সমাজকল্যাণে ধর্মগোলার গুরুত্ব বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার এক অনন্য দৃষ্টান্ত ধর্মগোলা।

## সারসংক্ষেপ

দুর্ভিক্ষ ও আপতকালীন সময়ে অনহারে অকালমৃত্যু রোধ করার লক্ষ্যে ১৯৪২-৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ধর্মগোলা গড়ে তোলা হয় যাতে শস্য মৌসুমে উদ্বৃত্ত শস্য এই শস্যভান্ডারে মজুদ রাখা হতো এবং বিপদকালীন সময়ে কৃষকদের মাঝে বিনাসুদে বিতরণ করা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত খাদ্য সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য জেলা ও মহকুমা কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন বোর্ডগুলো ধর্মগোলা গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে জনগণের নির্বাচিত গ্রামীণ ফুড কমিটি ধর্মগোলার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতো। সার্কেল অফিসার এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ ধর্মগোলা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতো। এভাবে এই শস্যভান্ডার আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতো।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন নীতির উপর ভিত্তি করে ধর্মগোলার উদ্ভূত?
ক) সুদহীন ঋণদানের মাধ্যমে কৃষকের মুক্তি
খ) দুর্গত মানুষকে অকাল মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা
গ) স্থানীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলা
ঘ) জাতীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলা

২। কোন সময়ে ধর্মগোলা গড়ে তোলা হয়?
ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন
খ) ১৯৪০–৪১
গ) ১৯১৩–১৪
ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন

## পাঠ-৫.৫ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাইখানা (Saraikhana as a Traditional Social Welfare Institution)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৫.৫.১ সরাইখানার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৫.৫.২ সরাইখানার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

### ৫.৫.১ সরাইখানা কী?

যে সকল ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বহুদিন যাবৎ দুর্গত মানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে সেগুলোর মধ্যে সরাইখানা অন্যতম। সরাইখানা আধুনিককালের মুসাফিরখানারই প্রতিরূপ। সরাইখানার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো æInn''। সাধারণভাবে সরাইখানাকে বিশ্রামাগার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মধ্যযুগে বর্তমানের ন্যায় উন্নত রাস্তাঘাট ও যানবাহন ছিল না। তখন মানুষকে পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে দূরের রাস্তা পাড়ি দিতে হতো। ফলে পথিমধ্যে বিশ্রাম ও রাত্রিযাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো। এমন প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে প্রজাহিতৈষী শাসক, উদার সম্পদশালী ব্যক্তি, ফকির, দরবেশ প্রমুখ ব্যক্তিগণ পথিকের জন্য বিনামূল্যে বিশ্রাম, খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ এবং রাত্রি যাপনের জন্যে বড় বড় রাস্তার পাশে বিশ্রামাগার স্থাপন করতেন। এমন বিশ্রামাগারই সরাইখানা নামে পরিচিত। ক্লান্ত-শ্রান্ত পথিকদের বিনাপয়সায় খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা এবং অসুস্থদের সেবা করার লক্ষ্যেই সরাইখানা নির্মাণ করা হতো। যার মূলভিত্তি মানবসেবা। মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে গৃহতুল্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হতো। সম্রাট শের শাহ সোনারগাঁ থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত যে বিখ্যাত গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন, তার পাশে অসংখ্য সরাইখানা নির্মাণ করেন। বর্তমানে সরাইখানার আদলে বড় বড় হোস্টেল, হোটেল, মোটেল, পর্যটন কেন্দ্র, বোর্ডিং, সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলো, রেস্টহাউজ প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। এখানে অত্যাধুনিক সকল সুবিধাই বিদ্যমান তবে এসব সেবাদান ব্যবস্থা মূলত বাণিজ্যিক এবং টাকার বিনিময়ে সেবা দেয়া হয়।

### ৫.৫.২ সরাইখানার গুরুত্ব

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাইখানার গুরুত্ব অপরিসীম। মধ্যযুগের ফকির, দরবেশ, ধর্মপ্রচারক এবং প্রজা দরদী শাসকগণ পথিক ও ভক্তদের সুবিধার্থে সরাইখানা স্থাপন করতেন। এগুলো গুজরাখানা ও মুসাফিরখানা নামেও পরিচিত ছিল। এসব সরাইখানায় বিনাখরচে খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম ও অসুস্থদের সেবাদানের ব্যবস্থা করা হতো। ইসলাম ধর্মের প্রচারকগণ তাদের খানকার পাশে সরাইখানা নির্মাণ করে নব্যমুসলিমদের আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করতেন। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আনুসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এতই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যে, সরাইখানার প্রয়োজনীয়তা একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। অবশ্য যেসব দেশ ও এলাকায় এখনো যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন উন্নয়ন ঘটেনি সেসব স্থানে এর

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আধুনিক সংস্করণ হিসেবে সার্কিট হাউজ, রেষ্ট হাউজ, ডাক বাংলো প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সরাইখানার পরিবর্তে স্থান করে নিয়েছে । এছাড়াও সরাইখানা মানবকল্যাণে যেসকল অবদান রাখতে সক্ষম হয় তা হলো :

১. এখানে পথিক, পর্যটক ও মুসাফির গোষ্ঠী বিনাখরচে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পায়।

২. এখানে আশ্রিতরা চোর-ডাকাত-খুনিদের হাত থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

৩. অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের সুচিকিৎসার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

## সারসংক্ষেপ

যদিও আধুনিক বিশ্বে সরাইখানার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, তথাপিও মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাইখানা অন্যতম। অতিথিসেবা ও মানবকল্যাণের অন্যতম পথনির্দেশক এই ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানটি অনেকাংশে সমাজকর্মের দর্শন ও মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ?
ক) লঙ্গরখানা খ) সরাইখানা গ) ধর্মগোলা ঘ) দেবোত্তর

২। সরাইখানার মূল চালিকা শক্তি কী?
ক) সহযোগিতা খ) বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি গ) নৈতিকতা ঘ) মানবপ্রেম

৩। কে গ্রান্ডট্র্যাঙ্ক রোডের পাসে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হিন্দু-মুসলমানদের জন্যে পৃথক সরাইখানা ব্যবস্থা করেছিলেন?
ক) ফিরোজ শাহ খ) সম্রাট অশোক গ) শের শাহ ঘ) সিরাজ শাহ

## পাঠ-৫.৬ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর (Debottor as a Traditional Social Welfare Institution)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৫.৬.১ দেবোত্তর কী তা জানতে পারবেন।

৫.৬.২ দেবোত্তরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৫.৬.১ দেবোত্তর কী?

হিন্দু সমাজে প্রচলিত স্থায়ীভাবে সম্পত্তি উৎর্সগের নাম দেবোত্তর প্রথা। এটি অন্যতম সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান এবং মানবকল্যাণে গুরুত্ব অপরিসীম। দেবোত্তর শব্দের আভিধানিক অর্থ দেবতা বা ঈশ্বরের সম্পত্তি। হিন্দুধর্মের কোনো অনুসারী সম্পত্তি উৎসর্গ করলে সে সম্পত্তিকে দেবোত্তর সম্পত্তি বলে এবং যে ব্যক্তি সম্পত্তি উৎসর্গ করে তাকে দেবোত্তরস্বায়ী বলা হয়। আর হিন্দু ধর্মানুসারী পাপমোচন, ক্ষমালাভ, পূণ্যার্জন ও সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দেবতার অনুকূলে স্থায়ীভাবে সম্পত্তি (আংশিক বা সম্পূর্ণ) উৎসর্গ করার প্রথাকে দেবোত্তর বলে। এ প্রথার লক্ষ্য হচ্ছে দেবতার সন্তুষ্টির সাথে সাথে হিন্দু সমজের কল্যাণ এবং ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা। নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দেবোত্তর সম্পত্তি দান করা যেতে পারে :

ক. কোন দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজার্চনার জন্য

খ. দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ ভোজের জন্য

গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্তে বৃত্তি প্রদানের জন্য

ঘ. হাসপাতাল স্থাপনের জন্য

হিন্দু ধর্মানুযায়ী দেবোত্তর দু'ধরনের। যথা :

১. **আংশিক দেবোত্তর :** যখন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে সম্পত্তি উৎসর্গ করা হয় তখন তাকে আংশিক দেবোত্তর বলে। এধরনের দেবোত্তর ব্যক্তির পরিবার পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

২. **সার্বিক দেবোত্তর :** ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে স্থায়ীভাবে সম্পত্তি উৎসর্গের প্রথাই সার্বিক দেবোত্তর। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়।

### ৫.৬.২ দেবোত্তরের গুরুত্ব

সমাজকল্যাণ ও আর্তমানবতার সেবা ও হিন্দুধর্মের প্রসারে দেবোত্তরের বহু গুরুত্ব রয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশে বহু মন্দির, আশ্রম, পূজামণ্ডপ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছে এবং হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানাদি, পূজা-পার্বন ইত্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে। দেবতাকে সন্তুষ্ট করার মধ্য দিয়ে পাপমোচন ও মৃত্যুর পর স্বর্গবাসী হওয়ার উপায় হিসেবে মূলত দেবোত্তর প্রথার উদ্ভব। তীর্থ স্থানসমূহে তীর্থযাত্রীদের থাকা, খাওয়াসহ অন্যান্য প্রয়োজন পূরণে দেবোত্তর সম্পত্তির অবদান ও ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়াও তৎকালীন হিন্দু জমিদার, ধনাঢ্য ও মানবহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ আর্তমানবতার সেবায় দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছেন, যা সমাজসেবারই অংশ হিসেবে গণ্য হয়। তাই ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর প্রথার তাৎপর্যও গুরুত্ব অনেক।

## সারসংক্ষেপ

দেবতা শব্দ থেকেই মূলত দেবোত্তর শব্দটি এসেছে। মূলত স্বর্গলাভ ও পাপমোচনের জন্যই এই প্রথাটি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। দেবতার সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণ সাধন এবং ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা দেবোত্তর প্রথার লক্ষ্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারীকে কী বলে?

ক) রক্ষণাবেক্ষণকারী খ) সেবায়েত

গ) মোতওয়াল্লি ঘ) তত্ত্বাবধানকারী

২। দেবোত্তরের ধরন কয়টি?

ক) ৩টি খ) ২টি

গ) ৪টি ঘ) ৫টি

## পাঠ-৫.৭ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বায়তুলমাল (Baitulmaal as a Traditional Social Welfare Institution)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৫.৭.১ বায়তুলমাল কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.৭.২ সমাজকল্যাণে বায়তুলমালের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

### ৫.৭.১ বায়তুলমাল কী?

বায়তুলমাল জনকল্যাণে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। যেসব সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ইসলাম ধর্মের মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনকল্যাণে অবদান রেখে আসছে সেগুলোর মধ্যে বায়তুলমাল অন্যতম। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রবর্তন করেন।

'বায়তুলমাল' শব্দটি গঠিত হয় 'বায়ত' এবং 'মাল' এ দু'টি শব্দের সমন্বয়ে। বায়ত অর্থ ঘর; আর মাল অর্থ ধন বা সম্পদ। সুতরাং বায়তুলমাল শব্দের অর্থ সম্পদের ঘর বা ধনাগার। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শাসনকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রবর্তিত রাজকোষকে বায়তুলমাল বলা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য বায়তুলমাল গঠিত হয়।

বায়তুলমালের আয়ের উৎস অনেক। যেসব উৎস হতে সম্পদ জমা হতো সেগুলো হচ্ছে মুসলমানদের ভূমি, রাজস্ব ও খনিজ সম্পদের ধার্যকৃত কর; অমুসলিমদের অধিকারভুক্ত জমির খাজনা ও গনিমতের মাল; উত্তরাধিকারবিহীন জমিজমা, জিজিয়া কর, সদ্‌কা, জাকাত ও দেশের সমষ্টিগত চাহিদা পূরণের জন্য আদায়কৃত চাঁদা বাবদ লব্ধ অর্থ। মূলত বায়তুলমাল রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্পদ। বায়তুলমালের মাধ্যমেই জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়।

### ৫.৭.২ বায়তুলমালের গুরুত্ব

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বায়তুলমাল অন্যতম। এটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণ কাজে সম্পৃক্ততার সূত্রপাত ঘটে। তাই বায়তুলমালকে এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচি হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্তমানে এটির অস্তিত্ব না থাকলেও ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণে এই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানবকল্যাণে এটি নিম্নোক্ত ভূমিকা পালন করে :

১. দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুলমাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি দুঃস্থ, অসহায় ও বঞ্চিত শ্রেণির রক্ষা কবচ হিসেবে বিবেচিত।

২. প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও এতিম শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হতো বায়তুলমালের সম্পদের মাধ্যমে।

৩. বায়তুলমাল হতে ইসলামী বিধান মতে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হতো। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এই ঋণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতো।

৪. যাকাতের অর্থ পৃথকভাবে বায়তুলমালে জমা রাখা হতো এবং নির্ধারিত ৮টি খাতে যাকাতের অর্থ সংকুলান না হলে বায়তুলমাল থেকে সহায়তা করা হতো।

৫. বায়তুলমালে গচ্ছিত সম্পদ থেকে রাষ্ট্রীয় শাসনের ব্যয়ভার মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অর্থ সমাজসেবামূলক কাজে ব্যবহার করা হয়।

৬. বায়তুলমালের মাধ্যমে জনগণের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ও মানবকল্যাণে সার্বিক সেবাদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, যা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে তোলে।

## সারসংক্ষেপ

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণে বায়তুলমাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা সমাধানে সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত উপায়ে প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল গঠন তথা সমস্যার সমাধানে অর্থের যোগানের ক্ষেত্রে একটি মোটামুটি স্থায়ী তহবিল করা সম্ভব।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বায়ত শব্দের অর্থ কী?

ক) মাল খ) ঘর গ) আটক ঘ) পবিত্রতা

২। বায়তুলমালের জমাকৃত সম্পদের খাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত–

i. উত্তরাধিকার বিহীন ধনসম্পত্তি

ii. অমুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত জিজিয়া কর

iii. মানবহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছায় দানকৃত ধনসম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৫.৮ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াক্ফ (Waqf as a Traditional Social Welfare Institution)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৫.৮.১ ওয়াক্ফ এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.৮.২ ওয়াক্ফ এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৫.৮.৩ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াক্ফ এর গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

## ৫.৮.১ ওয়াক্ফ কী?

সনাতন সমাজকল্যাণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের পরিচায়ক হলো ওয়াক্ফ। ইসলামে ওয়াক্ফ সমাজকল্যাণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। যেসব ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তার মধ্যে ওয়াক্ফ অন্যতম। ওয়াক্ফ এর শাব্দিক অর্থ হলো আটক; এখানে আটক বলতে দায়কৃত সম্পদের মালিকানা নির্দিষ্ট করাকে বোঝানো হয়েছে। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় ধর্মীয় বা জনহিতকর কোনো কাজে মুসলমান কর্তৃক তার সম্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ স্বত্ব ত্যাগ করে দান করাকে ওয়াক্ফ বলে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতানুযায়ী, ওয়াক্ফ অর্থ উৎসগকৃত বস্তুতে ওয়াক্ফকারীর মালিকানার পরিসমাপ্তি এবং তা আল্লাহর অন্তর্নিহিত মালিকানা দ্বারা আটক হওয়া। যাতে এর আয় মানবজাতির কল্যাণের জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফা (রা.) এর মতে, ওয়াক্ফ শব্দের অর্থ হলো কোনো নির্দিষ্ট ওয়াকিফ অর্থাৎ ওয়াক্ফকারীর মালিকানা আটক করে তার আয় দরিদ্রদের দান করা বা অন্য কোনো সৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা।

প্রকৃতিগত দিক থেকে ওয়াক্ফ দুই ধরনের হয়ে থাকে। ওয়াক্ফ-ই-খায়রী ও ওয়াক্ফ-ই-আহলী। আবার ব্যবহারিক দিক থেকে ওয়াক্ফ তিন ধরনের যেমন– ওয়াক্ফ-ই-খায়রী, ওয়াক্ফ-ই-আহলী ও ওয়াক্ফ-ই-লিল্লাহ।

ক. ওয়াক্ফ-ই-খায়রী হলো যখন কোনো মুসলিম তার সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয় সম্পূর্ণরূপে কোনো জনহিতকরণ কাজে দান করেন তখন তাকে ওয়াক্ফ-ই-খায়রী বলে। এই ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির মাধ্যমে হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এতিমখানা প্রভৃতি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে।

খ. ওয়াক্ফ-ই-আহলী হলো যখন কোনো ওয়াক্ফকারী তার বংশধর বা আত্মীয়-স্বজনদের কল্যাণে সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ ওয়াক্ফ এর মাধ্যমে দান করেন তখন তাকে ওয়াক্ফ-ই-আহলী বলে। যেমন– পিতৃমাতৃহীন নাতী-নাতনীদের দাদা কর্তৃক এরূপ ওয়াক্ফ করা হয়।

গ. ওয়াক্ফ-ই-লিল্লাহ হলো যখন সম্পূর্ণ ধর্মীয় কাজে কোনো মুসলমান তার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন তখন তাকে ওয়াক্ফ-ই-লিল্লাহ বলে। যেমন– মসজিদ, ঈদগাহ, কবরস্থান ইত্যাদির জন্য দান করা এ জাতীয় ওয়াক্ফ এর অন্তর্ভুক্ত।

## ৫.৮.২ ওয়াক্ফ এর বৈশিষ্ট্য

ওয়াক্ফ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো :

ক. ওয়াক্ফ অনেকটাই সর্বজনীন;

খ. এটির আইনগত ভিত্তি আছে;

গ. মুসলিম আইনে এটি স্বীকৃত;

ঘ. ওয়াক্ফের সম্পত্তি স্থাবর-অস্থাবর উভয় প্রকার হতে পারে;

ঙ. ওয়াক্ফ শর্তযুক্ত হয় ;

চ. ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে;

ছ. ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড থাকে; এবং

জ. এটি একটি জনসেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠান।

### ৫.৮.৩ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াক্‌ফ'র গুরুত্ব

সমাজকল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করার প্রয়াসেই ওয়াক্‌ফ প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশেও দুঃস্থ, অসহায় ও বঞ্চিত শ্রেণির রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে অসংখ্য ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। এগুলো সমাজসেবার ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলছে। এছাড়াও–

১. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির দ্বারা বহু জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী পরিচালিত হয়। সম্প্রতি অনেক এতিমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিং, লঙ্গরখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে।

২. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন– পুকুরখনন, খালখনন ও কূপখনন এবং খানকা ও দরবার শরীফ ইত্যাদি পরিচালিত হচ্ছে, যা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৩. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা হয়। যেমন– স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি পরিচালনা, ছাত্রবৃত্তি প্রদানও এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. আশ্রয়দান এর ক্ষেত্রে সরাইখানা, লঙ্গরখানা প্রভৃতি স্থাপন ও পরিচালনা এবং গরীব ও দুস্থদের আশ্রয় ও সহায়তা প্রদান হয় ওয়াক্‌ফ এর মাধ্যমে।

৫. বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মধ্যে সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা, ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, আনজুমান মফিদুল ইসলাম, হামদর্দ দাওয়াখানা প্রভৃতির অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

## সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর অনেক দেশে সরকারি কার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে ওয়াক্‌ফ প্রথা সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি দ্বারা বহু জনহিতকর কার্য সমাধান করা হয়েছে এবং ফলাফল জনগণ অদ্যাবধি ভোগ করছেন। সুতরাং বলা যায়, দরিদ্র ও অনুন্নত দেশে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপশি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ওয়াক্‌ফ এর গুরুত্ব অনেক। আমাদের দেশে হাজী মুহম্মদ মুহসীন, নওয়াব ফয়জুন্নেসা প্রভৃতি জনদরদি তাঁদের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে গেছেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন :

১। ওয়াক্‌ফ এর শাব্দিক অর্থ কী?
ক) ঘর খ) আগার গ) মাল ঘ) আটক

২। যখন কোনো ধর্মীয় কাজে কোনো মুসলমান তার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন তখন তাকে কী বলে?
ক) ওয়াক্‌ফ-ই-খাইরী খ) সদ্‌কা গ) ওয়াক্‌ফ-ই-আহলী ঘ) ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ

৩। ওয়াক্‌ফ কত ধরনের?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

## পাঠ-৫.৯ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতিমখানা (Orphanage as a Traditional Social Welfare Institution)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৫.৯.১ এতিমখানার ধারণা দিতে পারবেন।

৫.৯.২ এতিমখানার কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৫.৯.৩ এতিমখানার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

### ৫.৯.১ এতিমখানা কী?

এতিমখানা ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত শিশুকল্যাণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। দানশীলতার অব্যবহিত পরে এতিমখানার উদ্ভব ঘটে প্রাচীনকালে। এতিম, অনাথ ও পরিত্যক্ত শিশুদের পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছে এতিমখানা।

সাধারণত এতিম বলতে আমরা পিতৃ-মাতৃহীন শিশু বা উভয়ের একজন নেই এমন শিশুদের বুঝে থাকি। আর এতিমখানা বলতে যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত এতিম, দুঃস্থ, অসহায়, অনাথ শিশুদের লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তাকেই বুঝায়। সাধারণত পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের এখানে রাখা হয় এবং আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানাকে শিশুসদন বা শিশুপরিবার বলা হয়। বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে সরকার ৪টি এতিমখানা চালু করেন। দানশীল ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এতিমখানা স্থাপন করে। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত এতিমখানার সংখ্যা হচ্ছে ১৮০০ এর অধিক।

### ৫.৯.২ এতিমখানার কার্যক্রম

এতিমখানা ও শিশুসদনের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

ক. শিশুদের পরিচর্যা, ভরণ-পোষন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
খ. প্রয়োজনীয় মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ;
গ. পারিবারিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান;
ঘ. সামাজিকীকরণ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
ঙ. চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে মানবিক বিকাশ সাধন;
চ. বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা;
ছ. চিকিৎসা প্রদান ও স্বাভাবিক পরিবেশে বসবাসের সুযোগ করে দেয়া; ও
জ. সমাজে পুনর্বাসিত করার পাশাপাশি মেয়েদের বিবাহ সম্পাদন করা।

### ৫.৯.৩ এতিমখানার গুরুত্ব

সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতিমখানা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন জনহিতকর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এতিমদের সুরক্ষায় তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সরকারিভাবেও এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এসকল এতিমখানা পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকার সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে এতিমখানার জন্য, যা সরকারি শিশুপরিবার নামে পরিচিত শিশু সুরক্ষা ও কল্যাণে কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশে সরকারি এতিমখানাগুলো শিশুপরিবার বা বেবিহোম নামে পরিচিত। এখানে একজন আপা ও একজন ভাইয়ার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ২০-২৫ জন এতিম পারিবারিক পরিবেশে বড় হচ্ছে। এছাড়াও এতিমখানাগুলো বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। যেমন– এসওএস শিশুপল্লী ঢাকার শ্যামলীতে রয়েছে। তাই বলা যায় যে, এতিম, অসহায়, দুঃস্থ ও পরিত্যক্ত শিশুর সুরক্ষা এবং কল্যাণে তাদের আবাসন ও লালন পালন, পারিবারিক স্নেহ, ভালোবাসা, শিক্ষা, মৌলিক চাহিদা পূরণ, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ, নিরাপত্তা, স্বনির্ভরতা অর্জনসহ তাদের পূনর্বাসনের জন্য এতিমখানার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

## সারসংক্ষেপ

সনাতন সমাজকল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো এতিমখানা। পিতৃহীন, পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের লালনপালন ও ভরণ-পোষণসহ তাদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান ও সুষ্ঠু, যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাই হলো এতিমখানা। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে অসংখ্য এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কার্যপরিধির ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান থেকে এতিমখানার গুরুত্ব সর্বাধিক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি শিশুকল্যাণে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান?
ক) লঙ্গরখানা খ) সরাইখানা গ) এতিমখানা ঘ) বায়তুলমাল

২। এতিমখানার উদ্দেশ্য হলো–
i. এতিম শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা
ii. শিশুদের নিরাপদ আশ্রয় ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা
iii. অনাথ শিশু-কিশোরদের সামাজিক পরিবেশে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সরাইখানার আধুনিক রূপ কোনটি?
ক) বিদ্যালয় খ) পর্যটন গ) হোটেল ঘ) এতিমখানা

২। যাকাত শব্দের অর্থ কী?
ক) দান খ) পবিত্রতা গ) সেবা ঘ) ন্যায়বিচার

৩। দেবোত্তরের আভিধানিক অর্থ–
i. মানুষের সম্পত্তি
ii. দেবতার সম্পত্তি
iii. ঈশ্বরের সম্পত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। কোনটি বিশ্বের একমাত্র ধর্মীয় বাধ্যতামূলক কর?
ক) সদ্‌কা খ) যাকাত গ) ওয়াক্‌ফ ঘ) খয়রাত

৫। সম্পত্তি দেবোত্তর করার উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত–
i. হাসপাতাল স্থাপনের জন্যে
ii. দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ ভোজের জন্যে
iii. মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। বাংলাদেশে শিশুপালন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আখ্যায়িত করা হয়–
i. বেবিহোম
ii. শিশু পরিবার
iii. শিশু সদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল কোনটির সাথে তুলনীয়?
ক) বায়তুলমাল খ) ধর্মগোলা গ) সদ্‌কা ঘ) যাকাত

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দিলারা হোসেন অনেক সম্পত্তির মালিক। তিনি প্রতি বছর তার মোট সম্পত্তি হিসাব করে একটি নির্দিষ্ট অংশ মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী দান করেন। এটি ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী তার একটি বাধ্যতামূলক কাজ।

ক) দেবোত্তর কত প্রকার? ১
খ) এতিমখানার ধারণা দিন। ২
গ) উদ্দীপকে দিলারা হোসেনের কাজে সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার কোন রূপ প্রকাশ পেয়েছে?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) সমাজকর্মে উক্ত ব্যবস্থার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। জনাব রেজওয়ানুল হক তাদের এলাকায় বড় রাস্তার পাশে একটি বড় বাড়ি নির্মাণ করেন। নিজের প্রয়োজনে তিনি এটি ব্যবহার করেন না। এই পথে চলাচলকারী পথিক মুসাফিরগণ এখানে বিনামূল্যে বিশ্রাম নিয়ে থাকেন। তাদের জন্য বিনামূল্যে খাবার ও ঔষুধ তিনি সরবরাহ করেন।

ক) ওয়াক্ফ কত প্রকার? ১
খ) সরাইখানার ধারণা দিন। ২
গ) উদ্দীপকে রেজওয়ানুল হক সমাজকল্যাণ ব্যবস্থায় কোন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) সমাজকর্মে উক্ত ব্যবস্থা অনেক গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ করুন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ : ১। গ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ : ১। খ ২। ঘ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ : ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৮ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৯ : ১। গ ২। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৫ : ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ ৬। ঘ ৭। ক

# সমাজকর্ম এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও পেশার মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between of Social Work and Other Branches of Knowledge and Professions)

**ইউনিট ৬**

## ভূমিকা

সমাজকর্ম একটি সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান। মানুষের বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধানকল্পে সমাজকর্ম অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে তার অধিকাংশ জ্ঞান আহরণ করেছে। আর সামাজিক বিজ্ঞান হলো সেই বিজ্ঞান যা সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে অর্থাৎ তাদের আচার-আচরণ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, পারস্পরিক সম্পর্ক, কৃষি, সংস্কৃতি তথা গোটা সমাজকে নিয়ে আলোচনা করে এবং তথ্য উদঘাটন ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম পেশাগত সেবার মর্যাদায় পরিগণিত আর সমাজকর্মের চলার পথকে সুগম করেছে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও পেশার সাথে সমাজকর্মের গভীর সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। এই ইউনিটে সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ-৬.১ : সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.২ : সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৩ : সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৪ : সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৫ : সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৬ : সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৭ : সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৮ : সমাজকর্ম ও আইন পেশার মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৯ : সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.১০ : জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম


## পাঠ-৬.১ সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Sociology)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.১.১ সমাজবিজ্ঞান কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.১.২ সমাজকর্মের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

### ৬.১.১ সমাজবিজ্ঞান কী?

সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান, যা সমাজের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে। এর মধ্যে সমাজকাঠামো, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজিক পরিবর্তনের ধারা এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়া অন্যতম। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ডুর্খেইমের মতে, সমাজবিজ্ঞান হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান।

Ginsberg এর মতে, সমাজবিজ্ঞান মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃসম্পর্কের শর্ত ও ফলাফল সম্পর্কিত অধ্যয়ন। Max Weber এর মতে, সমাজবিজ্ঞান হলো ঐ বিজ্ঞান যা সামাজিক মানুষকে বিশদভাবে জানার চেষ্টা করে।

অন্যদিকে, সমাজকর্ম মূলত মানুষকে সাহায্য করার একটি পেশা। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে তারা নিজস্ব সামর্থ্য ও সম্পদের ব্যবহারের মাধমে নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, সমাজকর্মের অস্তিত্ব এবং সমাজকর্মের কর্মকাণ্ড এক সামাজিক ব্যবস্থার ভিতর থেকেই পরিচালিত হয়। মূলত এ জন্যই সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মীকে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে যাতে করে তারা সাহায্যার্থীর কল্যাণে কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

## ৬.১.২ সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কিছু সম্পর্ক ও সাদৃশ্য বিদ্যমান। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো :

**প্রথমত :** উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্মের মধ্যকার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রগতি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানে সমাজ ও মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করা হয়। অন্যদিকে সমাজকর্ম সমাজ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ অর্জনে প্রয়াসী হয়।

**দ্বিতীয়ত :** বিষয়বস্তুগত দিক থেকেও সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান সমাজের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম সামাজিক কাঠামোর সকল স্তরে অবস্থিত মানুষকে তাদের উপযুক্ত ভূমিকা পালনে সহায়তা করে।

**তৃতীয়ত :** সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক সমস্যার সমাধান। আর সামাজিক সমস্যা সমাজস্থ মানুষের উপর অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, যা মানুষের স্বাভাবিক ভূমিকা পালনের পথে বাধা দেয়। আর এই সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

**চতুর্থত :** সমাজকর্ম বেশ কিছু মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং তার সেবাদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। দল সমাজকর্ম ছোট ছোট দল গঠন করে কিছু কৌশল অবলম্বন করে দলীয় সদস্যদের সমস্যার সমাধান দেয়। সেক্ষেত্রে দল সমাজকর্মীকে সামাজিক দল, দলের বৈশিষ্ট্য, দলীয় দ্বন্দ্ব, দলীয় গতিশীলতা, দলীয় আন্তঃক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা বা সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর দলের সকল বিষয় কেবলমাত্র সমাজবিজ্ঞানেই বিস্তারিত আলোচনা করা যায়।

**পঞ্চমত :** সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কের আর একটি দিক হলো সমাজ সম্পর্কে উভয়েরই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান কোনো একটি বিশেষ দিকে আলোচনা করে। যেমন– মনোবিজ্ঞানে কেবল মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

**ষষ্ঠত :** সমাজবিজ্ঞানে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আবার সমাজকর্মও একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক বিজ্ঞান। গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ এটিকে আরো সমৃদ্ধ করছে।

**সপ্তমত :** উৎপত্তিগত দিক থেকেও সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক গভীর। উভয়েরই উৎপত্তি ও বিকাশ শুরু হয়েছে শিল্পবিপ্লবের অব্যবহিত পর।

উপর্যুক্ত আলোচনা প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক শুধু ঘনিষ্টই নয় বরং পারস্পারিক নির্ভরশীলও বটে। উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু মৌলিক পার্থক্যও বিদ্যমান। আর তা হলো :

১। সমাজবিজ্ঞান একটি মৌলিক বিজ্ঞান। অন্যদিকে সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে জ্ঞান আহরণ করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ সমাজকর্ম হলো একটি সমন্বিত বিজ্ঞান।

২। পরিধিগত দিকেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক, কিন্তু সমাজকর্মের পরিধি অপেক্ষাকৃত কম।

৩। সমাজবিজ্ঞান একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান; পক্ষান্তরে সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

৪। সমাজবিজ্ঞান তাত্ত্বিক বিজ্ঞান হওয়ার কারণে এটি নিজস্ব গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, সমাজকর্ম নতুন জ্ঞান সৃষ্টির পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হয়।

৫। সমাজকর্মীদের জন্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য; কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োজন হলেও অপরিহার্য নয়।

৬। সমাজকর্ম দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান দর্শন কল্যাণমুখী চিন্তাধারায় এক নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উভয়ের সাথে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একে অপরের পরিপূরক। একটি জ্ঞান আহরণ করে অপরটি মানবকল্যাণে তা প্রয়োগ করে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের জ্ঞানগত ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা সমাজবিজ্ঞানের উপর ব্যাপক নির্ভরশীলতা রয়েছে। উভয়রেই লক্ষ্য মানবীয় মঙ্গল সাধন হওয়ায় দুইয়ের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। অর্থাৎ সমাজকর্ম সমাজস্থ মানুষের সমস্যার সমাধান কল্পে ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে এবং এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান থেকে সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ এবং ব্যবহার করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। "সমাজবিজ্ঞান হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান"– উক্তিটি কার?
ক) কোভালোভস্কি খ) ডুর্খেইম
গ) পেজ ঘ) ম্যাকাইভার

২। সমাজবিজ্ঞান সমাজকর্মের উপর নির্ভরশীল কেন?
ক) জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য খ) অর্জিত জ্ঞানকে তাত্ত্বিক রূপদানের জন্য
গ) সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের জন্য ঘ) জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য

৩। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক হওয়ার কারণ হলো–
i. ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্থান পেয়েছে
ii. সমাজ জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্থান পেয়েছে
iii. সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চিত্র ফুটে উঠেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৬.২ সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Anthropology)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.২.১ নৃ-বিজ্ঞান কী তা জানতে পারবেন।
৬.২.২ সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

### ৬.২.১ নৃ-বিজ্ঞান কী?

শাব্দিক অর্থে নৃ-বিজ্ঞান বলতে মানুষের বিজ্ঞানকে বোঝায়। Anthropo অর্থ মানুষ এবং Logy অর্থ বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অতীত কাল হতে অদ্যাবধি বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করা হয়। এজন্য নৃ-বিজ্ঞানকে মানুষের বিজ্ঞান বলা হয়। অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি প্রথা প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়েই সাধারণত নৃ-বিজ্ঞানের পথচলা। নৃ-বিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কি এর মতে, নৃ-বিজ্ঞান হলো মানুষ ও তার সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক পাঠ বা আলোচনা।

মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের মতে, প্রাণী হিসেবে মানুষ এবং সামাজিক জীব হিসেবে তার সংস্কৃতির পর্যালোচনাই নৃ-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বস্তুত নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, প্রাণিরাজ্যে তার স্থান তথা এর বিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। নৃ-বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় ই. এ হোবেল বলেন, "নৃ-বিজ্ঞান হলো মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান।"

সুতরাং বলা যায় যে, নৃ-বিজ্ঞান হলো এমন এক শাস্ত্র বা পাঠ, যা মানুষের উৎপত্তি, পরিচয়, ক্রমবিকাশ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে। নৃ-বিজ্ঞান জৈবিক নৃ-বিজ্ঞান ও সাংস্কতিক নৃ-বিজ্ঞান এ দু'ভাগে বিভক্ত।

### ৬.২.২ সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞান উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়। সমাজকর্ম সমাজের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানমূলক কার্যাবলী আলোচনা করে। সমাজকর্মীদের তাই মানব কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। আর তাই এই দুইয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। দু'টি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কগুলো হলো :

১। সমাজকর্ম একটি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া। বহুমুখী জটিল সমস্যার সমাধানে সমাজকর্ম সর্বদা প্রয়াসী, আর এজন্য সমাজকর্মীদের ব্যক্তির দৈহিক গতি, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তাই দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান ব্যক্তি, দল, সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২। সমাজকর্ম অনুশীলনের অন্যতম নীতি হলো ব্যক্তির মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি। অর্থাৎ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ পরিপন্থী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে।

৩। দ্রুত নগরায়ন আধুনিক সময়ের উন্নয়নের এক সূচক বলে বিবেচিত হলেও নগরায়ন সৃষ্টি করছে নানা মনো-সামাজিক সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীকে নগর নৃ-বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। এক্ষেত্রেও সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত।

৪। সমাজকর্ম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। আর বিভিন্ন আচার-আচরণ, বিশ্বাস এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা এই উন্নয়নকে ব্যাহত করে। ফলিত নৃ-বিজ্ঞান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাধা সৃষ্টিকারী এ সকল বিষয় চিহ্নিত করে থাকে এবং সমাজকর্মীকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

৫। সমাজকর্ম অনুশীলনে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মের জন্য সহায়ক। কেননা সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের ভিত্তিই হলো মানুষের পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক।

৬। চিকিৎসা সমাজকর্মের জন্যও নৃ-বিজ্ঞান এর জ্ঞান কার্যকরী হতে পারে। কেননা নৃ-বিজ্ঞানের অন্যতম একটি শাখা হলো চিকিৎসা নৃ-বিজ্ঞান। এটি সমাজে বসবাসরত মানুষের রোগ, চিকিৎসা ও আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, নৃ-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথেই সমাজকর্মের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং দুটিই একে অপরের সহযোগী বলা যায়। গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও দুটি বিজ্ঞানের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

১। নৃ-বিজ্ঞান মূলত তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বা ফলিত বিজ্ঞান।

২। নৃ-বিজ্ঞানে মূলত গবেষণা কার্যে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, পক্ষান্তরে সমাজকর্মে পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং তথ্য সংগ্রহে পরিসংখ্যান ও প্রশ্নমালার সাহায্য নেয়া হয়।

৩। নৃ-বিজ্ঞানে কখনও মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য কখনও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বড় করে দেখা হয়। কিন্তু সমাজকর্মে সবসময়ই মানুষের সামষ্টিক বৈশিষ্ট্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

৪। নৃ-বিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যা সমাজের প্রায় প্রতিটি দিকেই বিস্তৃত। কিন্তু সমাজকর্মের তেমন কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। অর্থাৎ নৃ-বিজ্ঞানের পরিধি সমাজকর্মের তুলনায় ব্যাপক।

৫। নৃ-বিজ্ঞান অতীত নিয়েই বেশি পর্যালোচনা করে, কিন্তু সমাজকর্মের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি আগ্রহ বেশি।

অতএব বলা যায় যে, কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই দুইয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নে সদা সচেষ্ট থাকে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিনির্ভর সেবা ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। পক্ষান্তরে মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ, সংস্কৃতি, গঠন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে নৃ-বিজ্ঞান। তাই আপাতদৃষ্টিতে উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে সমস্যার সমাধান ও ব্যাপক সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়নের গতিকে তরান্বিত করতে সাহায্য করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ, সভ্যতা ও সমাজ নিয়ে আলোচনা করে কোনটি?
ক) জনবিজ্ঞান খ) সমাজকর্ম
গ) সমাজবিজ্ঞান ঘ) নৃ-বিজ্ঞান

২। সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানের জন্য নৃ-তাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় কেন?
ক) মানুষের কার্যকলাপ বিশ্লেষণের জন্য খ) নগরায়ণের সমস্যা সমাধানের জন্য
গ) সমস্যা সমাধানে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘ) সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য

৩। নৃ-বিজ্ঞান মানুষকে যেভাবে পর্যালোচনা করে–
i. প্রাণী হিসেবে ii. সামাজিক জীব হিসেবে iii. রাজনৈতিক জীব হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৬.৩ সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Psychology)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৩.১ মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
৬.৩.২ সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

### ৬.৩.১ মনোবিজ্ঞান কী?

সমাজকর্ম একটি সমন্বিত বিজ্ঞান বিধায় সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিজ্ঞানের সাথেও সমাজকর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এছাড়া অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের তুলনায় সমাজকর্ম মনোবিজ্ঞানের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল। মনোবিজ্ঞান ও এর বিভিন্ন শাখার জ্ঞান সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

মনোবিজ্ঞান হলো আত্মার বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Psychology, যা Psyche এবং Logos শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। Psyche এবং Logos এর পর্যায়ক্রমিক অর্থ হলো মন বা আত্মা এবং বিজ্ঞান বা জ্ঞান। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হলো মন বা আত্মা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। এছাড়াও মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। বিভিন্ন পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন রূপ, আচরণ ও বিভিন্ন আচরণের কারণ এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি হলো মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়।

মনোবিজ্ঞানী ওয়াইসন এর মতে, মনোবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। ক্রাইডার ও অন্যান্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মনোবিজ্ঞান হলো আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা। মনোবিজ্ঞানী প্যাভলভ এর মতে, মনোবিজ্ঞান হচ্ছে দৃষ্টিগোচর আচরণের পর্যালোচনা।

সুতরাং বলা যায়, যে বিজ্ঞান মানবিক ও শারীরিক ক্রিয়ার পারস্পারিক সম্পর্ক বিশেষ করে, যা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে তার অনুধ্যান করে তাকে মনোবিজ্ঞান বলে।

### ৬.৩.২ সমাজকর্মের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ ও মানসিক দিক নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবাঞ্ছিত আচরণ ও মানবিক ত্রুটিজনিত কারণে সৃষ্ট মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধানে চেষ্টা করে। নিম্নে এই দুইয়ের সম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

১। সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করে তাকে সঠিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা। কিন্তু ব্যক্তিভেদে সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, তার আবেগ, বুদ্ধি, হতাশা, বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা প্রভৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই এসব বিষয় সম্পর্কে জানতে একজন সমাজকর্মীকে মনোবিজ্ঞান সহায়তা করতে পারে।
২। সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানে ব্যক্তির নিজস্ব সামর্থ্য, সুপ্ত ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর গুরুত্ব প্রদান করে। আর ব্যক্তির এই সুপ্ত ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা পরিমাপের জন্য মনোবিজ্ঞানে বিশেষ কৌশল ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। সেক্ষেত্রে সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান পরস্পর সহায়ক।
৩। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আবার সমাজকর্মের বিভিন্ন অনুশীলন ক্ষেত্রের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ সমাজকর্মের অনুশীলনের ক্ষেত্র যেমন বহুমুখী তেমনি বহুমুখী অনুশীলন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োগও বহুমুখী।
৪। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো ব্যক্তিকে সমাজ উপযোগী আচরণ করতে সক্ষম করে তোলা। এক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিকে উপযোগী আচরণ শিক্ষা দিতেও মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মীদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
৫। সমাজকর্মের চিকিৎসা পদ্ধতি বহুলাংশে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞাননির্ভর। বিশেষ করে ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তির সমস্যার সমাধান ও আচরণ সংশোধনের জন্য প্রয়োগকৃত সবই মনোবিজ্ঞানেরই আলোচ্য বিষয়।
সুতরাং বলা যায় যে, সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। বিষয়বস্তুগত দিক থেকে উভয়ের অনেক মিল রয়েছে।

সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে যেমন ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। তেমনি উভয়ের মধ্যে কতগুলো মৌলিক পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন :
১। একটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের কিছু নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার তেমন প্রভাব লক্ষ্যণীয় নয়।
২। সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বা অনুশীলনধর্মী বিজ্ঞান। কিন্তু মনোবিজ্ঞান মৌলিক বিজ্ঞান।
৩। মনোবিজ্ঞান মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।পক্ষান্তরে সমাজকর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে।
৪। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর সমাজকর্ম নির্ভরশীল কিন্তু সমাজকর্মের জ্ঞানের উপর মনোবিজ্ঞান ততোটা নির্ভরশীল নয়।
৫। মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব তত্ত্ব রয়েছে। সমাজকর্মের সেই অর্থে নিজস্ব কোনো তত্ত্ব নেই, যদিও তত্ত্বীয় কাঠামো রয়েছে।
উপরিক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তবে সমাজকর্মের অধিকাংশ কার্যক্রম এবং পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে মনোবিজ্ঞান শুধু সহায়তাই করেনা, বরং মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মের জন্য অপরিহার্য।

## সারসংক্ষেপ

মনোবিজ্ঞানের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক নিবিড়। সমাজকর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, আচরণ, আবেগ, অনুভূতি, চাহিদা সম্পর্কে নিবিড় তথ্য পেতে পারে শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞানের সহায়তায়। সমাজকর্ম তার কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় ব্যক্তি ও তার পরিবেশের উপর আর মনোবিজ্ঞান এক্ষেত্রে মানুষ ও তার পরিবেশের ভারসাম্য স্থাপনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করে সমাজকর্মকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মানব আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান কোনটি?
ক) সমাজকর্ম খ) নৃ-বিজ্ঞান
গ) মনোবিজ্ঞান ঘ) জনবিজ্ঞান

২। মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে কেন?
ক) প্রাণীর আচরণ অনুসন্ধানের জন্য খ) মানুষের মানসিক অবস্থা নিয়ন্ত্রনের জন্য
গ) মানুষ ও প্রাণীর আচরণ অনুসন্ধানের জন্য ঘ) মানসিক রোগের থেকে মুক্তি লাভের জন্য

# পাঠ-৬.৪ সমাজকর্মের সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship of Social Work with Civics and Good Governance)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৪.১ পৌরনীতি ও সুশাসন কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৬.৪.২ সমাজকর্মের সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

## ৬.৪.১ পৌরনীতি ও সুশাসন কী?

মানবজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো পৌরনীতি। বর্তমানে পৌরনীতির সাথে সুশাসন কথাটি যুক্ত করে নতুন নামকরণ করা হয়েছে পৌরনীতি ও সুশাসন। সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান। মানববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো পৌরনীতি ও সুশাসনের সঙ্গেও সমাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

### পৌরনীতি

ইংরেজি শব্দ Civics থেকে পৌরনীতি শব্দটি এসেছে। যার অর্থ নাগরিক বা নগররাষ্ট্র। সুতরাং শব্দগত অর্থে পৌরনীতি হলো নগররাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের আচরণ ও কার্যবালী সংক্রান্ত বিজ্ঞান। সাধারণ অর্থে যে শাস্ত্র নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের আচরণ এবং কার্যাবলি নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করে এবং উন্নত ও অগ্রসর নাগরিক জীবন সম্মন্ধে জ্ঞানদান করে তাকে পৌরনীতি বলে।

Oxford Advance Learners Dictionary তে বলা হয়েছে, পৌরনীতি এমন একটি বিষয় যা কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক বা সমাজের সদস্য হিসেবে তাদের অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারে সরকার কী কাজ করে বা ব্যবস্থা নেয় তা আলোচনা করে। অতএব, যে শাস্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলী বিশদভাবে আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।

### সুশাসন

বর্তমান বিশ্বের একটি সর্বাধিক আলোচিত বিষয় সুশাসন, যার মাধ্যমে জানা যায় জনগণ কীভাবে শাসিত হবে এবং তাদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে। রাষ্ট্র ও সরকারের এবং সরকার ও জনগণের সম্পর্ক কেমন হবে সুশাসন প্রত্যয়টি তাও ব্যাখ্যা করে । শাসন এর পূর্বে সু প্রত্যয় সংযোগে সুশাসন শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর অর্থ হলো নির্ভুল, দক্ষ ও ফলপ্রসূভাবে শাসন করা। আইনের শাসন হচ্ছে সুশাসনের অন্যতম উপাদান। সাধারণভাবে বলা যায়, যে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, অবাধ তথ্য প্রবাহ, জনগণকে উন্নত সেবাদান, কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা ও সাম্য বিরাজ করে তাই সুশাসন।

বিশ্বব্যাংক এর মতে, সুশাসন গঠিত হয় রাজনৈতিক জবাবদিহিতা, নিয়মিত নির্বাচন, শাসন ব্যবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থাপনা, পেশাগত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, তথ্যের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা, সুদক্ষ ও ফলপ্রসূ প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সুশীলসমাজ ও সরকারের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসন হলো এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, আচার-আচরণ এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে ধারাবাহিক পর্যালোচনা করে।

## ৬.৪.১ সমাজকর্মের সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের সম্পর্ক

আপাতদৃষ্টিতে পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজকর্মকে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির সামাজিক বিজ্ঞান বলে মনে হলেও এদের সাথে সমাজকর্মের নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে । নিম্নে সমাজকর্মের সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের সম্পর্ক তুলে ধরা হলো :

১। পৌরনীতি ও সুশাসনে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়াবলী এবং এর সাথে সাথে সরকারের নানামুখী কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়, যার লক্ষ্য জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। অন্যদিকে, সমাজকর্মও তার বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসাধারণের কল্যাণ অর্জনে প্রয়াসী। কাজেই জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ট।

২। সমাজকর্মের নীতিমালার মধ্যে অন্যতম হলো ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি। আর এ জন্য সমাজকর্মীরা ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অধিকার নিশ্চিত করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজকর্মের অনুশীলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।
৩। আধুনিক সময়ে রাষ্ট্র মানেই কল্যাণরাষ্ট্র। কাজেই পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান সমাজকর্মীদেরকে আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করার মাধ্যমে কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের রূপরেখা প্রণয়নে সহায়তা করে।
৪। সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণ। আর এই বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের জন্য দরকার হয় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা। পৌরনীতি ও সুশাসন মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে। কাজেই পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান সমাজকর্মের জন্য আবশ্যক।
৫। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়নে সহযোগিতা করে। সমাজকর্মও পরিবর্তন আনয়নের কৌশল হিসেবে আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।
৬। পৌরনীতি ও সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেতৃত্ব, নেতার ধরন, আবির্ভাব, নেতৃত্বের গুণাবলী প্রভৃতি বিষয়। অপরদিকে সমাজকর্ম, বিশেষ করে দল সমাজ এবং সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন ভিন্ন প্রকৃতির মনে হলেও জনকল্যাণে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আবার উভয়ের সাথে কিছু বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। যেমন :
১। পৌরনীতি ও সুশাসন একটি তত্ত্বনির্ভর মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে, সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান।
২। সমাজকর্মের পরিধি পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি অপেক্ষা বিস্তৃত।
৩। সমাজকর্ম পৌরনীতি ও সুশাসনকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচেনা করে। অন্যদিকে, পৌরনীতি ও সুশাসন এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার করা যায়।
৪। পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজকর্ম সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করে। আর সমাজকর্ম তা সমাজসেবায় রূপান্তরিত করে।
৫। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সরকার গঠন ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম বিভিন্ন সেবা কার্মসূচীর মাধ্যমে মানুষের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে; তেমনি তাদের সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায় সমাজকর্মীদের প্রজ্ঞার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। অর্থাৎ উভয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পৌরনীতির উদ্দেশ্য কী?
ক) জনগণের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা খ) জনগণের ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা
গ) সুনাগরিকের গুণাবলী বিশ্লেষণ করা ঘ) সুষ্ঠু ও সুন্দর নগরব্যবস্থা গড়ে তোলা

২। সমাজকর্মের সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের পার্থক্য বিদ্যমান কারণ–
i. পৌরনীতি ও সুশাসন কেবল নগরিকতা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে; অন্যদিকে সমাজকর্ম সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা করে।
ii. সমাজকর্ম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত; পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্রের কার্যাবলী নিয়ে ব্যাপৃত
iii. পৌরনীতি ও সুশাসন সরকার গঠন নিয়ে ব্যাপৃত, অন্যদিকে সমাজকর্ম মানুষের কল্যাণ নিয়ে ব্যাপৃত।

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৬.৫ সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Economics)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৫.১ অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।

৬.৫.২ সমাজকর্মের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

## ৬.৫.১ অর্থনীতি কী?

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনযাত্রার এক অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই আদিমকাল থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় এবং বর্তমানে সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতি সমাজ উন্নয়ন ও মানবকল্যাণে প্রত্যাশী। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তন এবং গতিশীলতার কারণেই সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় আজকের দিনের সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি। আর সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যবিধানে এবং পরিকল্পিত সমাজ গঠনের একটি বিশেষ রূপ অর্থনীতি। মূলত সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে অর্থনীতি সমাজস্থ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে পর্যালোচনা করে।

মার্শাল এর মতে, অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলী পর্যালোচনা করে।

অধ্যাপক পিগু বলেন, সামাজিক কল্যাণের যে অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় তার আলোচনা করাই অর্থনীতির কাজ।

এল. রবিনস এর মতে, অর্থনীতি এমন এক বিজ্ঞান, যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক মানব আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে।

সুতরাং, অর্থনীতি এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা মানুষের কল্যাণ সাধনে অসীম অভাব এবং সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে।

## ৬.৫.২ সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক

সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনীতি মানুষকে উন্নত জীবন লাভে সহায়তা করে। সমাজকর্মও নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সমস্যার সমাধানের সাহায্য করে উন্নত জীবনযাপনে সহায়তা করে তাই সমাজকর্ম ও অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যেমন :

১। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী। এজন্য সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয় যাতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়। অন্যদিকে অর্থনীতিও সীমিত সম্পদ ও অসীম চাহিদা নিয়ে আলোচনা করে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নের জন্য উপযোগী।

২। সমাজকর্ম ও অর্থনীতির লক্ষ্য হলো সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান ও প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে অর্থনীতিও মানুষের নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করে।

৩। মৌলিক ও মানবিক চাহিদা পূরণে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মৌলিক ও মানবিক চাহিদা থেকে অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার জন্ম হয়। আর এই সমস্যা সমাধান অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়। সমাজকর্মীরাও তাদের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করে এ সমস্যা সমাধানে প্রয়াস চালায়।

৪। সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই স্বাবলম্বন নীতিতে বিশ্বাসী। সমাজকর্ম ও অর্থনীতি প্রাপ্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সুষম বন্টনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। সুতরাং নীতিগত দিক থেকে এই দুইয়ের সম্পর্ক রয়েছে।

৫। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক গভীর। কেননা সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির প্রতিভার বিকাশ সাধনে সহায়তা করে এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলে। আর বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান নিয়ে অর্থনীতির ব্যাপকভাবে আলোচনা করে।

৬। জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে নানা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে উভয়ই মানুষের জীবনযাত্রা উন্নয়নে সাহায্য করে।

৭। কল্যাণমুখী ও বিকাশধর্মী অর্থনীতির আবির্ভাবের ফলে অর্থনীতি ও সমাজকর্মের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। বর্তমানে অর্থনীতি একদিকে সমস্যা বিশ্লেষণ করে; অন্যদিকে মানবকল্যাণে অর্থনীতির সম্পৃক্ততার কারণে সমাজকর্মের সম্পর্ক বেড়েই চলেছে।

সুতরাং বলা যায়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ভিত্তিতে উভয়ই পরস্পর নির্ভরশীল। যে কোনো সমস্যা সমাধানে এবং সামাজিক উন্নয়নে অর্থনীতি মূল নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। তাই সমাজকর্ম অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে অগ্রসর হতে পারে না।

অর্থনীতি ও সমাজকর্মের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন :

১। সমাজকর্মের পরিধি অর্থনীতির পরিধির চেয়ে ব্যাপক।

২। অর্থনীতি মৌলিক বা তাত্ত্বিক সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজকর্ম অনুশীলনধর্মী সামজিক বিজ্ঞান।

৩। অর্থনীতি বস্তুগত চাহিদা নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম অবস্তুগত দিক নিয়েও আলোচনা করে।

৪। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকেই অনেক ক্ষেত্রে অর্থনীতির আলোচনা সীমাবদ্ধ, কিন্তু সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করে।

৫। সমাজকর্ম যতটা কল্যাণমুখী অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে ততটা কল্যাণমুখী নাও হতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমাজ ও মানুষের কল্যাণে উভয়ের ভূমিকা অত্যন্ত জোরালো। সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জন অর্থনীতি ছাড়া সম্ভব নয়। অপরদিকে কল্যাণ অর্থনীতির চিন্তাধারা ছাড়া সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব তাই যে কোনো সমস্যা সমাধানে দুইয়ের মিশ্রণ অত্যাবশক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম ও অর্থনীতি সম্পর্কযুক্ত কেন?
- ক) উভয়ই নাগরিকদের দায়িত্ব কতর্ব্য সম্পর্কে জ্ঞান দেয়
- খ) উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান
- গ) উভয়ই মানুষের মনো-সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে
- ঘ) উভয়ই মানুষের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে

২। অর্থনীতি ও সমাজকর্মকে একই সূত্রে আবদ্ধ করেছে কোনটি?
- ক) কল্যাণমূলক অর্থনীতি
- খ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
- গ) ব্যষ্টিক অর্থনীতি
- ঘ) ইসলামিক অর্থনীতি

## পাঠ-৬.৬ সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Demography)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৬.১ জনবিজ্ঞানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.৬.২ সমাজকর্মের সাথে জনবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

### ৬.৬.১ জনবিজ্ঞানের ধারণা

জনবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে অতি সাম্প্রতিককালে। এটি সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা। জনবিজ্ঞান ইংরেজি প্রতিশব্দ Demography । এটি গ্রিকশব্দ Demos এবং Graphia থেকে এসেছে, যার অর্থ যথাক্রমে জনসংখ্যা ও লিখন বা বিবরণ। অতএব জনবিজ্ঞানের আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় জনসংখ্যার বিবরণ বা লিখন। সুতরাং জনবিজ্ঞান হলো জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

সমাজকর্ম অভিধান অনুযায়ী, জনসংখ্যার বিভিন্ন চলক এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত সুসংঘবদ্ধ অনুসন্ধানকে জনবিজ্ঞান বলে। ডেভিড জেরি এবং জুলিয়া জেরি সম্পাদিত *Couins Dictionary of Sociology* এর সংজ্ঞানুযায়ী, জনবিজ্ঞান হলো পরিধি ও কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানগত অধ্যয়ন। জনসংখ্যার লিঙ্গ, বয়স, বৈবাহিক মর্যাদা, নৃ-তাত্ত্বিক ধারা এবং মৃত্যুহার, জন্মহার এবং স্থানান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার সুশৃঙ্খল পরিসংখ্যানগত অধ্যয়ন হলো জনবিজ্ঞান। পরিশেষে বলা যায় যে, জনবিজ্ঞান হলো জনসংখ্যার আকার, গঠন এবং স্থানীয় বন্টনের গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ। অর্থাৎ জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার উপাদান নিয়েই জনবিজ্ঞানের আলোচনা।

### ৬.৬.২ সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের সম্পর্ক

বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার এ সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মীদের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য জনবিজ্ঞান পাঠের কোনো বিকল্প নেই। বিধায় এ দুইটি বিষয় গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত। নিম্নে এই দুইয়ের সম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

**১। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** সমাজকর্মের অন্যতম অনুশীলন ক্ষেত্রে হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। এজন্য তারা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন। আর এই কর্মসূচিতে কাজ করতে হলে সমাজকর্মীকে জনবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকতে হবে।

**২। সামাজিক সমস্যা সমাধান :** পেশাদার সমাজকর্ম সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করে। জনসংখ্যা আবর্তিত সমস্যাগুলো সমাধানে সমাজকর্মীদের জনবিজ্ঞান এর জ্ঞান অত্যন্ত জরুরি।

**৩। জনসংখ্যা বিষয়ক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন :** জনবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব। সমাজকর্মীরা এসব তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারে।

**৪। সমাজকল্যাণ কার্যক্রম :** বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি সম্পাদনে জনবিজ্ঞান পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, নারীকল্যাণ, প্রবীণকল্যাণ, সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের কার্যক্রম বিস্তৃত। আর এই সকল বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পেতে জনবিজ্ঞানের সহায়তা দরকার হয়।

**৫। সমাজকর্ম অনুশীলনে বিশেষ জ্ঞান :** বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্মীরা বিবাহপূর্ব পরামর্শ দান, গর্ভধারণে পরামর্শ দান, গর্ভনিরোধ তথ্যব্যবস্থা এবং সেগুলোর সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুশীলন করে। জনবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত এসব ক্ষেত্রে সমাজকর্ম অনুশীলন সম্ভব নয়।

### সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের পার্থক্য

১. জনবিজ্ঞান জনসংখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করে। কিন্তু সমাজকর্ম একটি অনুশীলনধর্মী ব্যবহারিক বিজ্ঞান। সমাজকর্মের মূল আলোচ্য বিষয় মানুষ, সমস্যা ও সমাধান।

২. জনবিজ্ঞানের তুলনায় সমাজকর্মের পরিধি ব্যাপক। জনবিজ্ঞান মানুষের গঠন, আকৃতি-প্রকৃতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম মানুষের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করে।

৩. সমাজকর্ম সমস্যা বিশ্লেষণে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। আর জনবিজ্ঞান এ ক্ষেত্রে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ নাও করতে পারে।

৪. সমাজকর্মের মূল আলোচ্য বিষয় মানুষ, সমস্যা ও সমাধান। আবার মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মীদের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য জনবিজ্ঞান পাঠের কোনো বিকল্প নেই । বিধায় এ দু'টি বিষয় গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত ।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের মধ্যেকার সম্পর্ক গভীর। জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরের জন্য এবং সমাজের কল্যাণের কাজে ব্যবহার করার জন্যই জনবিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে। তাই সমাজকর্মের অনুশীলনে জনবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্থবহ ভূমিকা পালন করে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম ব্যক্তি, পরিবার ও সমষ্টির উন্নয়নে কাজ করে। এ ধরনের কাজ করতে গিয়ে সমাজকর্মীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। আবার এই দুইয়ের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে জনবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্ম অনুশীলনে আবশ্যক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জনবিজ্ঞান মূলত কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?

ক) মানুষ খ) জনসংখ্যা

গ) সমাজ ঘ) মানুষের মৃত্যু সংখ্যা

২। সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কারণ–

i. উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান

ii. উভয়ই ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত

iii. উভয়ই জনসংখ্যা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৬.৭ সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Medical Profession)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৭.১ চিকিৎসা পেশা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৬.৭.২ সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

### ৬.৭.১ চিকিৎসা পেশা কী?

চিকিৎসা পেশা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক অনুশীলন ধর্মী একটি পেশা। যার লক্ষ্য হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-বয়স-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধমে সুস্থ জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলা। চিকিৎসা পেশার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে মানবসেবার দর্শনের উপর ভিত্তি করে। রোগ প্রতিরাধ ও প্রতিকারের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা পেশার অগ্রযাত্রা শুরু হয়, এবং নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। চিকিৎসা পেশায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক দিক বিশেষ করে শারীরিক দিককে প্রাধান্য দিয়ে রোগী সেবায় আত্মনিয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসা পেশা ল্যাবরেটরি ভিত্তিক, গবেষণা নির্ভর এবং নিজস্ব জ্ঞানে পরিচালিত হয়।

তাই বলা যায় চিকিৎসা পেশা আধুনিক যুগে শারীরিক রোগের সমাধানের পাশাপাশি রোগীর মানসিক, সামাজিক ও পারিবারিক কারণ বিবেচনা করে চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। আর রোগীর মনো-সামাজিক অনুধ্যান ও সমস্যা নির্ণয়ে সরাসরি সমাজকর্ম মনো-চিকিৎসা পেশার সহায়তা নিয়ে থাকে। তাই বর্তমানে সমাজকর্মের সাথে চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

### ৬.৭.২ সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশা উভয়ই মানবসেবামূলক পেশা। মানবসেবার দর্শনের ভিত্তিতে উভয় পেশার জন্ম হয়েছে। উভয় পেশাতেই সমস্যা বা রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। উভয় পেশাতেই জনসেবার মান উন্নয়ন এবং নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। চিকিৎসা এবং সমাজকর্ম দুটি পেশাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং দক্ষতানির্ভর এবং দুটি পেশাতেই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। এ দুটি পেশার ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রভিত্তিক অনুশীলনের জন্য বিশেষজ্ঞদের আওতায় কাজ করতে হয়। চিকিৎসা পেশাও বর্তমানে রোগীকল্যাণের জন্য সমাজকর্মের ন্যায় রোগীর পারিবারিক ও সামাজিক কারণ বিবেচনা করে শারীরিক চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে এক পেশা অন্য পেশাকে অনুশীলনগত পূর্ণতায় সাহায়তা করে থাকে। এখন সকল শারীরিক চিকিৎসা কেন্দ্রে

চিকিৎসা সমাজকর্মী এবং মানসিক হাসপাতালসমূহে মনোচিকিৎসা সমাজকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। আবার অনেক সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠানেই শারীরিক ও মানসিক পেশায় চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। সমাজকর্মের সাথে চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক তাই গভীর। চিকিৎসা পেশার অনুকরণেই ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা নিরূপণ ও সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার নামকরণ করা হয়েছে। আবার সমাজকর্মের ক্লিনিক্যাল সোশ্যালওয়ার্ক প্যারাডাইম ধারণাটিও চিকিৎসা পেশাকে সহায়তার জন্য উদ্ভব হয়েছে।

সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশা অনুশীলনের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ নীতিমালা ও মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যেমন– ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, সমান সুযোগ, গোপনীয়তা রক্ষা ইত্যাদি। এছাড়াও সমাজকর্ম পেশায় মানব আচরণের জৈবিকভিত্তি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে চিকিৎসা পেশা নানাভাবে সহায়তা করে। স্নায়ুতন্ত্র, গ্রন্থিতন্ত্র, পুষ্টি, বিপাক, শিশুর গর্ভকালীন ও জন্ম পরবর্তী বিকাশ সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী চিকিৎসা পেশা হতেই সংগৃহীত হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয় পেশার কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ :

১। সমাজকর্ম মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে। চিকিৎসা পেশা শুধুমাত্র মানুষের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সমাধান দেয়।

২। সমাজকর্ম ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান আর চিকিৎসা পেশা ব্যবহারিক জীববিজ্ঞান।

৩। সমাজকর্ম পেশায় ব্যক্তির সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনকে গুরুত্ব দেয়; কিন্তু চিকিৎসা পেশায় এরকম সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

৪। সমাজকর্ম পেশা একটি সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান। চিকিৎসাপেশা মনো-দৈহিক সুস্থতা নির্ভর একটি সমন্বিত পেশা।

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, উভয় পেশাকেই নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে এবং সমস্যা সমাধানে উভয় পেশার গুরুত্ব অত্যন্ত কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

## সারসংক্ষেপ

চিকিৎসা পেশা ও সমাজকর্মের মধ্যে প্রয়োগ, অনুশীলন, প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় পেশাই সামগ্রিকভাবে কল্যাণমুখী। এই দুটি পেশায় সেবাধর্মী কাজে বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে যথেষ্ট ও বদ্ধপরিকর।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। আলাউদ্দিন সাহেব তার গ্রামের সকল মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের লক্ষ্যে একটি পেশা গ্রহণ করেন। উক্ত পেশা নিচের যেটিকে নির্দেশ করে–

i. সাংবাদিকতা ii. চিকিৎসা iii. সমাজকর্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এর যথার্থ কারণ হলো–

ক) উভয়ই সামাজিক নীতি প্রণয়নে ভূমিকা রাখে

খ) উভয়েই এককভাবে সমাজের অপ্রত্যাশিত অবস্থা দূর করে

গ) উভয়েই নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা অনুশীলন করে মানবসেবায় নিয়েজিত

ঘ) উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিজ্ঞান

# পাঠ-৬.৮ সমাজকর্ম ও আইন পেশার মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Legal Profession)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৮.১ আইন পেশা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.৮.২ সমাজকর্ম ও আইন পেশার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ৬.৮.১ আইন পেশা কী?

আইনের সাথে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক রয়েছে। আইন পেশা আইনগত অধিকার ভোগের প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় মোকাবিলায় সাহায্য করে। ব্যক্তি যাতে রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের আওতায় কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার ভোগ করতে পারে আইন পেশা সেজন্য সহায়তা করে। আইন পেশার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রার্থী সরাসরি পেশাদার ব্যক্তির নিকট সেবার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা সেবাগ্রহীতার পক্ষে আইনগত সহায়তা করে থাকেন। সুতরাং বলা যায় আইনের সঠিক প্রয়োগ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অন্যায়কারীর শাস্তি বিধান এবং অত্যাচারিতদের রক্ষা ও সেবায় নিয়োজিত পেশাকে আইন পেশা বলে।

## ৬.৮.২ সমাজকর্ম ও আইন পেশার সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও আইন পেশার সম্পর্ক সুগভীর। কেননা উভয় পেশায় যুক্তি ও নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সচেষ্ট করা হয়। সমাজকর্মের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো কতগুলো নৈপূণ্যের সাহায্যে সেবাগ্রহীতাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা এবং সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করা। সমাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দক্ষ এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কতগুলো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড এবং নৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে মানুষের সেবায় সমাজকর্ম নিয়োজিত। সমাজকর্মের আদর্শ হলো সেবাগ্রহীতার ব্যক্তিগত মূল্য ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রদান। সেবাদান পরিকল্পনায় ব্যক্তির মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া যায়। আইন পেশাগত দক্ষতানির্ভর এবং সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড মেনে চলে।

আইন ও সমাজকর্ম উভয়েই মানবসেবায় নিয়োজিত। পেশাগত সমাজকর্মের ক্ষেত্রে আইন হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। কেননা এর মাধ্যমে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন করে সমাজের অর্থপূর্ণ কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়। সমাজকর্মীরা এখানে নীতি বাস্তবায়নকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আইন মানবকল্যাণের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সকল প্রকার ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সুচনায় সাহায্য করে। আইনের লক্ষ্য হলো সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, যা প্রকারান্তরে সমাজকর্মের বৃহত্তর লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। আধুনিক যুগে সেবাকে অর্থপূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন সংশোধন কেন্দ্রে, বিশেষ করে কিশোর সংশোধনী কর্মসূচিতে, সমাজকর্মীরা কাজ করেন। সংশোধনমূলক সেবায় আইনজীবীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অপরদিকে, আইন পেশায় যারা নিয়োজিত থাকেন তাদের জনগণের সেবায় উদ্বুদ্ধকরণে সমাজকর্মীগণ কাজ করেন। তাই সমাজকর্ম হলো আইন পেশা ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যকার সমঝোতামূলক এক ধরনের সেবা। সমাজের ক্ষতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি আইন প্রতিষ্ঠায় কল্যাণরাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা সমাজকর্ম এবং আইন পেশার অন্যতম লক্ষ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, আইন পেশা ও সমাজকর্ম পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত পেশা। সমাজের প্রচলিত ক্ষতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ, সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি মানবাচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল ও স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই সমাজকর্ম ও আইন পেশার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

## সারসংক্ষেপ

মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সমাজকর্মের মৌলিক ভিত্তি। আইনগত কাঠামোর আওতায় আইনের শাসনের মাধ্যমে মানবাধিকার ও সামজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। দুটি পেশারই প্রধান ও অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক কুপ্রথা, অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিচের কোন পেশাটি সরাসরি সম্পৃক্ত?
ক) আইন পেশা খ) সাংবাদিকতা
গ) সমাজকর্ম ঘ) চিকিৎসা পেশা

২। সংশোধনমূলক কর্মসূচির আওতায় সমস্যাগ্রস্তদের পূনর্বাসনে সহায়তা করে–
i. আইন পেশা ii. সমাজকর্ম iii. চিকিৎসা পেশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৬.৯ সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Journalism)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৯.১ সাংবাদিকতা কী তা জানতে পারবেন।

৬.৯.২ সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৬.৯.১ সাংবাদিকতা কী?

সমাজকর্ম এমন এক ধরনের পেশা, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের বহুমুখী সমস্যার সমাধান করে। পক্ষান্তরে সাংবাদিকতার মাধ্যমে সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সমাজের সার্বিক চিত্রের পরিস্ফুটন ঘটে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর জটিল সমাজ ব্যবস্থায় দুটি পেশারই প্রসারতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। Oxford Advanced Learner's Dictionary অনুযায়ী, সংবাদপত্র, সাময়িকী, রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্য সংবাদ সংগ্রহ এবং লেখার কাজকে বলা হয় সাংবাদিকতা।

সুতরাং বলা যায় সাংবাদিকতা হলো সাম্প্রতিক ঘটনার উপর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যেমন– পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে লেখা অথবা রেডিও এবং টেলিভিশনে সংবাদ সম্পাদনা ও প্রকাশ করা। ব্যাপক অর্থে জনসংযোগ কর্মী এবং গণযোগাযোগের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবী ব্যক্তিদের কাজকে সাংবাদিকতা শব্দ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়। সমাজের অনিয়ম, অপরাধ ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ নির্মাণে সাংবাদিকতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

### ৬.৯.২ সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার সম্পর্ক

সমাজকর্ম মূলত একটি সাহায্যকারী পেশা। সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা উভয়েরই উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে মানব সেবার দর্শনের উপর ভিত্তি করে। উভয় পেশাতে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান, দক্ষতা ও বাস্তবমুখী অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। এজন্য উভয় পেশায় নিয়োজিত হতে হলে নির্দিষ্ট মেয়াদী ও সুনির্দিষ্ট সিলেবাসভিত্তিক তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। বর্তমানে বহু সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ও সমাজকর্ম বিভাগ চালু রয়েছে। তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পর যেমন শিক্ষানবিস সমাজকর্মীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হয়, তেমনি সাংবাদিকতা পেশায় সাংবাদিকদের শিক্ষানবিস সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে হয়। উভয় পেশাতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা যেমন– ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার, গোপণীয়তা সংরক্ষণ, সবার জন্য সমান সুযোগ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, পেশাগত জবাবদিহিতা ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। সমাজকর্ম পেশায় সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী যেমন– চিকিৎসা সমাজকর্ম,

স্কুল সমাজকর্ম, সংশোধনমূলক কার্যক্রম, শিশু ও নারীকল্যাণ প্রভৃতি বিদ্যমান। তেমনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ঘটনা ও তথ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, অপরাধ, রাজনীতি, অর্থনীতি খেলাধুলা প্রভৃতি বিভাগ/শাখা চালু রয়েছে।

সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হলো সমাজকর্ম গবেষণা। সমাজকর্ম গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনার একটি মাধ্যম হতে পারে সংবাদপত্র। সাংবাদপত্র সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচন এবং ফলাফল প্রকাশের একটি মাধ্যম। এছাড়াও সাংবাদিকতা ও সমাজকর্মের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা, সামাজিক নীতি প্রণয়ন এবং পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের পরিবেশ তৈরিতে সংবাদপত্র যুক্তিসম্মত তথ্যাদি সরবরাহ করে। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা ও অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য আর এসব লক্ষ্যার্জনে সাংবাদিকতা কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা দুটি পেশায়ই সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম পেশা মূলত একটি সাহায্যকারী পেশা যা সর্বজন স্বীকৃত। সংবাদপত্র প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে এই পেশাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার সম্পর্ক তাই অবিচ্ছেদ্য। সাংবাদিকতায় রয়েছে সাহসিকতার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণ, যা সাধারণ জনগণের জন্য মঙ্গলজনক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রকৃতি অনুসন্ধানপূর্বক সত্য উদঘাটন করা কোন পেশার কাজ?
ক) আইন পেশার খ) শিক্ষকতার
গ) সাংবাদিকতার ঘ) সমাজকর্মের

২। সাংবাদিকরা যেসব লোকের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করে–
i. অসহায় ii. নির্ভরশীল iii. পশ্চাৎপদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৬.১০ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম (Social Work as an Integrated Applied Discipline of Different Branches of Knowledge and Professions)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.১০.১ সমাজকর্মে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও পেশার সমন্বিত প্রায়োগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পেশাদার সমাজকর্ম এক ধরনের ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান যা সমাজ সম্পর্কিত পূর্ণজ্ঞান অর্জনের পর সামাজিক সমস্যার সমাধান (ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি) ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনের কাজ করে থাকে। সমাজ সম্পর্কিত পূর্ণজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মকে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের যেমন– সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয়। এ প্রসঙ্গে চার্লস ডি. গারভিন বলেন, বিশেষ

করে সাম্প্রতিককালে সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যক্তি উন্নয়ন তত্ত্ব, দলীয় তত্ত্ব, পারিবারিক তত্ত্ব, সাংগঠনিক তত্ত্ব, রাষ্ট্রীয় কার্যতত্ত্ব এবং সমাজ সম্পর্কিত তত্ত্বনির্ভর হয়ে পড়েছে। ম্যাকাইভার ও পেজ সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেন, সমাজবিজ্ঞান এমন এক বিজ্ঞান যা সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যায়ন করে। সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সামাজিক গতিশীলতা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকে। এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সমাজকর্ম সমাজবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সমাজকর্ম সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনে সমাজবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আবার সমাজবিজ্ঞানের সংগৃহীত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে সমাজকর্ম নিজস্ব পদ্ধতি ও কলাকৌশলের দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সমাজের কল্যাণে কার্যকরী করে তোলে।

সমাজকর্ম এমন এক ব্যবহারিক বিজ্ঞান যা মানুষের সামাজিক, মানসিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মকে অর্থনীতির ওপর নির্ভর করতে হয়। সমাজকর্মে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সুপরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়, যা সমষ্টি উন্নয়ন বা সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির সহায়তায় সম্পাদন হয়। মানবকল্যাণ ও মানবসেবার বিষয়ে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন প্রাধান্য পায়, তেমনি সমাজকর্ম যখন কর্মসূচির বাস্তবায়নে বা অন্যকোনো উপায়ে মানবকল্যাণ করতে চায় তখন সমাজকর্মীকে অবশ্যই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মীগণ একে অন্যের সহায়ক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। কল্যাণমুখী অর্থনীতির ধারণা সমাজকর্মের সাথে অর্থনীতিকে আরো বেশি আবদ্ধ করে রেখেছে যার মাধ্যমে কল্যাণরাষ্ট্র জনকল্যাণে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

ক্লিনিক্যাল সেবা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীগণ একই পেশাগত দলের সদস্য হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব জানার জন্য, আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজকর্মীগণ মনোবিজ্ঞানের সহায়তা নেন এবং কর্মপদ্ধতির দ্বারা তার সামাজিক ভূমিকার উন্নয়নে হস্তক্ষেপ করেন।

মূলত একজন দক্ষ সমাজকর্মী যখন ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির কল্যাণে কাজ করেন তখন তাকে ব্যক্তি বা দলের শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, আবেগীয় বিকাশ, সামাজিক বিকাশ এবং বিকাশগত জটিলতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। মানুষের আচরণের জৈবিক ভিত্তি হিসেবে স্নায়ুতন্ত্র, গ্রন্থীতন্ত্র ও নিউরন সম্পর্কিত জ্ঞানও সমাজকর্মে বিশেষ প্রয়োজনীয়। মানবীয় বিকাশ ও আচরণে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কেও একজন সমাজকর্মীকে জ্ঞানার্জন করতে হয়। এক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞান সমাজকর্মীকে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধিতে সরাসরি নগররাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত আলোচনা হলেও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিনির্ধারণ, সামাজিক আইন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক আদর্শ বিশেষ করে বর্তমান সময়ে কল্যাণরাষ্ট্রের দর্শন সমাজকর্ম দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেকোনো রাষ্ট্রের সমাজকর্ম কার্যাবলী রাষ্ট্রীয় নীতি, পৃষ্ঠপোষকতা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই পৌরনীতি ও সুশাসনের লক্ষ্য সমাজকর্মের লক্ষ্যের সাথে একটি সমান্তরালের ধারা।

এছাড়াও সমাজকর্ম শিক্ষা, চিকিৎসা, আইন, সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এসব পেশার জ্ঞান সমাজকর্ম পেশার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। যা সমাজকর্ম তার নিজস্ব প্রয়োজনে যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল উদ্ভাবনের সাহায্যে সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে।

## সারসংক্ষেপ

সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর কোনো একটি বিশেষ শাখা সামাজিক সমস্যা সমূহের ফলপ্রসূ সমাধান দিতে পারে না। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, বরং সুষম বন্টনের অভাবে অন্যান্য সমস্যার জন্ম হচ্ছে। সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমেই সমস্যার প্রকৃতি, প্রভাব, কারণ, স্থিতি, গভীরতা, সমস্যার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যা ও তার প্রভাব নির্ণয় করতে হবে। সমাজকর্ম অন্যান্য বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করে সমস্যার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সামাধানের প্রচেষ্টা চালায়। অন্যান্য বিজ্ঞানের নীতি ও তত্ত্ব সরাসরি এতে প্রয়োগ করা হয় না। সমাজকর্ম নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে অন্যান্য বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম অন্যান্য জ্ঞানের এবং পেশার সমন্বিত রূপ কথাটির তাৎপর্য হলো–
i. সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞান থেকে জ্ঞান আহরণ করে
ii. বিভিন্ন পেশাগত শাখা থেকে জ্ঞান আহরণ করে
iii. বিভিন্ন শাখা থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজস্ব বিজ্ঞান গড়ে তুলেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। জ্ঞানের কোন শাখা মানুষের বাহ্যিক আচরণের অভ্যন্তরীণ শক্তি অনুসন্ধান করে?
ক) সমাজবিজ্ঞান খ) মনোবিজ্ঞান
গ) পৌরনীতি ঘ) অর্থনীতি

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানদান করে কোন বিজ্ঞান?
ক) নৃবিজ্ঞান খ) পৌরনীতি ও সুশাসন গ) মনোবিজ্ঞান ঘ) সমাজবিজ্ঞান

২। মনোবিজ্ঞানের শাখা হলো–
i. শিশু মনোবিজ্ঞান
ii. অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান
iii. শিল্প মনোবিজ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। সুশাসনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ–
i. রাজনৈতিক জবাবদিহিতা
ii. স্বচ্ছতা
iii. আইনের শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সীমিত সম্পদের বহুমুখী বিকল্প ব্যবহার দ্বারা মানুষের অসীম অভাব পূরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করে কোনটি?
ক) সমাজকর্ম খ) সমাজবিজ্ঞান গ) নৃবিজ্ঞান ঘ) অর্থনীতি

৫। জনবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো–
i. জন্মহার
ii. মৃত্যুহার
iii. জনসংখ্যা বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। কোন পেশার মাধ্যমে মানুষের আইনগত অধিকার ও সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়?
ক) আইন খ) ব্যবসা গ) শিক্ষকতা ঘ) ডাক্তারী পেশা

৭। পেশাগত সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–
i. সমাজের উন্নয়নমূলক নীতি গ্রহণে
ii. পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে
iii. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন**

১। মৌসুমী বিশ্বাস একজন পেশাদার সমাজকর্মী। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে তিনি সমস্যার উৎস, কারণ ইত্যাদি অনুসন্ধান করতে চান। এজন্য তিনি একটি বিজ্ঞানের সহায়তা নেন। এই বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমস্যাটির কারণ বিশ্লেষণ করে সমাধানের পথ বের করেন।

ক) পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কি? ১
খ) অর্থনীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ) উদ্দীপকে মৌসুমী বিশ্বাসের কোন বিজ্ঞানের সহায়তা নিতে হয়? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) সমাজকর্মের সাথে উক্ত বিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। তপু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি বিষয়ে অধ্যায়ন করে যেটি মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম ইত্যাদির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে তপুর বন্ধু দিপুও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একটি বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করে যেটি ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।

ক) আইন পেশা কী? ১
খ) মনোবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২
গ) তপুর অধ্যায়নকৃত বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) তপু ও দিপুর অধ্যয়নকৃত বিষয় দুইটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১। খ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১। ঘ ২। ক ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ : ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৮ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৯ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১০ : ১। ঘ ২। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৬ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। ক ৭। ঘ

# সমাজকর্ম পদ্ধতি : ব্যক্তি সমাজকর্ম
# (Social Work Method : Social Case Work)

**ইউনিট ৭**

## ভূমিকা



ম্যারি ই. রিচমন্ড

সমাজকর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান, মানবহিতৈষী দর্শন এবং দক্ষতানির্ভর সক্ষমকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। কতগুলোা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার প্রকৃতি এবং সম্পদ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের এ পদ্ধতিগুলো কখনো এককভাবে আবার কখনো সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ-৭.১ : সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণা
পাঠ-৭.২ : সমাজকর্ম পদ্ধতির ধরন বা প্রকারভেদ
পাঠ-৭.৩ : ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা
পাঠ-৭.৪ : ব্যক্তি সমাজর্মের উপাদান
পাঠ-৭.৫ : ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা
পাঠ-৭.৬ : ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া
পাঠ-৭.৭ : সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি সমাজকর্মীর সম্পর্ক (র‍্যাপো)
পাঠ-৭.৮ : ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র


## পাঠ-৭.১ সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণা (Concept of Social Work Method)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৭.১.১ পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৭.১.২ সমাজকর্ম পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন।

### ৭.১.১ পদ্ধতি কী?

সমাজকর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য পদ্ধতি (Method) প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। গ্রিক শব্দ meta এবং hodos শব্দ থেকে method বা পদ্ধতি শব্দটি উদ্ভূত। Meta শব্দের অর্থ হলো সুশৃঙ্খল এবং hodos এর অর্থ হলো উপায়। সুতরাং বলা যায় সুশৃঙ্খলভাবে কোনো কাজ করার পন্থা বা উপায় হলো পদ্ধতি।

এইচ. বি ট্রেকারের মতে, পদ্ধতি হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনে সচেতন প্রক্রিয়া এবং সুপরিকল্পিত উপায়। বাহ্যিক দিক থেকে এটি কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া হলেও অভ্যন্তরে রয়েছে সুসমন্বিত জ্ঞান, উপলব্ধি এবং সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি।

সুতরাং বলা যায়, কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুশৃঙ্খল জ্ঞান, সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কার্যসম্পাদনের বিশেষ উপায় হলো পদ্ধতি।

### ৭.১.২ সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণা

পেশাদার সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধান, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে যে সকল কর্মপন্থা বা কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে সমাজকর্ম পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে।

এইচ.বি ট্রেকার এর মতে, সমাজকর্ম পদ্ধতি হলো সমাজকর্ম অনুশীলনের এমন এক সুসংঘবদ্ধ জ্ঞান, ধারণা, উপলব্ধি ও নীতির সমষ্টি যা সচেতন বা বাঞ্ছিত উপায়ে তার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

আবদুল হাকিম সরকার বলেন, যেসব কর্মপন্থা বা কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা এবং নীতিমালা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী প্রয়োগ করে থাকেন যেসব সুশৃঙ্খল কর্ম প্রক্রিয়ার সমষ্টিই সমাজকর্ম পদ্ধতি।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজকর্ম পদ্ধতি হলো সমাজকর্মের সুশৃঙ্খল, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানভিত্তিক স্বীকৃত কর্মপন্থা যা সমাজকর্ম তার পেশাগত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি অনুসারে উক্ত সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মে যেসব সুশৃঙখল উপায় বা পন্থা প্রয়োগ করা হয় তাকে সমাজকর্ম পদ্ধতি বলে।

## সারসংক্ষেপ

আধুনিক জটিল ও পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় বহুমুখী সমস্যা সমাধানের অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানভিত্তিক স্বীকৃত সাহায্যপ্রক্রিয়া হলো সমাজকর্ম। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে নিরপেক্ষ কিছু কর্মপন্থা বা কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যা সমাজকর্মের পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত। আর এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভরতার কারণে সমাজকর্ম আজ সারাবিশ্বে একটি স্বীকৃত পেশা।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কার মতে পদ্ধতি হলো কোন লক্ষ্য অর্জনে সচেতন ও সুপরিকল্পিত উপায়?

ক) এইচ. বি ট্রেকার খ) আবদুল হাকিম সরকার

গ) আলী আকবর ঘ) ডব্লিউ.এ ফ্রিডল্যান্ডার

২। সমাজকর্ম পদ্ধতি হলো–

i. সুপরিকল্পিত উপায় ii. বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মপন্থা iii. নিরপেক্ষ কর্মকৌশল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৭.২ সমাজকর্ম পদ্ধতির ধরন (Types of Social Work Method)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

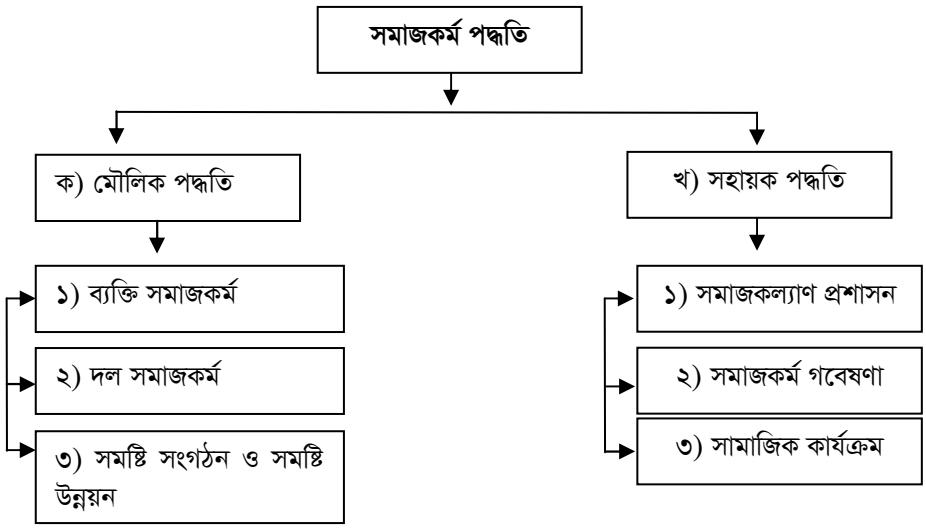
৭.২.১ সমাজকর্ম পদ্ধতি কয় ধরনের তা বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.২.২ সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৭.২.১ সমাজকর্ম পদ্ধতির ধরন বা প্রকারভেদ

সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা, যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে পারদর্শী হয়। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার প্রকৃতি, সম্পদ ও সম্পর্ক এবং পরিবেশ বিবেচনায় সমাজকর্ম পদ্ধতিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক) মৌলিক পদ্ধতি ও খ) সহায়ক পদ্ধতি। মৌলিক পদ্ধতিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– ১) ব্যক্তি সমাজকর্ম ২) দল সমাজকর্ম এবং ৩)

সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। W.A. Friedlander, Brenda Dubois and Karla Krogsrud Miley প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ এই পদ্ধতিকে Community organization (সমষ্টি সংগঠন) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে সমস্যার প্রকৃতি, সম্পদ সঞ্চালনের ধারা ও কর্মপ্রক্রিয়ার ভিত্তিতে এই পদ্ধতি বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার অস্ট্রেলিয়ায় একে সমষ্টি উন্নয়ন হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। যদিও অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের অনেক লেখক এই পদ্ধতিকে সমষ্টি সমাজকর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সমাজকর্মের classical লেখক ও উপর্যুক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করে সমাজকর্মের তৃতীয় মৌলিক পদ্ধতিকে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন হিসেবে বিবেচনা করা হলো । অন্যদিকে সহায়ক পদ্ধতিকেও তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন– ১) সমাজকল্যাণ প্রশাসন, ২) সমাজকর্ম গবেষণা এবং ৩) সামাজিক কার্যক্রম। সমাজকর্ম পদ্ধতিসমূহকে নিচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :




চিত্র : ৭.২.১ সমাজকর্ম পদ্ধতি

## ৭.২.২ সমাজকর্ম পদ্ধতিসমূহ

### ক) মৌলিক পদ্ধতি

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলার জন্য সমাজকর্মের যেসকল পদ্ধতি প্রত্যক্ষভাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যে সকল পদ্ধতিসমূহকে মৌলিক পদ্ধতি বলা হয়। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি তিন ধরনের। যথা :

**১) ব্যক্তি সমাজকর্ম :** ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি মৌলিক পদ্ধতি যার সাহায্যে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমনভাবে সহায়তা করা হয় যাতে ব্যক্তি তার সুপ্ত প্রতিভা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়।

**২) দল সমাজকর্ম :** সাধারণত দল সমাজকর্ম গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দলের সদস্যদের যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া এ পদ্ধতি ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে দলের সদস্যদের সাহায্য করে।

**৩) সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন :** সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমষ্টির সদস্যদের মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন বলা হয়। অতি সম্প্রতি এই পদ্ধতিকে অনেকেই সমষ্টি সমাজকর্ম হিসেবে অভিহিত করেছেন। এর দু'টি দিক রয়েছে। যথা :

**ক) সমষ্টি সংগঠন :** সমষ্টি সংগঠন সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক, যার মাধ্যমে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার সমাজকল্যাণমূলক প্রয়োজন ও সম্পদের মধ্যে ফলপ্রসূ সামঞ্জস্যবিধান করা হয়।

**খ) সমষ্টি উন্নয়ন :** জনসমষ্টি উন্নয়ন হলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠী কর্তৃক পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত আত্মসাহায্যমূলক কর্মসূচি, যাতে সরকার শুধুমাত্র কারিগরি নির্দেশনা এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকেন। এর উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মনির্ভরতার উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভতার উদ্যোগ গ্রহণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা।

**খ) সহায়ক পদ্ধতি**

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহকে বাস্তবক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে যে পদ্ধতি বিশেষভাবে সাহায্য করে তাই সহায়ক পদ্ধতি। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি তিন ধরনের। যথা :

**১) সমাজকল্যাণ প্রশাসন :** সমাজকল্যাণ প্রশাসন এমন একটি কৌশল ও প্রক্রিয়া যা সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করে এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা ও কর্মসূচিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

**২) সমাজকর্ম গবেষণা :** সমাজকর্ম গবেষণা হলো সমাজকর্মে ব্যবহৃত জ্ঞান, কৌশল ও পদ্ধতিসমূহর ধারণা ও সাধারণীকরণের মাধ্যমে যথার্থতা ও কার্যকারিতা নির্ণয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া।

**৩) সামাজিক কার্যক্রম :** সামাজিক কার্যক্রম হলো একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থাগুলোর সুপরিকল্পিত পরিবর্তন সাধন করে জনগণের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক উন্নয়ন সাধনে প্রচেষ্টা চালানো হয়।

## সারসংক্ষেপ

নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় নিত্যনতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। আর এসকল সমস্যা থেকে মানুষকে দূরে রাখতে উদ্ভব হয়েছে সমাজকর্ম নামক যুগোপযোগী পেশার। মানুষের সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী এ পেশায় রয়েছে বিভিন্ন সমাধান পদ্ধতি। সমাজকর্মের এ পদ্ধতিসমূহ প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। যথা– ক) মৌলিক পদ্ধতি ও খ) সহায়ক পদ্ধতি। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি তিন ধরনের। যথা– ১) ব্যক্তি সমাজকর্ম, ২) দল সমাজকর্ম ও ৩) সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতিও তিন ধরনের। যথা– ১) সমাজকল্যাণ প্রশাসন, ২) সমাজকর্ম গবেষণা এবং ৩) সামাজিক কার্যক্রম।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান পদ্ধতি প্রধানত কয় ধরনের?

ক) ২ খ) ৩

গ) ৪ ঘ) ৫

২। দলের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়?

ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম

গ) সমষ্টি সমাজকর্ম ঘ) সামাজিক কার্যক্রম

৩। ব্যক্তি সমাজকর্ম সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির–

i. সমস্যা সমাধান করে

ii. ব্যক্তিকে তার সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে

iii. ব্যক্তির উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৭.৩ ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা (Concept of Social Case Work)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৭.৩.১ ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ৭.৩.১ ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা

ব্যক্তি সমাজকর্ম সমাজের ক্ষুদ্রতম একক ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করে। ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি মৌলিক পদ্ধতি, যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা, দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিকে এমনভাবে স্বাবলম্বী করে তোলে যাতে ব্যক্তি নিজেই নিজের সমস্যার কার্যকর মোকাবিলা করে সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা মোকাবিলায় উদ্ভব হয়েছে।

ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণায় এই পদ্ধতিরই উদ্ভাবক ম্যারি ই. রিচমন্ড বলেন, ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সেই সকল প্রক্রিয়ার সমষ্টি, যা ব্যক্তিকে তার সামাজিক পরিবেশ ও সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে সচেতনভাবে কার্যকর সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে।

ওয়ার্নার বোহেমের মতে, ব্যক্তি সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি পদ্ধতি যা ব্যক্তির কার্যসম্পাদন ক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার এবং বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির মনো-সামাজিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে। আর এই হস্তক্ষেপ তখনই ঘটে যখন ব্যক্তি বা তার দল ও সমষ্টির কোনো সদস্য মনে করে যে, ব্যক্তির কার্য সম্পাদন ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি পদ্ধতি যা ব্যক্তিকে তার নিজস্ব ও সমষ্টির সম্পদের সাহায্যে মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে যাতে ব্যক্তি উন্নততর সামঞ্জস্য বিধান ও স্বাভাবিক সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

আধুনিক জটিল সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। ব্যক্তিকে তার সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে উদ্ভব হয়েছে সমাজকর্মের বাস্তবমুখী সমাধান পদ্ধতি যা ব্যক্তি সমাজকর্ম নামে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে তার সমস্যা মোকাবিলায় নিজস্ব সম্পদ ও ক্ষমতার সমন্বিত ব্যবহারে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তোলা হয়। যাতে ব্যক্তি তার নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারে। এর ফলে ব্যক্তি সমাজের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে তার স্বাভাবিক সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ব্যক্তি সমাজকর্ম সমাজকর্মের অন্যতম পদ্ধতি, এর কারণ–

ক) ব্যক্তি ধনী হয় খ) ব্যক্তির সমস্যার সমাধান হয়

গ) ব্যক্তি সমাজে পরিচিত হয় ঘ) ব্যক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়

২। ব্যক্তি সমাজকর্ম সমাজকর্মের–

i. মৌলিক পদ্ধতি ii. প্রাচীন পদ্ধতি iii. নিজস্ব পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৭.৪ ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান (Elements of Social Case Work)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৭.৪.১ ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলো কী তা বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ৭.৪.১ ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান

ব্যক্তি সমাজকর্ম কতগুলো অপরিহার্য বিষয় কেন্দ্রিক আবর্তিত সাহায্য প্রক্রিয়া। আর এ প্রক্রিয়ায় যে সকল বিষয় অপরিহার্য তাই ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান। ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে গিয়ে এইচ. এইচ. পার্লম্যান বলেন- "A Person with a Problem comes to a Place where a Professional Representative helps him by a given Process। আর এটি বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তি সমাজকর্মের পাঁচটি উপাদান পাওয়া যায়। যেমন :

১। Person (ব্যক্তি); ক্লায়েন্ট বা সাহায্যার্থী

২। Problem (সমস্যা); আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা

৩। Place (স্থান); সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান

৪। Professional Represeatative (পেশাদার প্রতিনিধি); সমাজকর্মী

৫। Process (প্রক্রিয়া); সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া।

নিচে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো :

**১। ব্যক্তি :** ব্যক্তি সমাজকর্মের মূল উপাদান হলো ব্যক্তি। যাকে কেন্দ্র করে মূলত ব্যক্তি সমাজকর্ম পরিচালিত হয়। পেশাগতভাবে ব্যক্তি হলো ক্লায়েন্ট বা সাহায্যার্থী। তবে ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তি বা ক্লায়েন্ট বা সাহায্যার্থী বলা যাবে এমন ব্যক্তিকে যার মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান থাকে।

ক. সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক বা আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত যে কোনো বয়সের ব্যক্তি;

খ. যখন ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয় এবং সমস্যা মোকাবিলায় অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়;

গ. ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবার বা সমাজের যে কোনো সদস্য এই সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সমাজকর্মীর সাহায্য কামনা করে।

এ প্রসঙ্গে এইচ. এইচ. পার্লম্যান বলেন, ব্যক্তিটি হলেন একজন পুরুষ, মহিলা বা শিশু যে কেউ, যে মনে করে বা যার সম্পর্কে মনে করা হয় যে, তার সামাজিক বা আবেগীয় ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন। তা হতে পারে দৃশ্যমান, হতে পারে পরামর্শমূলক। যখন ব্যক্তি এ ধরনের সাহায্য নিতে শুরু করে তখন তাকে ক্লায়েন্ট বা সাহায্যার্থী বলা হয়।

**২। সমস্যা :** ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমস্যা। সমস্যা হলো ব্যক্তির অস্বাভাবিক আর্থ-সামাজিক ও মনো-দৈহিক অবস্থা, যা ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে বাধা সৃষ্টি করে সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। আর এ অবস্থা থেকে ব্যক্তি পরিত্রাণ পেতে চায়। ব্যক্তির এ সমস্যা দুধরনের হতে পারে। যথা :

ক. ব্যক্তির চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা। যেমন– শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ও আর্থিক সমস্যা, যা ব্যক্তির স্বচ্ছল জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে।

খ. বিভিন্ন চাপমূলক অবস্থার ফলে সৃষ্ট সমস্যা। যেমন– অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক বিচ্ছিনতা ও সামঞ্জস্যহীনতা, আন্তব্যক্তিক ও আন্তপারিবারিক দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিত্বের প্রতিবন্ধকতা বা আচরণগত সমস্যা যা ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতাকে অকার্যকর করে তোলে।

**৩। স্থান :** ব্যক্তি সমাজকর্মের সেবাদান প্রক্রিয়া একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত হয়। সমাজকর্মের পরিভাষায় একে বলা হয় স্থান বা social work agency। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান হলো একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তির সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও অবস্তুগতসেবা প্রদান করে থাকে। ব্যক্তি সমাজকর্মের সেবাদান

প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মুখ্য সামাজিক ও গৌণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠান।

**৪। পেশাদার প্রতিনিধি :** ব্যক্তি সমাজকর্মের সামগ্রিক কার্যক্রম, যার দ্বারা পরিচালিত হয়, তাকেই পেশাদার প্রতিনিধি বলা হয়। পেশাদার প্রতিনিধি সমাজকর্মী হিসেবে অধিক পরিচিত। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত পেশাদার ব্যক্তিকে ব্যক্তি সমাজকর্মী বলা হয়। যিনি ব্যক্তি সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা এবং কলাকৌশল সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত থাকেন। এছাড়া তিনি ব্যক্তি সমাজকর্মী প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি, কর্মসূচি, সম্পদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত থাকেন এবং ব্যক্তি সমাজকর্মের জ্ঞান, দর্শন, দক্ষতা, কৌশল প্রয়োগে দক্ষ তিনি ব্যক্তির সমাধানে সমাজকর্মের নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে থাকেন।

**৫। প্রক্রিয়া :** ব্যক্তি সমাজকর্মের সর্বশেষ উপাদান হলো প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তি সমাজকর্মের সামগ্রিক সেবা কার্যক্রমকে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া হলো সাহায্যার্থীকে সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য কতগুলো পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রমের সমষ্টি। আর এ কার্যক্রম পাঁচটি স্তরে সম্পন্ন হয়। যথা– ক) মনো-সামাজিক অনুধ্যান, খ) সমস্যা নির্ণয়, গ) সমাধান, ঘ) মূল্যায়ন এবং ঙ) অনুসরণ। এ স্তরগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্মীর সাথে সাহায্যার্থীর পেশাগত সম্পর্ক সৃষ্টি হতে শুরু করে সমস্যা নির্ণয়, সমাধান ব্যবস্থায় বস্তুগত ও অবস্তুগত সেবা সবকিছুই পর্যায়ক্রমিক ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম পেশায় ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাই ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি । ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া যাদেরকে বা যে বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তাকে বলা হয় ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান। ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান পাঁচটি। যথা– ক) ব্যক্তি, খ) সমস্যা, গ) স্থান বা প্রতিষ্ঠান, ঘ) পেশাদার প্রতিনিধি বা সমাজকর্মী এবং ঙ) সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান কয়টি?

ক) ৪টি খ) ৫টি

গ) ৬টি ঘ) ৭টি

২। ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রাণ বলা হয় কাকে?

ক) ব্যক্তি খ) সমস্যা

গ) পেশাদার প্রতিনিধি ঘ) প্রক্রিয়া

৩। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত-

i. মনোসামাজিক অনুধ্যান ii. পর্যবেক্ষণ iii. সমাধান ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৭.৫ ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা (Principles of Social Case Work)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৭.৫.১ ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিগুলো কী জানতে পারবেন এবং নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

## ৭.৫.১ ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের এক গতিশীল সেবাদান প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সেবাদানের কতিপয় নির্দেশনামূলক নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যক্তি সমাজকর্ম অনুশীলন করে থাকেন। নিচে ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিসমূহ আলোচনা করা হলো :

**১. গ্রহণ নীতি :** ব্যক্তি সমাজকর্মে গ্রহণ নীতি বলতে বোঝায় সাহায্যার্থীকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে তাকে সম্মান প্রদর্শন, ব্যক্তি মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব প্রদান, সমস্যার যথাযথ মূল্যায়ন এবং তার প্রতি সেবাদানের সদিচ্ছা নির্দেশ করে সমাজকর্মী কর্তৃক তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি সমাজকর্মের সফলতা অনেকাংশেই গ্রহণনীতির উপর নির্ভরশীল। তাই গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মীর মধ্যে আন্তরিকতা, শ্রদ্ধাবোধ, মনোযোগ, আগ্রহ, সততা, অন্যের অনুভূতিকে ভাগাভাগি করে নেয়ার সদিচ্ছা থাকতে হবে। এটি যেহেতু একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া তাই এক্ষেত্রে সমাজকর্মী ও ব্যক্তি উভয়েরই প্রতিক্রিয়া আবশ্যক।

**২. যোগাযোগ নীতি :** সাধারণভাবে যোগাযোগ বলতে তথ্যের আদানপ্রদানকে বোঝানো হয়। সমাজকর্মে যোগাযোগ বলতে সাহায্যার্থী ও সমাজকর্মীর মধ্যে সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, ধারণা, অনুভূতির আদানপ্রদানকে বোঝায়। ব্যক্তি সমাজকর্মে যোগাযোগ নীতি অনুসরণের ফলে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থী একে অপরের বক্তব্য, অভিব্যক্তি এবং প্রতীকী আচরণের অন্তর্নিহিত বিষয় উপলব্ধি করতে পারে।

**৩. অংশগ্রহণ নীতি :** ব্যক্তি সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিকে তার সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা। এক্ষেত্রে সমাধান প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক। ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং হারানো ক্ষমতার পুনরুদ্ধার ও সুসংহতকরণের মাধ্যমে তার ভূমিকাকে সচল করে তোলার লক্ষ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। এছাড়া সাহায্যার্থীর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে সক্রিয় অংশগ্রহণ সহায়তা করে। আবার সমস্যাটি যেহেতু ব্যক্তির নিজের তাই তা সমাধানের বিষয়টি সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থী উভয়েরই সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**৪. গোপণীয়তার নীতি :** ব্যক্তি সমাজকর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো সাহায্যার্থীর বিভিন্ন তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা। ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মী ব্যক্তি, তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী বা সহকর্মী বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যক্তির বিভিন্ন গোপণীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি তার সমস্যার যথাযথ সমাধান যেমন প্রত্যাশা করে, তেমনি প্রদেয় তথ্য যাতে গোপণ রাখা হয় সেটিও দৃঢ়ভাবে কামনা করে।

**৫. ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ নীতি :** সমাজকর্মের দৃষ্টিকোন থেকে প্রত্যেকটি মানুষ একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা। ক্ষমতা, বুদ্ধি, আবেগ, অনুভূতি, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদি অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা আলাদা। যার ফলে ব্যক্তির সক্ষমতা, দুর্বলতা, উপযোজন ক্ষমতা, সমস্যা সম্পর্কে অনুভূতি ও ধারণা একে অন্যের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আলাদা ও স্বতন্ত্র বিবেচনায় এনে সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি সমাজকর্ম সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

**৬. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি :** ব্যক্তি সমাজকর্মের এই নীতিটি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে। সমাজকর্ম যেহেতু একটি অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম সেহেতু ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এক্ষেত্রে সাহায্যার্থী তার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, চিন্তা-চেতনা, সমাধান ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার মতামত প্রদান করে থাকে এবং তার মতামতকে যথেষ্ট অগ্রাধিকার দিয়ে যথাযথ মূল্যায়নও করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মী এক্ষেত্রে সাহায্যার্থীকে যথাযথভাবে সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

**৭. আত্মসচেতনতার নীতি :** সমাজকর্মের এই নীতিটি শুধুমাত্র ব্যক্তি সমাজকর্মীর জন্য প্রযোজ্য। এই নীতিটি মূলত সমাজকর্মীর নিজস্ব সফলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হওয়াকে নির্দেশ করে। একজন মানুষ হিসেবে সমাজকর্মীর মধ্যে আবেগ, হিংসা, দ্বেষ, পক্ষপাতিত্ব, পছন্দ ও অপছন্দ থাকতে পারে। কিন্তু এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

সমাজকর্মীকে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে ব্রতী হতে এ নীতি সহায়তা করে। একজন সমাজকর্মীকে কতগুলো বিষয়ে সচেতন হতে হয়। যেমন– ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা; চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি যত্নবান হওয়া; সাহায্যার্থীর মর্যাদাহানির আচরণ থেকে বিরত থাকা এবং ব্যক্তিগত বদ অভ্যাস ও কাজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

## সারসংক্ষেপ

ব্যক্তি সমাজকর্ম সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান পদ্ধতি। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে সমাজকর্মীকে কতগুলো নীতি মেনে চলতে হয়, যা ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা হিসেবে বিবেচিত। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সাতটি নীতিমালা অনুসরণ করে সমাজকর্ম অনুশীলন করে থাকে। যথা– ক) গ্রহণ নীতি, খ) যোগাযোগ নীতি, গ) অংশগ্রহণ নীতি, ঘ) গোপণীয়তার নীতি, ঙ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ নীতি, চ) আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি এবং ছ) আত্মসচেতনতার নীতি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগে কয়টি নীতি অনুসরণ করা হয়?
ক) ৫টি খ) ৭টি
গ) ৮টি ঘ) ৯টি

২। ব্যক্তি সমাজকর্মের কোন নীতিটি শুধুমাত্র সমাজকর্মীর জন্য প্রযোজ্য?
ক) যোগাযোগ নীতি খ) আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি
গ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ নীতি ঘ) আত্মসচেতনতার নীতি

# পাঠ-৭.৬ ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া (Problem Solving Process in Social Case Work)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৭.৬.১ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার ধাপগুলো কী তা জানতে পারবেন এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

## ৭.৬.১ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত একটি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া। একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে যেসব কৌশল নির্ভর কার্যক্রম পরিচালিত হয় সমন্বিতভাবে সে সকল কার্যক্রমকে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে এ প্রক্রিয়া মূলত সাহায্যার্থীর মনো-সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলোর প্রকৃতি ও কার্যকারিতা বিবেচনায় নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়।

**ক) মনো-সামাজিক অনুধ্যান :** ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো সাহায্যার্থীর সমস্যার যথাযথ অনুধ্যান। মনো-সামাজিক অনুধ্যান হচ্ছে ব্যক্তির মানসিক ও সামাজিক সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়ের পাশাপাশি সেগুলোর যথাযথ সমাধান পরিকল্পনা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কৌশল। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে সাহায্যার্থীর যেসব বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করতে হয় তা হলো :

**প্রথমত :** সাহায্যার্থী যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন এবং এক্ষেত্রে সাহায্যার্থী কী চায় বা তার উদ্দেশ্য কী?

**দ্বিতীয়ত :** মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও তার পরিবারের উপর সমস্যা কেমন প্রভাব ফেলছে?
**তৃতীয়ত :** কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং সমস্যাকে ত্বরান্বিত করতে কোন বিষয়টি কাজ করছে?
**চতুর্থত :** সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা কী এবং ব্যক্তির নিজস্ব কী ধরনের সম্পদ রয়েছে?
**পঞ্চমত :** সাহায্যার্থীর এজেন্সিতে আসার উদ্দেশ্য কী এবং এজেন্সির কী ধরনের সম্পদ রয়েছে?

**খ) সমস্যা নির্ণয় :** এ পর্যায়ে মনো-সামাজিক অনুধ্যানের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলীর আলোকে সাহায্যার্থীর সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা নির্ণয় হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সাহায্যার্থীর সমস্যা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তির সমস্যা, সামাজিক অবস্থা এবং ব্যক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় যা সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে। সমস্যা নির্ণয় কর্মপ্রয়াসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১) গতিশীল সমস্যা নির্ণয় প্রক্রিয়া, ২) চিকিৎসামূলক সমস্যা নির্ণয় প্রক্রিয়া এবং ৩) সমস্যার উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যা নির্ণয় সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ।

**গ) সমাধান ব্যবস্থা :** এ পর্যায়ে ব্যক্তি ও তার পরিবারের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। অর্থাৎ সমস্যার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের পর প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সমস্যার সমাধান পরিকাল্পনা গৃহীত হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমাধান পরিকল্পনা এমন একটি স্তর যেখানে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামোর আওতায় ব্যক্তি ও তার পরিবারকে সক্ষম করার জন্য প্রচেষ্টা গৃহীত হয়, যাতে তারা (সাহায্যার্থী ও তার পরিবার) সামাজিক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রগুলোর সাথে ভালোভাবে উপযোজন করতে পারে। সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে ব্যক্তি সমাজকর্মের সমাধান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। যথা–

১. সমর্থনমূলক সমাধান পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সাহায্যার্থীকে তার সমস্যা মোকাবিলায় সামঞ্জস্যবিধান ও সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়নে সহায়তা করা হয়। এতে ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের সদ্ব্যবহারে সহায়তা করা হয়।

২. সংশোধনমূলক সমাধান পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সাহায্যার্থীর আচরণের বাহ্যিক ধরন এবং অভ্যন্তরীণ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে সংশোধন আনয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো সাহায্যার্থীর আচরণ ও মনোভাবের মধ্যে সংশোধন আনয়ন।

৩. বস্তুগত সাহায্যদান পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সাহায্যার্থীর সমস্যার প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী বৈষয়িক সাহায্য প্রদান করা হয়। অর্থাৎ সাহায্যার্থীর সামঞ্জস্যবিধান ও সামাজিক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে যদি কোনো বস্তুগত সাহায্যের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

**ঘ) মূল্যায়ন:** ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম ধাপ হলো মূল্যায়ন, যার মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমের সফলতা ও ব্যর্থতা পরিমাপ করা যায়। এটি মূলত সমস্যা সমাধানের একটি ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া, যা সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার শুরু হতে শেষ অবধি চলমান। মূল্যায়ন সাধারণত দু'ভাগে করা হয়ে থাকে। যথা :

**১. ক্রমাগত মূল্যায়ন :** সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ অবধি মূল্যয়ন চলতে থাকে।

**২. মেয়াদী মূল্যায়ন :** সেবাদানের নির্দিষ্ট মেয়াদে এ মূল্যায়ন করা হয়। এতে উদ্দেশ্য অর্জনের সাফল্য ও ব্যর্থতা যাচাই করা যায়। মূল্যায়নের প্রেক্ষিতেই সমস্যা সমাধান ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার কারণ/স্বরূপ এবং সমাধানের লক্ষ্যে আরো কিছু আনুসাঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সমস্যার কার্যকর সমাধানে এ পদক্ষেপগুলো সহায়ক বিধায় এগুলোকে সহায়ক স্তর/পদক্ষেপ বলা হয়। এগুলো হলো : ক) অন্তরবর্তীকালীন ব্যবস্থা, খ) অনুসরণ ও গ) প্রেরণ।

## সারসংক্ষেপ

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া একটি আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কতগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। প্রত্যেকটি ধাপে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় প্রধানত যেসকল ধাপ বা স্তর অনুসরণ করা হয় সেগুলো হলো– ক) মনো-সামাজিক অনুধ্যান, খ) সমস্যা নির্ণয়, গ) সমাধান ব্যবস্থা। এছাড়া সহায়ক ধাপগুলো হলো– ক) অন্তরবর্তীকালীন ব্যবস্থা, খ) অনুসরণ ও গ) প্রেরণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় প্রধানত কয়টি ধাপ অনুসরণ করা হয়?

ক) ৪টি খ) ৬টি

গ) ৮টি ঘ) ৯টি

২। সমাধান প্রক্রিয়ায় প্রথম থেকে মূল্যায়ন হওয়ার যৌক্তিক কারণ–

i. সমস্যা নির্ণয় করা সহজ হয়

ii. উদ্দেশ্য অর্জন ত্বরান্বিত হয়

iii. প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৭.৭ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি সমাজকর্মীর সম্পর্ক (র‍্যাপো) (The Professsional Relationship of Social Case Worker with Client-Rapport)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৭.৭.১ র‍্যাপো ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৭.৭.২ র‍্যাপোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৭.৩ র‍্যাপোর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৭.৭.১ র‍্যাপোর সংজ্ঞা

ব্যক্তির মনো-সামাজিক সমস্যার কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে ব্যক্তি সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার গতি-প্রকৃতি, ধরন, কারণ ইত্যাদি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমাধান প্রদানে সাহায্যার্থী ও সমাজকর্মীর মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। সমাজকর্মের পরিভাষায় এই সম্পর্ককে বলা হয় র‍্যাপো।

Rapport একটি ফারসি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক। ব্যক্তি সমাজকর্মে র‍্যাপো শব্দটি সর্বপ্রথম Miss Virginia Robinson তাঁর *A Changing Psychology in Social Case Work* গ্রন্থে ১৯৩০ সালে ব্যবহার করেন। সাধারণভাবে ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থী ও সমাজকর্মীর মধ্যে যে গভীর, আন্তরিক, সহানুভূতিপূর্ণ পেশাগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাই হলো র‍্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক।

Felix P. Biestek তাঁর *The Case Work Relationship (1957)* গ্রন্থে বলেন, সাহায্যার্থী তার নিজের ও পরিবেশের মধ্যকার উন্নত সামঞ্জস্যবিধান ক্ষমতার্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মনোভাব এবং আবেগের গতিশীল আন্তঃক্রিয়াই হচ্ছে ব্যক্তি সমাজকর্মের পেশাগত সম্পর্ক।

সুতরাং সাহায্যার্থীর সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে পেশাগত মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যকে অক্ষুন্ন রেখে সাহায্যার্থী ও সমাজকর্মীর মধ্যে যে আন্তরিক পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার সাহায্যে মানবীয় সম্পর্ক সংক্রান্ত জ্ঞানের কার্যকর প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাই হলো র‍্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক।

### ৭.৭.২ র‍্যাপো'র উদ্দেশ্য

সাধারণভাবে সাহায্যার্থীর মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণই র‍্যাপোর উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্টভাবে র‍্যাপো বা পেশাগত সম্পর্কের উদ্দেশ্য হলো :

ক) সাহায্যার্থীর মনো-সামাজিক অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সাহায্যার্থী যেন স্বস্তি অনুভব করে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা;
খ) ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন;
গ) সাহায্যার্থীর সমস্যার উন্নতর সমাধান ব্যবস্থা প্রদান;
ঘ) সমাধান কার্যক্রমের উপায় বা পন্থা তুলে ধরা;
ঙ) বাস্তবতা ও আবেগীয় সমস্যাবলী বর্ণনা করা ও তুলে ধরা;
চ) সাহায্যার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য সামঞ্জস্যবিধান ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা। আর এসব উদ্দেশ্য অর্জনে সমাজকর্মী সাতটি নীতি অনুসরণ করে থাকে। যথা– ১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ নীতি, ২) অনুভূতির উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রকাশ নীতি, ৩) সংযত আবেগের নীতি, ৪) গ্রহণ নীতি, ৫) বিচারসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহারের নীতি, ৬) সাহায্যার্থীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি এবং ৭) গোপনীয়তার নীতি।

### ৭.৭.৩ ব্যক্তি সমাজকর্মে র‍্যাপোর গুরুত্ব

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থী সম্পর্কে সঠিক ও কার্যকরী তথ্য উদঘাটন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমস্যা সমাধান কৌশল উদ্ভাবনে র‍্যাপো একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে কাজ করে। সম্পর্ক স্থাপনের এ দ্বিমুখী প্রক্রিয়ায় একদিকে সাহায্যার্থী তার জটিল মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশায়; অন্যদিকে সমাজকর্মী তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের স্বার্থে এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনে ব্রতী হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে র‍্যাপোর গুরুত্ব তুলে ধরা হলো :

**১. সাহায্যার্থীর সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় :** র‍্যাপো'র মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হয়ে ব্যক্তির সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে স্বাভাবিক সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়নে সহায়তা করা সম্ভব হয়।

**২. সাহায্যার্থীর পারিপার্শিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ :** সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভের মাধ্যমে সেগুলোকে ব্যক্তির অনুকূলে আনতে র‍্যাপো কার্যকরী তথ্য প্রদান ও যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করে থাকে।

**৩. সাহায্যার্থীর মানসিক পীড়ন হতে মুক্তি :** সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে মানসিক চাপমূলক অবস্থা হতে মুক্ত করার ক্ষেত্রে র‍্যাপো বিশেষ ভূমিকা রাখে। কেননা পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি দ্বিধাহীনভাবে তার সমস্যা সম্পর্কে সমাজকর্মীকে অবহিত করতে পারে। এর ফলে ব্যক্তির মানসিক পীড়ন অনেকখানি নিরসন করা সম্ভব হয়।

**৪. সাহায্যার্থীর আত্মমূল্যায়ন :** র‍্যাপো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তি যখন তার সমস্যা সম্পর্কে সমাজকর্মীকে অবগত করে তখন সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় যেমন– সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা, ভূমিকা এবং এক্ষেত্রে তার ব্যর্থতা, পরাজয় বা অপরাধবোধ সবকিছুই সে তার বিচারবোধ দিয়ে মূল্যায়ন করতে পারে।

**৫. সাহায্যার্থীর আচরণে পরিবর্তন আনয়ন :** ব্যক্তির মনো-সামাজিক সমস্যার কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে র‍্যাপো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও আচরণ, মনোভাব দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনয়নে র‍্যাপো কার্যকর ভূমিকা রাখে।

**৬. ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ :** সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করতে র‍্যাপো সহায়তা করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং নিজস্ব সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান নির্দেশে র‍্যাপোর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

**৭. সমাজকর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি :** কার্যকর ও ফলপ্রসূ র‍্যাপো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্মীর দক্ষতা ও গুণাবলী বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি সমাজকর্মীর পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

**৮. সাহায্যার্থীর সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধার :** সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার সমস্যাকে যথাযথভাবে অনুধাবন, বিশ্লেষণ, স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের মাধ্যমে যথাযথ সমাধান কৌশল প্রয়োগ করে ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে র‍্যাপোর গুরুত্ব অপরিসীম।

## সারসংক্ষেপ

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মনো-সামাজিক সমস্যার কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে উদ্ভব হয়েছে ব্যক্তি সমাজকর্মের। এক্ষেত্রে ব্যক্তির সমস্যার ধরন, কারণ, প্রকৃতি ইত্যাদি নির্ণয়ের মাধ্যমে যথাযথ সমাধান প্রদানে সাহায্যার্থী ও সমাজকর্মীর মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হওয়া জরুরি। কেননা কেবল পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হলেই সাহায্যার্থী অবলীলায় তার সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি সমাজকর্মীর নিকট বলতে পারে। সমাজকর্মের ভাষায় এই পেশাগত সম্পর্কের নাম র‍্যাপো। র‍্যাপোর উদ্দেশ্য হলো সাহায্যার্থীর সমস্যা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করে সমস্যার যথাযথ কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমস্যার যথোপযোগী সমাধান ব্যবস্থা নির্দেশ করে ব্যক্তিকে তার হারানো সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে যথাযথভাবে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করা।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। র‍্যাপো কী?
ক) ব্যবসায়িক সম্পর্ক খ) পারিবারিক সম্পর্ক
গ) পেশাগত সম্পর্ক ঘ) সামাজিক সম্পর্ক

২। র‍্যাপো বা পেশাগত সম্পর্কের উদ্দেশ্য হলো–
i. সাহায্যার্থীর সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা
ii. ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন
iii. সাহায্যার্থীর সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৭.৮ ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র (Fields of Social Case Work)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৭.৮.১ ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

## ৭.৮.১ ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র

সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গতিশীল ও অর্থবহ পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে তার সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করাই ব্যক্তি সমাজকর্মের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পদ ও উদ্দেশ্যের আলোকে সাহায্যার্থীর সমস্যার ধরন ও গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী সেবা দিয়ে থাকে। নিচে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

**১. চিকিৎসা সমাজকর্ম :** বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ব্যক্তি সমাজকর্মের বাস্তব প্রয়োগের সূচনা হয় চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে ১৯৫৮ সালে। বর্তমানে যা হাসপাতাল সমাজসেবা নামে পরিচিত। হাসপাতালে আগত রোগীদের মানসিক যন্ত্রণা লাঘব, রোগ মুক্তির পর পূনর্বাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করে যথাযথ চিকিৎসাসেবা প্রদান, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুযোগ বৃদ্ধি এ পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

**২. বিদ্যালয় সমাজকর্ম :** ব্যক্তি সমাজকর্মের দর্শন, কৌশল ও নীতিমালা প্রয়োগ করে শিশুদের অকারণ ভয়-ভীতি দূর করে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়। তাছাড়া যারা বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনা তাদের সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা হয়।

**৩. পরিবার ও শিশুকল্যাণ :** পারিবারিক ভাঙ্গন, বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব, সহিংসতা ইত্যাদি রোধে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা হয়। একটি সুশৃঙ্খল পারিবারিক পরিবেশ শিশুর একান্ত কাম্য। এক্ষেত্রে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। সুষ্ঠু পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে ব্যক্তি সমাজকর্ম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

**৪. পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যাস্ফীতি রোধ :** জনসংখ্যাস্ফীতি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল, পরিকল্পিত উপায়ে ছোট পরিবার গঠনের উপকারিতা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টির উন্নয়ন এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**৫. সংশোধনমূলক কার্যক্রম :** সংশোধনমূলক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো অপরাধীকে শারীরিক শাস্তি প্রদান না করে সংশোধন ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে অপরাধীর আচরণে পরিবর্তন আনয়ন। অপরাধীদের আচরণ পরিবর্তনে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে শিশু ও কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য প্রবেশন, জাতীয় কিশোর ও কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের আচরণে পরিবর্তন আনয়নের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

**৬. যুব অসন্তোষ দূরীকরণ :** বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যুব অসন্তোষ একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা। কেননা বেকারত্ব, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব, মাদকাসক্তি, হতাশা, প্রেমে ব্যর্থতা, রাজনৈতিক কলহ ইত্যাদি কারণে যুবসমাজ হতাশাগ্রস্ত হয়ে নানাবিধ অনৈতিক, অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। আর এসকল সমস্যা থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতে ও মোকাবিলায় ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**৭. মানসিক রোগীদের চিকিৎসা :** দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে সামাজিক সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলা সম্ভব।

**৮. প্রবীণকল্যাণ :** বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রবীণদের সংখ্যা ও তাদের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবীণদের শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, অবসরকালীন নানা সমস্যার সমাধান করে পরিবার ও সমাজে তাদের যথাযথ পুনর্বাসন করা যেতে পারে।

**৯. মাদকাসক্তি নিরাময় :** বাংলাদেশের সবচেয়ে উদ্যমী ও সম্ভাবনাময় যুবসমাজ দিন দিন মাদকের শিকারে পরিণত হয়ে তাদের কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলছে। যুক্ত হচ্ছে অনৈতিক, অসামাজিক, অপরাধমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। ব্যক্তি

সমাজকর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে এ শ্রেণিকে মাদকের কবল থেকে রক্ষা করে সমাজে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা সম্ভব।

**১০. নারী উন্নয়ন :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। কিন্তু বিশাল এ জনসংখ্যা পরিবার ও সমাজে তাদের স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করতে পারেনা। পারিবারিক ও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতা ও নিগৃহের কারণে তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক নানাদিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ছে। সুতরাং মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়নসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর যথাযথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলতে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অর্থবহ পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে সমাধান ব্যবস্থা নির্দেশ করে ব্যক্তিকে তার সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধারই ব্যক্তি সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো– ১) চিকিৎসা সমাজকর্ম ২) বিদ্যালয় সমাজকর্ম, ৩) শিশু ও পরিবারকল্যাণ, ৪) পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যাস্ফীতি রোধ, ৫) সংশোধনমূলক কার্যক্রম, ৬) যুব অসন্তোষ দূরীকরণ, ৭) মানসিক রোগীদের চিকিৎসা, ৮) প্রবীণকল্যাণ, ৯) মাদকাসক্তি নিরাময়, ১০) নারী উন্নয়ন ইত্যাদি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয় কবে?
ক) ১৯৫৮ সালে খ) ১৯৫৯ সালে
গ) ১৯৬০ সালে ঘ) ১৯৬১ সালে

২। বাংলাদেশে যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা হয়-
i. হাসপাতাল সমাজসেবা
ii. জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান
iii. নারী উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিনির্ভর পেশা কোনটি?
ক) অর্থনীতি খ) সমাজকর্ম গ) মনোবিজ্ঞান ঘ) সমাজবিজ্ঞান

২। ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান কয়টি?
ক) চারটি খ) পাঁচটি গ) ছয়টি ঘ) সাতটি

৩। ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার প্রথম স্তর কোনটি?
ক) মনো-সামাজিক অনুধ্যান খ) সমস্যা নির্ণয় গ) মূল্যায়ন ঘ) সমাধান ব্যবস্থা

৪। কোন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মাদকাসক্তি যুব অসন্তোষ, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি দূর করা সম্ভব?
ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম গ) সমষ্টি সংগঠন ঘ) সমষ্টি উন্নয়ন

৫। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি ও সমাজকর্মীর মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান?
ক) ব্যবসায়িক খ) পারিবারিক গ) পেশাগত ঘ) সামাজিক

৬। সাবা বিশ্বাস করে যে, শক্তি-সামর্থ্য-বুদ্ধি-যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেকটি ব্যক্তি আলাদা আলাদা। সাবার বিশ্বাসের সাথে কোনটির মিল রয়েছে?
ক) প্রভেদক নীতির খ) আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির গ) আত্মসচেতনতার নীতির ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ নীতির

৭। সমাজকর্মে পেশাগত সম্পর্ক বা র‍্যাপোর উদ্দেশ্য হলো–
i. সাহায্যার্থীর সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়
ii. সাহায্যার্থীকে মানসিক চাপমূলক অবস্থা থেকে মুক্তি দান
iii. সাহায্যার্থীর সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। বাংলাদেশে যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়–
i. হাসপাতাল সমাজসেবা
ii. প্রবীণ নিবাস
iii. জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৯ হতে ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
রিফাত একটি যন্ত্রাণাদায়ক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এ জন্য সে সমাজে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারছে না। উক্ত অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে।

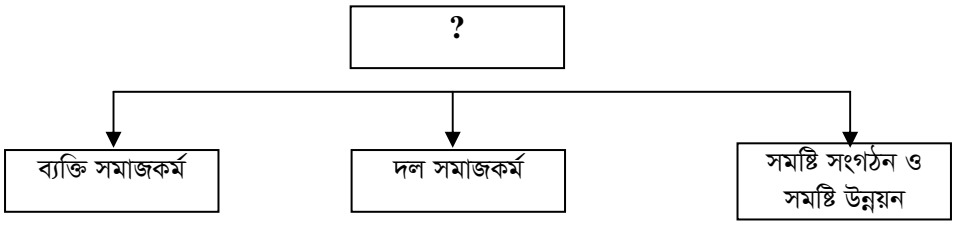
৯। উদ্দীপকে রিফাত যে অবস্থার মধ্যে রয়েছে তার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
ক) ভূমিকা পালনে সমস্যা খ) অবসাদ গ) হতাশা ঘ) বিচ্যুতি

১০। উদ্দীপকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা উক্ত অবস্থার সাথে কীভাবে প্রযোজ্য?
ক) অভ্যন্তরীণ উৎস খ) বাহ্যিক উৎস
গ) অভ্যন্তরীণ অবস্থা ঘ) বাহ্যিক অবস্থা

১১। সামাজিক বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী বিষয়গুলো হলো-
i. সামাজিক ভারসাম্যহীনতা
ii. আন্তঃব্যক্তিক দ্বন্দ্ব
iii. আন্তঃপারিবারিক দ্বন্দ্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১।




ক) ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান কয়টি? ১
খ) র‍্যাপো বলতে কী বোঝেন? ২
গ) উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে সমাজকর্মের যে ধরনের পদ্ধতির ইঙ্গিত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) "উক্ত পদ্ধতিগুলোর সমন্বিত প্রয়োগে সামাজিক সমস্যা দূর করা সম্ভব"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। জেরিন ধনী পরিবারের মেয়ে। বন্ধুদের খপ্পরে পড়ে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। তার বাবা জানতে পেরে তাকে একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করে দেন। সেখানকার চিকিৎসা সেবায় জেরিন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে।

ক) সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি ও কি কি? ১

খ) পেশাদার প্রতিনিধি বলতে কী বোঝেন? ২

গ) উদ্দীপকে জেরিনের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা বর্ণনা করুন। ৩

ঘ) "জেরিনের সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে ব্যবহৃত পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর"– আপনি কি একমত? উত্তরের স্বপক্ষে আপনার মতামত দিন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ : ১। খ ২। ক ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ : ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬ : ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭ : ১। গ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮ : ১। ক ২। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৭ : ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। গ ৬। ঘ ৭। ঘ ৮। ঘ ৯। ক ১০। খ ১১। ঘ

# সমাজকর্ম পদ্ধতি : দল এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন
**(Social Work Method : Social Group Work and Community Organization and Community Development)**

**ইউনিট ৮**

## ভূমিকা

দল ও সমষ্টিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির মধ্যে দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতিতে দল সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। শিল্পবিপ্লবের ফলে গ্রামীণ জনগণ অধিক হারে শহরে স্থানান্তরিত হয়। ফলে ব্যাপক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যার সমাধানে সেটেলমেন্ট হাউজ, নেইবারহুড সেন্টার, বয়েজ এ্যান্ড গার্লস স্কাউট, ফোর এইড ক্লাব, ইয়ংমেন এ্যান্ড ইয়ং উইমেন ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটি এগিয়ে আসে। এসব প্রতিষ্ঠানই মূলত দলকেন্দ্রিক সমাজকর্মের ভিত রচনা করে। ১৯২৩ সালে সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির স্কুল অব এ্যাপলাইড সোশ্যাল সাইন্সেস কর্তৃক দল সমাজকর্মের উপর দলভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪০ এর দশকে দল সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্মের একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে।

অন্যদিকে, সমষ্টি সংগঠন আধুনিক সমাজকর্মের সর্বশেষ সংযোজিত একটি মৌলিক পদ্ধতি। যুক্তরাষ্টের দান সংগঠন সমিতির আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। ১৯০৯ সালে আমেরিকার কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে সমষ্টি সংগঠন প্রতিষ্ঠানিক মর্যাদা অর্জন করে এবং ১৯৬২ সালে সমাজকর্ম শিক্ষা পরিষদ প্রকাশিত সমাজকর্ম শিক্ষা কারিকুলামে সমষ্টি সংগঠনকে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আবার বিভিন্ন দেশের পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার সার্বিক মান উন্নয়নে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। ১৯৫৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের পল্লী ও অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শহুরে এলাকার মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পায়।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ-৮.১ : দলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-৮.২ : দল সমাজকর্মের ধারণা, উপাদান ও নীতিমালা
পাঠ-৮.৩ : দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া
পাঠ-৮.৪ : দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া
পাঠ-৮.৫ : দল সমাজকর্মের ভূমিকা
পাঠ-৮.৬ : দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র
পাঠ-৮.৭ : সমষ্টির ধারণা ও প্রকৃতি
পাঠ-৮.৮ : সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন
পাঠ-৮.৯ : সমষ্টি সমাজকর্মের উপাদান
পাঠ-৮.১০ : সমষ্টি সমাজকর্মের নীতিমালা
পাঠ-৮.১১ : সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া
পাঠ-৮.১২ : সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্র
পাঠ-৮.১৩ : সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর আন্তঃসম্পর্ক

# পাঠ-৮.১ দলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ (Concept, Characteristics and Types of Group)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.১.১ সামাজিক দলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৮.১.২ সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
৮.১.৩ সামাজিক দলের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৮.১.১ সামাজিক দল

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধতা ছাড়া মানুষের একার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সমাজে বাস করতে গিয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু মানুষ খুব কাছাকাছি হয়। নিজেদের মধ্যে তৈরি হয় পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি। আর এভাবেই মানুষ একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে একের অধিক লোক যখন কোনো সাধারণ উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে তখন তাকে দল বলে। অন্যদিকে সামাজিক দল হলো কতগুলো মানুষের সমষ্টি, যারা সুনির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে।

শেরিফ এ্যান্ড শেরিফের মতে, একটি দল হলো কতগুলো ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক একক। এখানে ব্যক্তিগণ পারস্পরিক মর্যাদা ও ভূমিকার অংশীদার হয়। এক্ষেত্রে সদস্যদের আচরণের নির্দেশনা হিসেবে দলের কতগুলো নিজস্ব আদর্শ বা মূল্যবোধ থাকে।

রামনাথ শর্মার মতে, সামাজিক দল হলো ব্যক্তির মধ্যে সংগঠিত চুক্তি, যার সদস্যদের মধ্যে সাধারণ লক্ষ্য, স্বার্থ, উদ্দীপনা এবং পারস্পরিক আবেগ, সম্পর্ক এবং আন্তঃক্রিয়া বজায় থাকে।

সূতরাং বলা যায় যে, সামাজিক দল হলো একাধিক লোকের সমষ্টি যারা সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে তারা সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে।

### ৮.১.২ সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্য

Hans Raj তাঁর *Introduction to Sociology* গ্রন্থে সামাজিক দলের কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যেমন :

১. দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যামান থাকে;
২. দলের সদস্যদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি থাকে এবং নিজেরা একাত্মবোধ অনুভব করে;
৩. দলের সদস্যরা পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে;
৪. সদস্যরা দলের সাধারণ উদ্দেশ্য বা স্বার্থ অর্জনে সম্মিলিতভাবে কাজ করে;
৫. দলের সদস্যরা সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একই ধরনের পথ অনুসরণ করে; এবং
৬. দলের সদস্যরা দলীয় আদর্শ মেনে চলে।

**সার্বিকভাবে সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :**

১. এটি একটি সামাজিক একক, যা দুই বা ততোধিক লোকের সমষ্টি;
২. এক বা একাধিক সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনে এর সদস্যগণ একত্রিত হয়;
৩. সদস্যদের মধ্যে মনো-সামাজিক ঐক্য বিদ্যমান থাকে;
৪. দলের মধ্যে পরিবর্তন ও গতিশীলতা বিদ্যামান;
৫. সামাজিক দল অপেক্ষাকৃত স্থায়ী;
৬. দলের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে যোগাযোগ বিদ্যমান থাকে;
৭. সাধারণ নেতৃত্বের ভিত্তিতে দল পরিচালিত হয়;
৮. সাধারণ আদর্শ ও মূল্যবোধ বিদ্যমান, যা দলের সকল সদস্য মেনে চলে;

৯. দলের প্রতি সদস্যদের সাধারণ আনুগত্য বিদ্যমান থাকে। এর ভিত্তিতে সদস্যরা তাদের যৌথ স্বার্থকে রক্ষা করে; এবং
১০. দলের সদস্যরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ভূমিকা ও মর্যাদার অংশীদার হয়।

### ৮.১.৩ সামাজিক দলের শ্রেণিবিভাগ

সামাজিক দলসমূহকে এদের গঠন, আকৃতি, সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম প্রভৃতির আলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়। যথা :

**১. প্রাথমিক দল :** প্রাথমিক দল হলো সবচেয়ে সহজ ও সর্বজনীন সামাজিক দল। প্রাথমিক দল বলতে সেই দলকে বোঝানো হয় যার সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচিতি, অন্তরঙ্গতা ও যোগাযোগ বিদ্যমান থাকে। এ দলের পরিধি বা সদস্য সংখ্যা সীমিত সংখ্যক থাকে। সদস্যদের আচরণে আনুষ্ঠানিকতা কম এবং স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। এ ধরনের দলকে face to face group বলা হয়। এদের মধ্যে আমরা ভাব (we feeling) প্রকট থাকে। পরিবার, খেলার দল, প্রতিবেশি এ দলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

**২. গৌণ দল :** বৃহত্তর সমাজে বসবাস এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন ধারনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে গৌণ দলের ভূমিকাই প্রধান। গৌণ দলের সদস্যদের সম্পর্ক অনেকটা রীতি মাফিক। এদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা কম থাকে। কতগুলো নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে এ দল গড়ে ওঠে। এ ধরনের দলের সদস্য সংখ্যা ও পরিধি তুলনামূলকভাবে ব্যাপক। দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব অপেক্ষাকৃত বেশি এবং স্থায়িত্ব কম। ট্রেড ইউনিয়ন, বাণিজ্যিক সংঘ, ক্লাব এ দলের উদাহরণ।

**৩. অন্তঃদল :** ব্যক্তি যে দলের সদস্যভুক্ত এবং যে দলের সদস্যদের সাথে তার অন্তরঙ্গতা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতি, আবেগ, আনুগত্য বজায় থাকে সেটি ব্যক্তির নিকট অন্তঃদল। এ দলের সাথে ব্যক্তির দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক ঘনিষ্ট থাকে। অন্তঃদলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমবায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দলের জন্য উৎসর্গকৃত মনোভাব বিদ্যমান থাকে। এ দলকে we group বলা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তার নিজস্ব পরিবার, ক্লাব, সমিতি হলো তার অন্তঃদল।

**৪. বহিঃদল :** ব্যক্তি যে দলের সদস্য নয় এবং যে দল সম্পর্কে সে উদাসীনতা ও বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে তাই হলো ব্যক্তির বহিঃদল। এটাকে They group ও বলা হয়। খেলাধুলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো এ দলের উদাহরণ।

**৫. আনুষ্ঠানিক দল :** আনুষ্ঠানিক চুক্তি বা আঙ্গীকারের ভিত্তিতে যে দল গড়ে ওঠে তাই আনুষ্ঠানিক দল। এ দলের সদস্যদের নির্দিষ্ট আদর্শ, মূল্যবোধ ও নীতিমালা অনুসরণ করে চলতে হয়। এ দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নিয়ম মাফিক। এখানে নিয়ম-কানুনের আধিক্য বেশি থাকে। রাজনৈতিক দল, শ্রেণিকক্ষ প্রভৃতি এ দলের উদাহরণ।

**৬. অনানুষ্ঠানিক দল :** কিছু লোক যখন এক বা একাধিক সাধারণ মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য সংগঠিত হয় তখন তাকে অনানুষ্ঠানিক দল বলা হয়। এ দলের সদস্যভুক্তি ও কার্যাবলী রীতিমাফিক পরিচালিত হয় না। সাধারণত এ দল নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা না দেয়া পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

এছাড়াও স্থায়ী, অস্থায়ী, ব্যক্তিগত, নৈর্ব্যক্তিক, উন্নত, অনুন্নত, উলম্ব, আনুভূমিক, সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক, সমাজবিরোধী, স্বেচ্ছামূলক, অস্বেচ্ছামূলক, স্বাতন্ত্রসূচকসহ নানা ধরনের দল রয়েছে।

## সারসংক্ষেপ

মানুষ সামাজিক জীব। দলবদ্ধ ছাড়া মানুষের পক্ষে একা বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বর্তমান জটিল সমাজব্যবস্থায় দল ছাড়া সামাজিক জীবন কল্পনা করা যায়না। মানবজীবনের অস্তিত্বের প্রয়োজন ও অনিবার্য কারণে দল একান্ত প্রয়োজন। দল হলো একাধিক লোকের সম্মিলিতরূপ। একাধিক লোক যখন সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয় তাকে সামাজিক দল বলে। দলের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য এবং নীতিমালা থাকে যা দলের সকল সদস্যকে মেনে চলতে হয়। দল বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হলো– ক) প্রাথমিক দল, খ) গৌণ বা মাধ্যমিক দল, গ) অন্তঃদল, ঘ) বহিঃদল, ঙ) আনুষ্ঠানিক দল, চ) অনানুষ্ঠানিক দল প্রভৃতি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মানুষ কেন দলবদ্ধভাবে বসবাস করে?
ক) মানুষ সামাজিক জীব খ) মানুষ প্রকৃতিনির্ভর
গ) মানুষ ভীতু ঘ) মানুষ মরণশীল

২। কোন ধরনের দলকে we group বলা হয়?
ক) প্রাথমিক দল খ) গৌন দল
গ) অন্তঃদল ঘ) বহিঃদল

৩। একাধিক লোকের সমাবেশই দল। এক্ষেত্রে প্রযোজ্য-
i. নির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো
ii. সাধারণ উদ্দেশ্য
iii. পারস্পরিক সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i. ii ও iii

৪। প্রাথমিক দলকে face to face দল বলার কারণ–
i. প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান
ii. পরোক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান
iii. নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i. ii ও iii

## পাঠ-৮.২ দল সমাজকর্মের ধারণা, উপাদান ও নীতিমালা (Concept, Elements and Principles of Social Group Work)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.২.১ দল সমাজকর্ম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৮.২.২ দল সমাজকর্মের উপাদান কী তা বলতে পারবেন।
৮.২.৩ দল সমাজকর্মের নীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৮.২.১ দল সমাজকর্মের ধারণা

পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। সাধারণত দলীয় সদস্যদের সাথে শৃঙ্খলাপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক বা পরিকল্পিত উপায়ে কাজ করার বিশেষ পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য ও পেশাগত মূল্যবোধ অনুসরণ করে দলগত পর্যায়ে সমস্যার সমাধান এবং দলীয় উন্নয়নে সেবাদান প্রক্রিয়াকে বলা হয় দল সমাজকর্ম।

জি. কনকপা এর মতে, দল সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি পদ্ধতি যা উদ্দেশ্যপূর্ণ দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তিকে তার সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যার অধিকতর কার্যকরী মোকাবিলায় সহায়তা করে।

এইচ. বি ট্রেকার বলেন, দল সমাজকর্ম হলো দল সমাজকর্মী কর্তৃক দলের সদস্যদের সাহায্য করার এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সমাজকর্মী দলীয় কার্যাবলীতে সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে তারা নিজেরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে এবং তাদের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তি, দল ও সমাজের উন্নতি বিধানের সুযোগ লাভ করতে পারে।

সুতরাং বলা যায় যে, দল সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি মৌলিক পদ্ধতি, যা উদ্দেশ্যপূর্ণ দলীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দলের সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে দলীয় উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী একাধারে সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী হিসেবে কাজ করেন।

### ৮.২.২ দল সমাজকর্মের উপাদান

যে সকল বিষয় নিয়ে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় তাই হলো দল সমাজকর্মের উপাদান। নিচে দল সমাজকর্মের উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো :

**ক. সামাজিক দল :** দল সমাজকর্মের প্রাণ বলা হয় দলকে। দল হলো একাধিক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত সমাজিক একক। যারা নির্দিষ্ট সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। দল সমাজকর্মে সদস্যদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দলের আকার সীমিত হতে হয়।

**খ. দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান :** যে সকল প্রতিষ্ঠান দলীয় সেবাদানে নিয়োজিত তাই হলো দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান। দল সমাজকর্মী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে দলীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে। দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন– সরকারি, বেসকারি, একমুখী (কার্যক্রমভিত্তিক, বহুমুখী কার্যক্রমভিত্তিক, প্রত্যক্ষ) সেবাদানকারী, পরোক্ষ সেবাদানকারী প্রভৃতি। দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই দলের চাহিদা পূরণে সক্ষম হতে হবে। এছাড়া দলের প্রয়োজন বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা, দলকে সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার ও অপেশাদার কর্মীবাহিনী সমৃদ্ধ এবং পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়।

**গ. দল সমাজকর্মী :** দল সমাজকর্মে দল সমাজকর্মী হলো মূল চাবিকাঠি। তিনি এক্ষেত্রে একাধারে সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। দল সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নীতিমালা, কৌশল প্রভৃতি প্রয়োগে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিই হলেন দল সমাজকর্মী। তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে দলকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করেন। একজন দল সমাজকর্মীকে অবশ্যই দলীয় সদস্যদের সাথে উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, দলীয় অবস্থা বিশ্লেষণ, দলের সাথে মেলামেশা, দলীয় অনুভূতি ব্যবহার করে কার্যক্রম পরিচালনা, প্রতিষ্ঠান ও সমষ্টির সম্পদ ব্যবহারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হয়।

**ঘ. দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া :** কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে দল সমাজকর্মী পরিচালিত হয় । যে কৌশলের মাধ্যমে দলের সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলে। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া তখনই কার্যকর হয়, যখন সমাজকর্মী ব্যক্তি ও দলের উন্নয়নে দলীয় সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার কতগুলো ধাপ বা স্তর রয়েছে। যথা– দল গঠন, মূল্যায়ন ও যাচাই, লক্ষ্য নির্ধারণ ও সংযোগ স্থাপন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন ও সমাপ্তি।

### ৮.২.৩ দল সমাজকর্মের নীতিমালা

দল সমাজকর্ম অনুশীলনে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করতে হয় যা সুশৃঙ্খল, পরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে দল সমাজকর্ম পরিচালনায় সহায়তা করে। দল সমাজকর্মের নীতিমালা নিচে আলোচনা করা হলো :

**১. পরিকল্পিত দলগঠন নীতি :** দল সমাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো দল। দল সমাজকর্মীকে তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুসারে পরিকল্পিত দলগঠন করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দল সমাজকর্ম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হয়। উত্তম পরিকল্পিত দলগঠন যথাযথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং দলীয় সন্তুষ্টি লাভে সহায়তা করে।

**২. সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের নীতি :** দলের সদস্যদের কল্যাণে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয় । উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো কার্যক্রমই সফল হয় না । সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে দলীয় সদস্যদেরকে বিশেষভাবে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন করে তোলে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য সমাজকর্মীকে কিছু বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। যেমন– দলীয় সদস্যদের চাহিদা, প্রত্যাশা, সমস্যা, সম্পদ, সীমাবদ্ধতা, সক্ষমতা, দল ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, দলীয় সদস্যদের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তসম্পর্কের প্রকৃতি।

**৩. দল-কর্মীর মধ্যে সম্পর্কের নীতি :** দল সমাজকর্মে সমাজকর্মী-দল সম্পর্ক একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। দল সমাজকর্মে সমাজকর্মী ও দলের মধ্যে অবশ্যই উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে । সমাজকর্মী ও দলের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে কার্যকর উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। দল সমাজকর্মী ও দলীয় সদস্যরা পরস্পরকে কীভাবে গ্রহণ করে তার উপর এ সম্পর্কের কার্যকরিতা অনেকটা নির্ভরশীল। এ সম্পর্ককে কার্যকর করার জন্য অবশ্যই দল সমাজকর্মীকে দলীয় সদস্যদেরকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা উচিত। তেমনি দলীয় সদস্যরাও দল সমাজকর্মীকে আন্তরিকতা ও উষ্ণতার সাথে গ্রহণ করবে। আর এভাবেই পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

**৪. ধারাবাহিক স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি :** সম্পদ, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য, নীতি, মূল্যবোধ, লক্ষ্যভেদে যেমন প্রতিটি দল আলাদা তেমনি দলের প্রত্যেকটি সদস্যও স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকেই এই স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি চায়। স্বাতন্ত্রীকরণ দল সমাজকর্ম অনুশীলনে সাফল্য লাভের অন্যতম উপায়। তাই দল সমাজকর্ম অনুশীলনে দল ও দলীয় সদস্যদের ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করা দল সমাজকর্মীর জন্য আবশ্যক।

**৫. নির্দেশিত দলীয় আন্তক্রিয়ার নীতি :** দল একটি গতিশীল সত্ত্বা। দলকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গতি ও প্রকৃতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন যা দল সমাজকর্মের অন্যতম নীতি। দল সমাজকর্মে দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক আন্তক্রিয়া গঠনকারী উপাদানসমূহ হলো– দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, সম্মতি, আনুগত্য, প্রতিপত্তি, অভিযোজন ইত্যাদি।

**৬. দলীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি :** দল একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা। সতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে দলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আপন বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী দলকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে দল সমাজকর্মী দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি, দলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, দলীয় সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা, সদস্যদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, সদস্যদের মধ্যে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি এবং দায়িত্ববোধ ও স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চারে সহায়তা করবে।

**৭. নমনীয় কর্মমুখী প্রতিষ্ঠানের নীতি :** এই নীতিটি প্রতিষ্ঠান ও দল উভয় ক্ষেত্রে অনুশীলন জরুরি। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো নমনীয় হওয়া প্রয়োজন, যাতে দলীয় ও সামাজিক পরিবর্তন এবং প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন সেবাকার্যক্রম গ্রহণ, পুরাতন কর্মসূচির সংশোধন এবং সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন আনা যায়। অন্যদিকে দলের সাংগঠনিক কাঠামোও নমনীয় হতে হবে, যেন সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে নেতৃত্বের পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় এবং দলের উন্নতির জন্য পরিবর্তন জনিত অবস্থার সাথে দল খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়।

**৮. প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ নীতি :** প্রত্যেকটি দলের লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায় হলো সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন। দল সমাজকর্মে কর্মসূচি প্রণয়নে দলীয় সদস্যদের আগ্রহ, সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় আনতে হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের মতামত প্রকাশের মাধ্যমে তাদের দ্বারা সময়োপযোগী কর্মসূচি প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।

**৯. সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি :** এই নীতির মাধ্যমে দলের লক্ষ্য অর্জন ও সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস্য হতে প্রাপ্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের (দলীয় সম্পদ, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, সমষ্টির সম্পদ) সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

**১০. মূল্যায়ন নীতি :** দল সমাজকর্ম একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী সেবা প্রদান করে থাকে। এ কারণে দল সমাজকর্ম কার্যক্রমের সাফল্য, ব্যর্থতা, সক্ষমতা, দুর্বলতা প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়। এই মূল্যায়ন দল সমাজকর্মের কার্যকারিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দলের সদস্যদের জন্য যথাযথ কর্মকৌশল নির্ধারণে সহায়তা করে।

## সারসংক্ষেপ

পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য ও কৌশল প্রয়োগ করে দলীয় পর্যায়ে সমস্যার সমাধান এবং দলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেবাদানের প্রক্রিয়াকে বলা হয় দল সমাজকর্ম। এক্ষেত্রে দল সমাজকর্মীর অংশগ্রহণের পাশাপাশি দলীয় সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। দল সমাজকর্মে সমাজকর্মী একাধারে সাহায্যকারী ও সক্ষমকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। দল সমাজকর্ম সাধারনত চারটি উপাদানের সমন্বিত রূপ। যেমন– ক) সামাজিক দল, খ) দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান, গ) দল সমাজকর্মী এবং ঘ) দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া। এছাড়া দল সমাজকর্ম অনুশীলনে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসৃত হয়। যথা– ১) পরিকল্পিত দল গঠন নীতি, ২) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের নীতি, ৩) দল-কর্মীর মধ্যে সম্পর্কের নীতি, ৪) ধারাবাহিক স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি, ৫) নির্দেশিত দলীয় আন্তক্রিয়ার নীতি, ৬) দলীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি,৭) নমনীয় কর্মমুখী প্রতিষ্ঠানের নীতি, ৮) প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ নীতি, ৯) সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি এবং ১০) মূল্যায়ন নীতি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিতে সমাজকর্মী একাধারে সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন?
ক) ব্যক্তি সমাজকর্মে খ) দল সমাজকর্মে
গ) সমষ্টি সংগঠনে ঘ) সমষ্টি উন্নয়নে

২। দল সমাজকর্মের উপাদান কয়টি?
ক) ৪টি খ) ৫টি
গ) ৬টি ঘ) ৭টি

৩। দল সমাজকর্মীকে যেসব গুণের অধিকারী হতে হয়–
i. জ্ঞানসম্পন্ন
ii. অভিজ্ঞতাসম্পন্ন
iii. দক্ষতাসম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i. ii ও iii

## পাঠ-৮.৩ দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া (Process of Social Group Work)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.৩.১ দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া কী তা জানতে পারবেন।

৮.৩.২ দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার ধাপ বা পর্যায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৮.৩.১ দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া

দলীয় আন্তঃক্রিয়ার ফলে দলে সে গতিশীলতা সৃষ্টি হয় তাকে দলীয় প্রক্রিয়া বলা হয়। আর দলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে যখন সমাজকর্মী দলকে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরিচালনা করেন, তখন তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয়। দল সমাজকর্মের দল সর্বদা উদ্দেশ্যমুখী। সমাজকর্মী এক্ষেত্রে দলের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হস্তক্ষেপ করে থাকেন।

এইচ. বি ট্রেকারের মতে, দল সমাজকর্মী যখন ব্যক্তিগত ও দলগত উন্নয়নে দলীয় সদস্যদের আন্তঃক্রিয়াকে সচেতন ভাবে নির্দেশনা ও পরিচালনা করেন তখন তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয়।

সূতরাং বলা যায় দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া হলো দলীয় প্রক্রিয়ার পরিবর্তিত ও রূপ, যেখানে দল সমাজকর্মী দলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দলের সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে থাকেন।

দল সমাজকর্ম বিশ্লেষণ করলে এর দু'টি বিশেষ দিক দেখতে পাওয়া যায় । যথা– উন্নয়নমূলক দিক ও প্রতিকারমূলক দিক। যখন দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের কার্যকর ও গঠনমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয় তাকে উন্নয়নমূলক দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলে। আর যখন দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলীয় দ্বন্দ্ব ও অসম প্রতিযোগিতা দূরীকরণের জন্য দলীয় সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে প্রতিকারমূলক দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয়।

### ৮.৩.২ দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার পর্যায়সমূহ

দলের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দলকে কতগুলো পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। প্রতিটি পর্যায়ে সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধ দ্বারা দলকে সহায়তা করেন। পর্যায়সমূহ হলো :

**১। গঠন পর্যায় :** এটি হলো দল গঠনের প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে দলের সদস্য সংগ্রহ করা হয়। এ পর্যায়ে ব্যক্তি কোনো দলে অন্তর্ভুক্ত হবে, দলে তার করণীয় কী, দলীয় আচরণ কী হবে কিছুই সে জানতে বা বুঝতে পারেনা। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী ব্যক্তির পছন্দ ও ইচ্ছানুযায়ী দলে অন্তর্ভুক্ত হতে সহায়তা করেন।

**২। দুর্যোগ পর্যায় :** এটি দলের বিকাশ পর্যায়। এ পর্যায়ে দল গড়ে উঠতে পারে আবার ভেঙ্গেও যেতে পারে। সে জন্য এ পর্যায়কে দুর্যোগ পর্যায় বলা হয়। এ পর্যায়ে দলের প্রত্যেক সদস্য তার নিজের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করে এবং দৃঢ় অবস্থান ও নেতৃত্বের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলের সদস্যদেরকে বাস্তববাদী হওয়ার পরামর্শ দেন এবং হতাশাগ্রস্তদেরকে উৎসাহ দেন।

**৩। আদর্শিক পর্যায় :** এ পর্যায়ে দল একটি সাংগঠনিক রূপ নেয়। দলের সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাস, সংহতি, অন্তরঙ্গতা, আমাদের দল প্রভৃতি মনোভাবের বিকাশ ঘটে। দলের উদ্দেশ্য, ভূমিকা, মূল্যবোধ ও কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন।

**৪। কার্যকর পর্যায় :** এ পর্যায়ে দল সম্পদশালী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। দলের লক্ষ্য অর্জন ও সমস্যা সমাধানে দলীয় সদস্যদের জ্ঞান, দক্ষতা পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে। দলের বিশ্বাস, সংহতি ও সাংগঠনিক কাঠামো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা পায়।

**৫। চূড়ান্ত পর্যায় :** এ পর্যায়ে দল প্রণীত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং তা বাস্তবায়নে দলের সদস্যদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

## সারসংক্ষেপ

দল সমাজকর্মের দল সর্বদা উদ্দেশ্যমুখী। এ উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যখন দল সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সুপরিকল্পিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয়। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করে সম্পন্ন হয়। যেমন– ক) গঠন পর্যায়, খ) দূর্যোগ পর্যায়, গ) আদর্শিক পর্যায়, ঘ) কার্যকরী পর্যায় এবং ঙ) চূড়ান্ত পর্যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার পর্যায় কয়টি?

ক) ৩টি খ) ৪টি

গ) ৫টি ঘ) ৬টি

২। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় দল সমাজকর্মী দলের সদস্যদের–

i. ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে

ii. দিক নির্দেশনা প্রদান করে

iii. অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i. ii ও iii

## পাঠ-৮.৪ দল সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া (Problem Solving Process in Social Group Work)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.৪.১ দল সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৮.৪.১ দল সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

দলের সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্মী যেসব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাই হলো দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া। জি. কনকপা ও ডব্লিউ. এ. ফ্রিডল্যান্ডার এর মতে, দল সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত স্তর বা ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হয়। যথা :

**১. অনুধ্যান :** দলের যে কোনো সমস্যা মোকাবিলার জন্য দল সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সরাসরি অংশগ্রহণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দলের স্বরূপ, প্রকৃতি, দলের অবস্থান, পরিচিতি, দলীয় সদস্যদের বৈশিষ্ট্য, দলীয় সম্পদ ও সামর্থ্য, দলীয় প্রক্রিয়া ও সমস্যাসমূহ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও তার প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এ স্তরকে তথ্যানুসন্ধানও বলা হয়ে থাকে ।

**২. সমস্যা নির্ণয় :** এ স্তরে দলের সমস্যা ও দলীয় সদস্যদের চাহিদা নিরূপণ করা হয়। এক্ষেত্রে অনুধ্যানে প্রাপ্ত তথ্যাবলী সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে দলের সমস্যা নির্ণয় ও দলীয় সদস্যদের চাহিদা নিরূপণ এবং সমস্যা সমাধান ও চাহিদা পূরণের জন্য বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের স্তরও বলা হয়ে থাকে।

**৩. সমাধান :** অনুধ্যান ও সমস্যা নির্ণয়ের প্রেক্ষিতে দলীয় সমস্যা সমাধান বা সেবাদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে দলের গঠন, প্রকৃতি, দলীয় সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, দলের উদ্দেশ্য, দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিবেচনায় এনে সেবা প্রদান করা হয়। সাধারণত যে সকল পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দল সমাজকর্মী দলীয় সমস্যা সমাধান করে থাকেন সে গুলো হলো– ক) একনায়কত্ব বা প্রভুত্বব্যঞ্জক পদ্ধতি, খ) দৃষ্টান্তমূলক পদ্ধতি, গ) শিক্ষামূলক পদ্ধতি, ঘ) উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি এবং ঙ) সক্ষমকারী পদ্ধতি।

**৪. মূল্যায়ন :** দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় সেবাদানের সর্বশেষ স্তর হলো মূল্যায়ন। এ স্তরে সেবাদানের সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপণ করা হয়। অর্থাৎ প্রদেয় সেবা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হয়েছে তা যাচাই করা হয়। অন্যদিকে যদি সেবা ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় সে ক্ষেত্রে তার কারণ নির্ণয় করে পূণরায় সেবা প্রদান করা হয়। দল সমাজকর্মের সেবাদান প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক ও মেয়াদী এ দুধরনের মূল্যায়ন করা হয়।

## সারসংক্ষেপ

দল একটি গতিশীল সত্ত্বা। দলীয় সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে দলে এই গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। দলের সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলের সমস্যা সমাধানে যে সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন তাই হলো দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া। দলীয় সমস্যা সমাধানে কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় অনুসরণ করতে হয়। তা হলো– ক) অনুধ্যান, খ) সমস্যা নির্ণয়, গ) সমাধান এবং ঘ) মূল্যায়ন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দলের সমস্যা মোকাবিলায় দল সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় কোনটির মাধ্যমে?
ক) অনুধ্যান খ) সমস্যা নির্ণয়
গ) সমাধান ঘ) মূল্যায়ন

২। দলের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাকে কী বলা হয়?
ক) দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া খ) দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া
গ) দলীয় প্রক্রিয়া ঘ) দলীয় আন্তক্রিয়া

৩। দলের সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো-
i. দৃষ্টান্তমূলক
ii. শিক্ষামূলক
iii. প্রভুত্বব্যঞ্জক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i. ii ও iii

## পাঠ-৮.৫ দল সমাজকর্মীর ভূমিকা (Role of Social Group Worker)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.৫.১ দল সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৮.৫.১ দল সমাজকর্মীর ভূমিকা

দল একটি গতিশীল সত্ত্বা। এর অন্যতম উপাদান হলো সমাজকর্মী যার ভূমিকা বিভিন্নমুখী। একজন দল সমাজকর্মী কখনো নেতৃত্বদানকারী, কখনো নিয়ন্ত্রণকারী, কখনো মধ্যস্থতাকারী, কখনো সাহায্যকারী আবার কখনো কর্মসূচি প্রণয়নকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই দল সমাজকর্মীকে প্রতিষ্ঠান এবং দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, নীতিমালা, সম্পদ, সামর্থ্য, দলীয় সদস্যদের চাহিদা ইত্যাদির দিকে খেয়াল রাখতে হয়। নিচে দল সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

**১. দলের সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ :** দলের লক্ষ্য অর্জনে দলের প্রত্যেক সদস্যকে কোনো না কোনো ভূমিকা পালন করতে হয়। প্রত্যেক সদস্যের পারস্পরিক সহযোগিতায় যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই দলীয় লক্ষ্য অর্জিত হয়। সমাজকর্মী দলের সদস্যদের কার কী ভূমিকা হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করেন।

**২. কার্যকর দলীয় কাঠামো গঠন :** প্রত্যেক দলেরই একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকে যা দলীয় লক্ষ্য ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ দলীয় কাঠামো সহজেই দলকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমাজকর্মী দলকে তার সাংগঠনিক কাঠামো গঠনে সহায়তা করে থাকেন।

**৩. বাস্তবধর্মী উদ্দেশ্য ও আদর্শ নির্ধারণ :** কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে দল গঠিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য যদি বাস্তবমুখী না হয় তবে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। সেজন্য সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে দলকে বাস্তবধর্মী লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে থাকেন।

**৪. কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :** প্রত্যেক দলের লক্ষ্য ও দল উপযোগী কর্মসূচি থাকে। দল সমাজকর্মী এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দিয়ে দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও এজেন্সির নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়ন উপযোগী দলীয় কর্মসূচি নির্ধারণ করে থাকেন।

**৫. সম্পদের সদ্ব্যবহার :** সাধারণভাবে প্রাপ্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ, দলের সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও সমষ্টির সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তা যথাযথভাবে ব্যবহারের উপর দলের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অনেকটাই নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী দলকে এমনভাবে সহায়তা করেন যাতে তারা তাদের বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে।

**৬. গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা :** দলের সার্বিক উন্নয়নে যোগ্য নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম এবং নেতৃত্ব অবশ্যই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীর কর্তব্য হলো দলকে এমনভাবে সহায়তা করা যাতে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা অব্যাহত থাকে, সকলের অংশগ্রহণ ও মতামত গুরুত্ব পায়, সঠিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং দলের সদস্যরা কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়।

**৭. দ্বন্দ্ব দূরীকরণ :** দলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্বাভাবিক বিষয়। কোনো সক্রিয় দলে উপদল সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দ্বন্দ্ব স্থায়ী হলে তা দলের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দলে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মূল কারণ হলো বঞ্চনা, নির্যাতন, অসন্তোষ, ক্ষোভ, ব্যক্তিত্বের পার্থক্য প্রভৃতি। সমাজকর্মী অসন্তোষ দূর করে বন্ধুত্বপূর্ণ ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টিতে দলকে সহায়তা করে থাকেন।

**৮. প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান :** দলের সুষ্ঠু গতিশীলতার জন্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, সুযোগ-সুবিধা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে সদস্যদের পূর্ণজ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব জ্ঞান থাকলে দলের সদস্যদের পক্ষে নিজ নিজ ভূমিকা পালন যেমন সহজতর হয় তেমনি তাদের প্রত্যাশাও বাঞ্ছিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। সমাজকর্মী সদস্যদের এসব বিষয়ে জ্ঞানদান করে থাকেন।

**৯. শিক্ষামূলক ভূমিকা :** দল সমাজকর্মীকে দলের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। সমাজকর্মী নিঃসন্দেহে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত। দলের সদস্যদের যেসব বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব রয়েছে সেসব দিক সম্পর্কে তিনি তাদের জ্ঞানদান এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে দলকে সহায়তা করে থাকেন।

**১০. সন্তোষজনক দলীয় পরিবেশ সৃষ্টি :** অনুকূল ও সন্তোষজনক পরিবেশ ছাড়া দলের সদস্যদের সত্যিকার চাহিদা পূরণ ও লক্ষ্য অর্জিত হয়না। সেজন্য সমাজকর্মীর ভূমিকা হলো দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ ও বিবাদ দূর করে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্বাভাবিক ভূমিকা পালন সহজতর হয়।

**১১. প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করা :** সমাজকর্মী যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করাও তার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। জনগণ ও সমাজের কাছে তার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও কার্যক্রম তুলে ধরা তার অন্যতম দায়িত্ব। পরিচিতি তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি সামাজিক সমর্থন আদায় করেন এবং সমষ্টির সম্পদ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা আদায়ে দলকে সহায়তা করে থাকেন।

## সারসংক্ষেপ

দল সমাজকর্মী মূলত দলের চাবিকাঠি। দলের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য দলের সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে সদস্যদের চাহিদা পূরণ ও দলীয় সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্মী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। দলে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা বহুমুখী। তিনি কখনো নেতৃত্বদানকারী, কখনো নিয়ন্ত্রণকারী, কখনো সাহায্যকারী আবার কখনো বা কর্মসূচি প্রণয়নকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। একজন সমাজকর্মী সাধারনত যেসকল ভূমিকা পালন করে থাকেন তা হলো– ১) কার্যকর দলীয় কাঠামো গঠন, ২) দলের সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ, ৩) বাস্তবধর্মী উদ্দেশ্য ও আদর্শ নির্ধারণ, ৪) কর্মসূচি প্রণয়ন, ৫) সম্পদের সদ্ব্যবহার, ৬) গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা, ৭) দ্বন্দ্ব দূরীকরণ, ৮) প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান, ৯) শিক্ষামূলক ভূমিকা, ১০) সন্তোষজনক দলীয় পরিবেশ সৃষ্টি, ১১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করা ইত্যাদি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দলে কার ভূমিকা বিভিন্নমুখী?
- ক) দল সমাজকর্মী
- খ) দলের সদস্য
- গ) দলের নেতৃত্ব
- ঘ) দলীয় প্রতিষ্ঠান

২। দলের সম্পদ সাধারণত-
i. সাধারণভাবে প্রাপ্ত সম্পদ ii. প্রতিষ্ঠানের সম্পদ iii. সমষ্টির সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i. ii ও iii

৩। দলে সমাজকর্মীর ভূমিকা হলো-
i. দ্বন্দ্ব দূর করা ii. সন্তোষজনক দলীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা iii. প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করা
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i. ii ও iii

## পাঠ-৮.৬ দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র (Fields of Social Group Work)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.৬.১ বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৮.৬.১ বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র

বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র নিচে আলোচনা করা হলো :

**১. কৃষি উন্নয়ন :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি উন্নয়নের সাথে এদেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। এদেশের কৃষি ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। এসমস্ত সমস্যা দূর করে দরিদ্র কৃষক শ্রেণিকে সংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন

ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অনেক কর্মসূচি রয়েছে যেখানে দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করে কৃষির উন্নয়ন করা হচ্ছে। যেমন– বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ব্র্যাক, প্রশিকা প্রভৃতি।

**২. সমবায় সমিতি গঠন :** বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সমবায় কর্মসূচি। সমবায় কর্মসূচির সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আমাদের দেশে বিশেষ করে দরিদ্র ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা, কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ করে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

**৩. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণ :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এসব সমস্যা দূর করার জন্য বয়স্ক ও সামাজিক শিক্ষাদান একান্ত প্রয়োজন। দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর করা সম্ভব।

**৪. পরিবার পরিকল্পনা :** পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র, অশিক্ষিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি। আনুষ্ঠানিকভাবে দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করে এদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল এবং ছোট পরিবার গঠনের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা সম্ভব।

**৫. বেকারত্ব দূরীকরণ :** বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বেকার। এদের মধ্যে একটি বড় অংশই হলো মৌসুমী বেকার। পরিকল্পিত ও সংগঠিত দলীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্থানীয় কাঁচামাল ও চাহিদানির্ভর ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপনের মাধ্যমে যেমন মৌসুমি ও ছদ্ম বেকারদের খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তেমনি বিপুল পরিমাণ শ্রম শক্তিকে উৎপাদনমুখী কাজে লাগানো সম্ভব।

**৬. নারীকল্যাণ :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কিন্তু তারা নানাভাবে বৈষম্য এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার। উৎপাদন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি নেই বললেই চলে– যদিও বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসে নারী শ্রমের মাধ্যমে যেমন– গার্মেন্টস শিল্প, কৃষিকাজ ইত্যাদি। দলীয় পর্যায়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ নারীদের যেমন সচেতন জনশক্তিতে পরিণত করে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা যায়, তেমনি দুঃস্থ, অসহায় দরিদ্র নারীদেরও সমাজে সুষ্ঠুভাবে পুণর্বাসন করা সম্ভব।

**৭. যুবকল্যাণ :** যুব অসন্তোষ বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এর ফলে উৎপাদনশীল শ্রম শক্তির যেমন অপচয় হচ্ছে তেমনি সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশে বিপথগামী যুবসমাজকে কর্মমুখী ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করতে দল সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা ও কৌশল প্রয়োগ করা যায়।

**৮. পরিবারকল্যাণ :** পরিবার হলো সমাজের প্রাথমিক দল। আর্থ-সামাজিক প্রতিকূল অবস্থার কারণে এদেশের পরিবারগুলো সুষ্ঠুভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারেনা। তাই সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিবার গঠন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**৯. শিশু সদন বা শিশু পরিবার :** বাংলাদেশের শিশু পরিবারগুলোতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ছেলে-মেয়েরা বসবাস করে। দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করে এদের মধ্যে সখ্যতার বন্ধন সৃষ্টি করা যায়। এছাড়া শিশুদের উপযোগী নানা দলীয় কাজের মাধ্যমে এদের মধ্যে দায়িত্বশীল নাগরিকত্ববোধ এবং স্বনির্ভর মনোবৃত্তি সৃষ্টি করাও সম্ভব যা তাদের পরবর্তী জীবনে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

**১০. শ্রমকল্যাণ :** শ্রম অসন্তোষ দূরীকরণে দল সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের দেশের শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে সম্প্রীতি ও দলীয় সংহতির অভাব থাকায় মালিক শ্রেণি তাদের নানাভাবে বঞ্চিত করার সুযোগ পায়। দল সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করে শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ে সহায়তা করা যেতে পারে।

**১১. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান :** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে দল সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যকার উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ, ক্লাস ফাঁকি দেওয়া, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন,

প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বিনষ্টকরণ প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত রাখতে দল সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ভ্রমণ, চিত্তবিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়।

**১২. কিশোর অপরাধ সংশোধন :** কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে বোরস্টাল স্কুল ও কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

## সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যতম দেশ। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, প্রতিকূল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এখানে নানা সমস্যা বিদ্যমান। এ কারণে বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যেসকল ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– ১) কৃষি উন্নয়ন, ২) সমবায় কর্মসূচি, ৩) নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণ, ৪) পরিবার পরিকল্পনা, ৫) বেকারত্ব দূরীকরণ, ৬) নারীকল্যাণ, ৭) যুবকল্যাণ, ৮) পরিবারকল্যাণ, ৯) শিশু পরিবার, ১০) শ্রমকল্যাণ, ১১) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ১২) কিশোর অপরাধ সংশোধন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পরিবার সামাজিক দলের মধ্যে কোন পর্যায়ের?

ক) প্রাথমিক দল খ) গৌণ দল

গ) বহিঃদল ঘ) আনুষ্ঠানিক দল

২। বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যার অন্যতম কারণ–

i. সম্পদের সীমাবদ্ধতা ii. প্রতিকূল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা iii. প্রতিকূল সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৮.৭ সমষ্টির ধারণা ও প্রকৃতি (Concept and Nature of Community)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.৭.১ সমষ্টি প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৮.৭.২ সমষ্টির প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।

## ৮.৭.১ সমষ্টির ধারণা

মানুষ স্বভাবতই দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ একে অপরের সাথে নানা সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। আর এভাবেই গড়ে ওঠে জনসমষ্টি। সাধারণভাবে সমষ্টি বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসরত একদল মানুষকে বুঝায়, যারা কতিপয় মৌলিক ও অভিন্ন স্বার্থ রক্ষায় পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমজাতীয় ধ্যান ধারণা পোষণ করে।

সমষ্টির সংজ্ঞায় ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, যখন কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা এমনভাবে বসবাস করে যে, তারা বিশেষ কোনো স্বার্থের অংশীদার না হয়ে স্বাভাবিক জীবনের মৌলিক বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করে তখন আমরা ঐ গোষ্ঠীকে সমষ্টি বলে থাকি।

গফুর ও মান্নান এর মতে, জনসমষ্টি হলো একদল লোকের সমষ্টি, যারা একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও গ্রহণযোগ্যতা বিদ্যমান এবং কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা অন্য প্রতিবেশি গোষ্ঠী থেকে আলাদা।

সুতরাং সমষ্টি বলতে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসরত এমন একদল মানুষকে বোঝায়, যারা সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়ে বসবাস করে এবং যারা সমষ্টির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কতিপয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, যা তাদের মধ্যে সাধারণ বন্ধন সৃষ্টি করে এবং 'আমরা বোধ' জাগিয়ে তোলে।

### ৮.৭.২ সমষ্টির প্রকৃতি

প্রত্যকটি সমষ্টির নিজস্ব কিছু রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আদর্শ ও সংস্কৃতি থাকে, যা ঐ সমষ্টির সকল সদস্য মেনে চলে। এসব আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে স্বজাত্যবোধ। সমষ্টির মূল্য বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি হলো দুটি। যথা– ১। নির্দিষ্ট অঞ্চল ও ২। স্বজাত্যবোধ।

**১। নির্দিষ্ট অঞ্চল :** প্রত্যেকটি সম্প্রদায় বা সমষ্টি একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে। এক্ষেত্রে বসবাসকারী প্রত্যেকটি সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিত ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা বিভিন্ন প্রয়োজনে একে অন্যের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও দ্রব্যাদি আদানপ্রদান করে থাকে। নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে তারা ঐ এলাকায় নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে পারস্পরিক আন্তক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে।

**২। স্বজাত্যবোধ :** নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসের ক্ষেত্রে সমষ্টি নির্দিষ্ট কিছু আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুশীলন করে থাকে। আর এই অনুশীলনের প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে স্বজাত্যবোধ। সমষ্টির প্রতিটি সদস্য এই স্বজাত্যবোধের কারণে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর ফলে পারস্পরিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। সমষ্টির এই স্বজাত্যবোধ তিনটি আলাদা অনুভূতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে। যথা:

**ক) আমরাবোধ :** স্বজাত্যবোধ থেকে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে 'আমরাবোধ' বা we feeling তৈরি হয়, যা সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে সমষ্টির উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথ সুগম করে দেয়।

**খ) ভূমিকা পালন মনোভাব :** স্বজাত্যবোধ ও আমরাবোধের কারণে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়। আর এ কারণে সমষ্টির প্রতিটি সদস্য তার যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্রিয় হয়। ফলে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ট আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

**গ) নির্ভরতা মনোভাব :** সমষ্টির সদস্যদের পারস্পরিক পরিচিতি, সহযোগিতা, স্বজাত্যবোধ ও আমরা বোধ সৃষ্টির কারণে পরস্পরের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে এক অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার প্রেক্ষিতে একে অন্যের প্রয়োজনসমূহ পূরণে এগিয়ে আসে।

## সারসংক্ষেপ

দলবদ্ধ জীবনযাপন করা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। দলবদ্ধ জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই মূলত সমষ্টির উদ্ভব হয়। সমষ্টি হলো এমন একটি জনসম্প্রদায় যারা একই রীতিনীতি, একই ধরনের আচার ব্যবহার, একই ঐতিহ্য, একই সামাজিক আদর্শ ও স্বার্থে উদ্বুদ্ধ এবং একই সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় একত্রে বসবাস করে এবং জীবনযাপনের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের কিছু নির্দিষ্ট রীতিনীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ রয়েছে, যা সম্প্রদায়ের সদস্যরা মেনে চলে। আর এসব মূল্যবোধ ও আদর্শের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে স্বজাত্যবোধ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কারা অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে?
ক) সামাজিক দল খ) জনসমষ্টি
গ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঘ) সামাজিক সংগঠন

২। সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে 'আমরা বোধ' সৃষ্টি হয় কীভাবে?
ক) স্বজাত্যবোধ থেকে খ) পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে
গ) পারস্পরিক বন্ধন থেকে ঘ) গোষ্ঠীগত মনোভাব থেকে

৩। সমষ্টির মধ্যে গড়ে ওঠা স্বজাত্যবোধ তৈরি হয় যে সকল অনুভূতির সংমিশ্রনে–
i. আমরাবোধ ii. ভূমিকা পালন মনোভাব iii. নির্ভরতার মনোভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৮.৮ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন (Community Organization and Community Development)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.৮.১ সমষ্টি সংগঠন বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৮.৮.২ সমষ্টি উন্নয়ন বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৮.৮.১ সমষ্টি সংগঠন

পেশাদার সমাজকর্মের তৃতীয় মৌলিক পদ্ধতি হলো সমষ্টি সংগঠন। তবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সমষ্টিগত সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে বর্তমান গ্রন্থে সমাজকর্মের তৃতীয় মৌলিক পদ্ধতিকে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে ।

সাধারণভাবে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট জনসমষ্টির সমাজকল্যাণমূলক চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়াকে সমষ্টি সংগঠন বলা হয়। অর্থাৎ সমষ্টির সম্পদের মাধ্যমে কীভাবে সমষ্টির চাহিদা পূরণ করা যায়, তার সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নই হলো সমষ্টি সংগঠন।

ম্যারি জি. রস বলেন, সমষ্টি সংগঠন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা সমষ্টির চাহিদা বা উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করে, চাহিদা বা উদ্দেশ্যসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করে এবং এসব চাহিদা বা উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করার আগ্রহ ও বিশ্বাস সৃষ্টি করে এবং সম্ভাব্য সম্পদ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করে এবং এসব কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে সমষ্টিতে সমবায়িক ও সহযোগিতামূলক মনোভাব ও প্রথার বিকাশ ঘটায় এবং সম্প্রসারণ করে।

ডব্লিউ. এ. ফ্রিডল্যান্ডারের মতে, সমষ্টি সংগঠন এমন একটি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো ভৌগোলিক এলাকার সমাজকল্যাণমূলক প্রয়োজন ও সম্পদের মধ্যে ফলপ্রসূ সামঞ্জস্যবিধান করা হয়।

সূতরাং বলা যায় যে, সমষ্টি সংগঠন এমন একটি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সমষ্টির জনগণের বিভিন্ন কল্যাণমূলক চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করে সমষ্টির সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদা পূরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

### ৮.৮.২ সমষ্টি উন্নয়ন

সাধারণত অনুন্নত ও স্থবির জনসমষ্টির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে মূলত এ পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে এ পদ্ধতিটি শুধুমাত্র অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য প্রয়োগ করা হতো। বর্তমানে পদ্ধতিটি উন্নত দেশের অনুন্নত অঞ্চলসমূহের উন্নয়নেও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের মতে, সমষ্টি উন্নয়ন এমন এক ধরনের পদ্ধতি, যার দ্বারা সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধনের জন্য জনসাধারণের কার্যাবলীকে সরকারি কার্যাবলীর সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন জনসমষ্টিকে জাতীয় উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত করে তাদেরকে জাতীয় উন্নতিতে ভূমিকা রাখার জন্য সক্ষম করে তোলা হয়।

ভারত সরকারের India 1982 নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, সমষ্টি উন্নয়ন হচ্ছে গ্রামবাসী কর্তৃক পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত আত্মসাহায্যমূলক কর্মসূচি, যাতে সরকার কেবল কারিগরি নির্দেশনা ও আর্থিক সহায়তা দেন। এর উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মনির্ভরতার উন্নয়ন এবং জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। যেমন– সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমষ্টিগত চিন্তাচেতনা ও যৌথ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা।

সূতরাং বলা যায়, কোনো সমষ্টির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি-বেরসকারি, আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য, সমষ্টির স্থানীয় উদ্যোগ এবং সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রক্রিয়াই হলো সমষ্টি উন্নয়ন।

## সারসংক্ষেপ

সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা এবং সমষ্টির সার্বিক উন্নয়নের জন্য পেশাদার সমাজকর্মের যে তৃতীয় মৌলিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় সেটি হলো সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। সমষ্টি সংগঠন হচ্ছে সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি ও সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের বিভিন্ন চাহিদা ও সম্পদের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে সমষ্টি উন্নয়ন হলো, এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা সমষ্টির সার্বিক উন্নয়নের জন্য জনসাধারণের কার্যাবলীকে সরকারি কার্যাবলীর সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে জাতীয় উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত করে তাদেরকে জাতীয় উন্নতিতে ভূমিকা রাখার জন্য সক্ষম করে তোলা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমষ্টির চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়?

ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম

গ) সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন ঘ) সামাজিক কার্যক্রম

২। সমষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টির নিজস্ব উদ্যোগের সাথে সরকার যে ধরনের সাহায্য প্রদান করে–

i. আর্থিক সাহায্য

ii. কারিগরি নির্দেশনা

iii. বিশেষজ্ঞ প্রেরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৮.৯ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান (Elemetns of Community Organization and Community Development)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.৯.১ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৮.৯.১ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান

সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশ্লেষণ করলে এর পাঁচটি উপাদান পাওয়া যায়। যথা– ক) জনসমষ্টি, খ) জনসমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন, গ) প্রতিষ্ঠান, ঘ) পেশাদার প্রতিনিধি এবং ঙ) প্রক্রিয়া। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো :

**ক) সমষ্টি :** সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের মৌল উপাদান হলো জনসমষ্টি। একদল লোক যখন সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সাধারণ স্বার্থ রক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তক্রিয়ায় লিপ্ত হয় তখন ঐ দলকে বলা হয় জনসমষ্টি। জনসমষ্টির সুনির্দিষ্ট কিছু একক স্বার্থ, আদর্শ, মূল্যবোধ বিদ্যমান থাকে যা ঐ সমষ্টির সকল সদস্য যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করে। এ প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টি হয়। সমষ্টির মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো– সাধারণ স্বার্থ ও সাদৃশ্যপূর্ণ জীবনধারা, সামাজিক বন্ধন, আত্মীয়তা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি।

**খ) সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন :** সমষ্টির প্রয়োজন ও চাহিদাকে কেন্দ্র করে সমষ্টি সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন আবর্তিত হয়। সমষ্টির অভাব, অক্ষমতা ও ব্যর্থতা থেকেই তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন উদ্ভব হয়। সমষ্টির জনগণের অনুভূত চাহিদা ও প্রয়োজন মূলত সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন। তবে এই চাহিদা ও প্রয়োজন অবশ্যই সমষ্টির সকলের জন্য কল্যাণকর হতে হবে। সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন বহুমুখী ও বিচিত্র হয়ে থাকে। এ চাহিদা ও প্রয়োজন অনেক সময় সমষ্টির সদস্যদের ব্যক্তিগত ও দলীয় চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।

**গ) প্রতিষ্ঠান :** সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান হলো প্রতিষ্ঠান। সমষ্টির সমস্যার সমাধান, উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের হয়ে থাকে। সেবাকর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানগুলো একমুখী ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেবা প্রদান করে থাকে। তবে প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের গতিময়তার উপর। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ধরন, প্রকৃতি, কার্যাবলী, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে।

**ঘ) পেশাদার প্রতিনিধি :** পেশাদার সমাজকর্মী সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপাদান। সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নে পেশাদার প্রতিনিধি বা সমাজকর্মী সাধারণত সমষ্টি সংগঠক বা উন্নয়নকর্মী হিসেবে সমধিক পরিচিত। সেবা প্রতিষ্ঠান ও সমষ্টির চাহিদা ও সমস্যার প্রেক্ষিতে একজন সমাজকর্মী কখনো সমন্বয়কারী, কখনো সক্ষমকারী, কখনো উপদেষ্টা, কখনো সাহায্যকারী, কখনো প্রশিক্ষক আবার কখনো সংগঠকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। তবে একজন সমাজকর্মীর সেবাপ্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে তার যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর। একজন পেশাদার সমাজকর্মীর মধ্যে যে সকল বিষয়ে দক্ষতা থাকা দরকার তা হলো– সমষ্টির বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির সাথে ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপন, সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজনের গঠনমূলক অনুধ্যান ও বিশ্লেষণ, সমষ্টির সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও তার ব্যবহার, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ, সমষ্টির কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষমতা ইত্যাদি।

**ঙ) প্রক্রিয়া :** সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমাজকর্ম প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া বলতে সমষ্টির সমস্যার সমাধান বা উন্নয়নে ব্যবহৃত প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে। সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে যথাযথ অনুধ্যান বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে যথাযথ প্রয়োজন নিরূপণ করে বাস্তবমুখী সেবাদানের মাধ্যমে সমষ্টির উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এক্ষেত্রে সমষ্টির উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথাযথ কার্যকর কি না বা কতটুকু সফলতা পাওয়া গেল তা নিরূপণের জন্য মূল্যায়ন জরুরি। মূলত সমষ্টির চাহিদা সম্পর্কিত অনুধ্যান, তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা নির্ণয়, সমাধান পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এগুলোর সমন্বিত রূপ হলো সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

### সারসংক্ষেপ

একদল পেশাদার সমাজকর্মী দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় একটি নির্দিষ্ট সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিচালিত হয়। সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন মূলত পাঁচটি উপাদানের সমষ্টি। উপাদানগুলো হলো– ক) সমষ্টি, খ) সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন, গ) প্রতিষ্ঠান, ঘ) পেশাদার প্রতিনিধি এবং ঙ) প্রক্রিয়া।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান কয়টি?
ক) ৩টি খ) ৪টি
গ) ৫টি ঘ) ৬টি

২। সমষ্টি সমাজকর্মের মৌল উপাদান কোনটি?
ক) সমষ্টি খ) প্রতিষ্ঠান
গ) পেশাদার প্রতিনিধি ঘ) প্রক্রিয়া

৩। একজন পেশাদার সমাজকর্মীর মধ্যে সমষ্টি সম্পর্কিত যে সকল বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা দরকার–
i. বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির সাথে ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপন
ii. সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও তার যথাযথ ব্যবহার
iii. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৮.১০ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের নীতিমালা (Principles of Community Organization and Community Development)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.১০.১ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৮.১০.১ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান নীতিমালা

সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের সমন্বিত নীতিমালা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো :

**১. সমষ্টি স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি :** প্রতিটি সমষ্টি তাদের সম্পদ, সামর্থ্য, দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আদর্শ, মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের চাহিদা ও সমস্যাবলী ভিন্নতর হয়। এক্ষেত্রে সমষ্টির চাহিদাপূরণ ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমষ্টিকে স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে সমাধান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

**২. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি :** এই নীতির আওতায় সমষ্টির সমস্যার সমাধান ও চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সমষ্টির উপর কোনো রূপ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে নিজেদের সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমষ্টিকে সক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলা হয়।

**৩. অগ্রাধিকারভিত্তিক অনুভূত প্রয়োজন নীতি :** এ নীতির আলোকে সমষ্টির অনুভূত চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহকে শ্রেণিবিন্যাস করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজন পূরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। অর্থাৎ একাধিক সমস্যার মধ্যে সমষ্টির কল্যাণে সর্বপ্রথম জরুরি সমস্যার সমাধান করা হয়।

**৪. নমনীয় সাংগঠনিক কাঠামো নীতি :** সমষ্টির চাহিদা ও সমস্যা পরিবর্তনশীল । তাই সমষ্টির সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী সমাধান ব্যবস্থা প্রদানে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনশীল হতে হবে।

**৫. সমান সুযোগের নীতি :** এ নীতির আওতায় একদিকে সমষ্টির প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সমষ্টির প্রতিটি সদস্যের স্বার্থ সমানভাবে নিশ্চিত করা হয়। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সমষ্টি যেন সমান সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা হয়।

**৬. কর্মসূচির সমন্বয় সাধন নীতি :** এই নীতিটির আলোকে সমষ্টির চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টির সম্পদ, কর্মসূচি এবং সমষ্টির অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।

**৭. যোগাযোগ নীতি :** যোগাযোগ নীতি অনুযায়ী সমষ্টির মধ্যকার সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে যোগাযোগের দ্বিমুখী নীতি অনুসৃত হয়। অর্থাৎ সমাজকর্মীর পক্ষ থেকে দল ও প্রতিষ্ঠানের সাথে আবার দল ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সমাজকর্মীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

**৮. মর্যাদার স্বীকৃতিদান নীতি :** এ নীতির আওতায় সমাজকর্মী সমষ্টি ও সমষ্টির সকল সদস্যের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করে। এ ধরনের স্বীকৃতি সমষ্টি ও সমষ্টির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

**৯. সকলের অংশগ্রহণ নীতি :** সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো সমষ্টির সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়ায় সকলের সমান অংশগ্রহণ। এ নীতির আওতায় সমষ্টির অনুভূত চাহিদাপূরণ, সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা এবং সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নে সমষ্টির সকল সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

**১০. সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন নীতি :** এ নীতির আলোকে সমষ্টির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ সকল দিকের সুসম উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বরোপ করা হয়। অর্থাৎ সমষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সকল বিষয়ের সমান উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

**১১. সমাজকর্মীর পেশাগত দায়িত্ব সচেতনতার নীতি :** সমষ্টির ক্ষেত্রে সমাজকর্মী একাধারে একজন সংগঠক, সমন্বয়কারী, সক্ষমকারী, প্রশিক্ষক, পরামর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনে সচেতনতার সাথে কাজ করতে হয়।

**১২. সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতার নীতি :** এ নীতির আলোকে সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টির সদস্যের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দেয়া হয়। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কের ভিত্তিতে সমষ্টির সদস্যরা তাদের স্ব স্ব ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হয়, যা সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজন।

## সারসংক্ষেপ

সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা এবং সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের উদ্ভব হয়েছে। সমষ্টির জনগণের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ, তাদের মধ্যে স্বাবলম্বী মনোভাব গঠন ও অভ্যন্তরীণ সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে তাদের আত্মনির্ভরশীল জনগোষ্ঠীতে পরিণত করাই সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। সেগুলো হলো– ১) সমষ্টির স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি, ২) আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি, ৩) অগ্রাধিকার ভিত্তিক অনুভূত প্রয়োজন নীতি, ৪) নমনীয় সাংগঠনিক কাঠামো নীতি, ৫) সমান সুযোগের নীতি, ৬) কর্মসূচির সমন্বয় সাধন নীতি, ৭) যোগাযোগ নীতি, ৮) মর্যাদার স্বীকৃতিদান নীতি, ৯) সকলের সমান অংশগ্রহণ নীতি, ১০) সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন নীতি, ১১) সমাজকর্মীর পেশাগত দায়িত্ব সচেতনতার নীতি এবং ১২) সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতা নীতি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন নীতির আলোকে সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সমষ্টির প্রতিটি সদস্যের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হয়?

ক) মর্যাদার স্বীকৃতি দান নীতি
খ) সমান সুযোগের নীতি
গ) সমষ্টির স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি
ঘ) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতি

২। সমষ্টি সমাজকর্মের নীতি হলো–

i. অগ্রাধিকার ভিত্তিক অনুভূত প্রয়োজন নীতি
ii. কর্মসূচির সমন্বয় নীতি
iii. সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতার নীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৮.১১ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া (Process of Community Organization and Community Development)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.১১.১ সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১১.২ সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

## ৮.১১.১ সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া

সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। মারি জি. রসের মতে, সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়াসমূহ হলো– ১. শোষণমুখী প্রক্রিয়া, ২. সংস্কারমুখী প্রক্রিয়া, ৩. পরিকল্পনামুখী প্রক্রিয়া, ৪. উদ্ভাবনামূলক প্রক্রিয়া এবং ৫. চিকিৎসামুখী প্রক্রিয়া। সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়াসমূহ সংক্ষেপ বর্ণনা করা হলো :

**১. শোষণমুখী প্রক্রিয়া :** মূলত চরম পশ্চাদমুখী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এ ধরনের সমষ্টির অস্তিত্ব না থাকায় এ প্রক্রিয়ার অনুশীলন হয় না।

**২. সংস্কারমুখী প্রক্রিয়া :** নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য এ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ প্রচেষ্টা চালাতে পারে। এজন্য কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে বিধায় দ্রুত জনমত গঠন ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় এবং চাহিদা পূরণ বা সমস্যার দ্রুত ও সহজতর সমাধান সম্ভব হয়। এটি একটি জনপ্রিয় প্রক্রিয়া বিধায় সহজেই সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়। তবে এ প্রক্রিয়ায় বহুমুখী সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। সুসম উন্নয়নের পক্ষে এ প্রক্রিয়া তেমন কার্যকর নয় এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একক চিন্তার ফলে কার্যক্রমে গতিশীলতা বা নতুনত্ব পাওয়া যায় না।

**৩. পরিকল্পনামুখী প্রক্রিয়া :** এ প্রক্রিয়ায় দলীয়ভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং সমষ্টির বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। এক্ষেত্রে সকল কর্মসূচি সমানভাবে গুরুত্ব পায়। সকলের জন্য সমষ্টিগত ও বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির সম্পদ ও সামর্থ্য ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। সমষ্টির সার্বিক দিক বিবেচনা করে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং বাস্তবসম্মত উত্তম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে একই সাথে অনেকগুলো কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন সম্ভব হয়।

**৪. উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া :** এ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির সদস্যদেরকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক সময় সমষ্টিতে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে সমষ্টির সদস্যদের নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। সমষ্টির সম্পদ, সামর্থ্য ব্যবহার করে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

**৫. চিকিৎসামুখী প্রক্রিয়া :** অতি অগ্রবর্তী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি কার্যকর। থেরাপি বা চিকিৎসামূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ সমষ্টির সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। তবে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এ ধরনের জনসমষ্টির অস্তিত্ব না থাকায় এর ব্যবহার হয় না বললেই চলে।

সমষ্টি সংগঠনের উপরিউক্ত প্রক্রিয়াসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতগুলোা স্তর বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। যেমন:

**ক) তথ্য অনুসন্ধান :** সরাসরি জরিপ বা ঘটনা অনুধ্যানের মাধ্যমে সমষ্টির বিদ্যমান সমস্যা বা চাহিদা, সম্পদ ও সামর্থ্য সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান করা হয়।

**খ) বিশ্লেষণ বা সমস্যা নির্ণয় :** অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমষ্টির সমস্যার গতি-প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়।

**গ) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :** সমষ্টির সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে সমস্যা বা চাহিদার গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

**ঘ) মূল্যায়ন :** কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর কর্মসূচি স্বার্থকতা বিচার করার জন্য মূল্যায়ন করা হয়। মূলত পরিকল্পনা পর্যায় থেকে শুরু করে শেষ অবধি এ মূল্যায়ন কার্যক্রম চলতে থাকে।

## ৮.১১.২ সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া

সমষ্টির বৈশিষ্ট্য, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং সমষ্টির জনগণের অভ্যাস, রুচি, কার্যপ্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে সমষ্টি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহ বিচিত্র হয়। চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়। মারি জি. রসের মতে সমষ্টি উন্নয়নের প্রক্রিয়া তিনটি। যথা– ১. একক কার্যপ্রক্রিয়া ২. বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া এবং ৩. আন্তসম্পদ প্রক্রিয়া। নিচে এগুলো সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলো:

**১. একক কার্যপ্রক্রিয়া :** সমষ্টির উন্নয়নে একক কার্যপ্রক্রিয়ায় সমষ্টির বাইরে থেকে আগত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সমষ্টির সমস্যা নির্ণয় এবং তার সমাধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সদস্যদের মাঝে সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তোলা হয়। সমষ্টির জনগণ যাতে উন্নয়নের সকল সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করেন। সমষ্টি উন্নয়নের এ প্রক্রিয়ায় অতি দ্রুত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। কেননা এখানে বিশেষজ্ঞের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে। ফলে এ প্রক্রিয়ায় সময় কম লাগে, অর্থের সাশ্রয় হয় এবং কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে না। তবে এ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির একটি মাত্র সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বিধায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া যায় না। এটি সম্পূর্ণভাবে বিশেষজ্ঞের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় অনেক সময় বিশেষজ্ঞের দক্ষতার অভাবে এ প্রক্রিয়া সফল হয়না। সমষ্টির সদস্যগণ এ সম্পর্কে তেমন অবগত না থাকায় এ প্রক্রিয়ার ফলাফল বেশিদিন স্থায়ী হয় না। তবে সহজ ও দ্রুত উপায়ে সমষ্টির উন্নয়নে এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ।

**২. বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া :** এ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির জনগণের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে একাধিক বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত থাকার পাশাপাশি সমষ্টির জনগণের অন্তর্ভুক্তি থাকে। এ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো সমষ্টির জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে সমষ্টিকে উন্নত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা। এ প্রক্রিয়ায় জনগণের অন্তর্ভুক্তি থাকে বিধায় তারা সক্রিয় ভূমিকা পালনে আগ্রহী হয়। একই সঙ্গে একাধিক সমস্যার সমান্তরাল সমাধানের মাধ্যমে দ্রুত কার্যকর উন্নয়ন সম্ভব হয়। তবে এ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়াতে বাজেট ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে। একাধিক বিশেষজ্ঞ থাকায় মত পার্থক্য দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রক্রিয়াটি বহুমুখী হওয়ায় অনেক সময় সমস্যার সকল দিকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া সম্ভব হয় না। তবে প্রক্রিয়াটি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়নে অত্যন্ত কার্যকর।

**৩. আন্তসম্পদ প্রক্রিয়া :** আন্তসম্পদ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির সদস্যরা নিজেরা তাদের সমস্যাবলী চিহ্নিত করে সমস্যা মোকাবিলায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমষ্টির সম্পদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় সমষ্টির সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। সমষ্টির জনগণের যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। জনগণের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এবং সমষ্টির জনগণের মধ্যে স্বাবলম্বী মনোভাব জাগ্রত হয়। তবে এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের সরাসরি হস্তক্ষেপ না থাকায় কর্মসূচি পরিচালনায় ত্রুটি দেখা দিতে পারে। আবার সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় না হলে কার্যক্রমের গতি ঝিমিয়ে পড়তে পারে। তবে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টিতে এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকর। সমষ্টি উন্নয়নের এ প্রক্রিয়াসমূহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কতগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। যেমন:

**ক) সমষ্টি জরিপ :** সমষ্টির গঠন, চাহিদা, প্রয়োজন, সমস্যা, সম্পদ, সামর্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ কার্য চালানো হয়। এটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ।

**খ) সমস্যা নির্ণয় :** এ পর্যায়ে সমস্যা নির্ণয় করা হয়। জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমষ্টির সমস্যার স্বরূপ, কারণ, প্রকৃতি ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়।

**গ) পরিকল্পনা প্রণয়ন :** এ পর্যায়ে সমষ্টির সমস্যা নির্ণয়ের প্রেক্ষিতে সমষ্টির সম্পদ ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে যথাযথ কার্যকর ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

**ঘ) মূল্যায়ন :** প্রণীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপণের জন্য মূল্যায়ন করা হয়। কর্মসূচি প্রণয়নের শুরু থেকে শেষ অবধি এ মূল্যায়ন চলতে থাকে।

## সারসংক্ষেপ

প্রতিটি সমষ্টির গঠন, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং সমষ্টির জনগণের অভ্যাস, রুচি ও কর্মপ্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সমষ্টির প্রকৃতি অনুযায়ী চাহিদা, প্রয়োজন বা সমস্যা আলাদা ও বিচিত্রমুখী হয়। এই ভিন্ন ও বিচিত্রমুখী চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ এবং সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। সমষ্টি উন্নয়নের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াসমূহ হলো– ১) একক কার্যপ্রক্রিয়া, ২) বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া ও ৩) আন্তঃসম্পদ প্রক্রিয়া। অন্যদিকে সমষ্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে যেসব প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় সেগুলো হলো– ১) শোষণমুখী প্রক্রিয়া, ২) সংস্কারমূলক প্রক্রিয়া, ৩) পরিকল্পনামুখী প্রক্রিয়া, ৪) উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া ও ৫) চিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমষ্টি উন্নয়নের কোন প্রক্রিয়ায় বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এসে সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে?
ক) একক কার্যপ্রক্রিয়া খ) বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া
গ) আন্তঃসম্পদ প্রক্রিয়া ঘ) চিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া

২। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য সমষ্টি সংগঠনের কোন প্রক্রিয়া কার্যকর?
ক) শোষণমুখী প্রক্রিয়া খ) সংস্কারমুখী প্রক্রিয়া
গ) উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া ঘ) চিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া

৩। সমষ্টির সদস্যদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলার জন্য সমষ্টি সংগঠনে কোন প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়?
ক) শোষণমুখী প্রক্রিয়া খ) সংস্কারমুখী প্রক্রিয়া
গ) পরিকল্পনামুখী প্রক্রিয়া ঘ) উদ্ভাবনমুখী প্রক্রিয়া

## পাঠ-৮.১২ সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগক্ষেত্র (Fields of Community Organization and Community Development)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.১২.১ সমষ্টি সংগঠন প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
৮.১২.২ সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
৮.১২.৩ বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৮.১২.১ সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্র

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে সমষ্টি সংগঠন বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সমষ্টির কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়। তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের শহরাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে শহরাঞ্চলের সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করা হলো :

**১. সমষ্টির সমস্যা নির্ণয় :** বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ন্যায় শহরাঞ্চলেও নানাবিধ জটিল ও বহুমুখী সমস্যা বিদ্যমান। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট এ সমস্যাবলী চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সমষ্টি সংগঠন প্রয়োগ করা যেতে পারে। চিহ্নিত সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যাগুলোর কারণ, ধরন, প্রকৃতি ও প্রভাব নির্ণয় করা যেতে পারে।

**২. স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ :** শহরাঞ্চলে বিদ্যমান সমস্যাবলী নির্ণয়ের মাধ্যমে সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ছাড়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য অনুসন্ধানের ম্যাধমে স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিত করে তা যথাযথ ব্যবহারে সমষ্টি সংগঠন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**৩. সংস্থার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন :** শহর সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন অতীব জরুরি। শুধু তাই নয়, সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের সাথে স্থানীয় সমষ্টির কার্যক্রমও সমন্বয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

**৪. দ্বন্দ্ব দূরীকরণ :** সমষ্টির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধারে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে অনুদান গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব সংঘাত দূর করে প্রতিষ্ঠানের সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগ অতীব জরুরি।

**৫. জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ :** সমষ্টির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি আবশ্যক। এক্ষেত্রে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। দায়িত্ব-কর্তব্য সচেতন সদস্যরা তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়।

**৬. সম্পদের সদ্ব্যবহার :** সম্পদের সদ্ব্যবহার সমষ্টি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমষ্টির জনগোষ্ঠীর বিনোদনমূলক কাজের জন্য পার্ক, খেলার মাঠ, শিশুদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিসহ এলাকায় বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে সমষ্টির উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সমষ্টি সংগঠন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

### ৮.১২.২ সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগক্ষেত্র

পেশাদার সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি সমষ্টি উন্নয়ন সাধারণত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের সমষ্টির উন্নয়ন এবং উন্নত বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টির জনগণকে তাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানে সচেতন করে তোলা হয় যাতে তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে সকল ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় সেগুলো হলো :

**১. পল্লী উন্নয়ন :** বাংলাদেশের অধিকাংশই লোক গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। পল্লীর এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর। এই অনগ্রসরতা কাটাতে তাদের পর্যাপ্ত সম্পদ ও সামর্থ্য নেই। এক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সমবায়ভিত্তিক কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়।

**২. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুরাতন রাস্তাঘাটের সংস্কার, পুল ও কালভার্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

**৩. কার্যকর স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রবর্তন :** গ্রামীণ ও শহরের অনুন্নত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সমষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে এ জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে খাদ্য, পুষ্টি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টি, বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

**৪. আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি :** বাংলাদেশে শ্রমশক্তির বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় বেকারত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামালনির্ভর কুটিরশিল্প স্থাপন, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন, মৎস্য খামার, সবজি উৎপাদনসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী।

**৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো অধিকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণে উদ্যোগী করে তোলা যেতে পারে। এছাড়া পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে পরিবার ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে তুলতে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**৬. শিক্ষা সম্প্রসারণ :** বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ নিরক্ষর। এই জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে শিক্ষার প্রচলন একান্ত আবশ্যক। এজন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলনে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**৭. গৃহায়ন :** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম সমস্যা গৃহহীনতা। স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ প্রকল্প ও সমবায়ভিত্তিক গৃহনির্মাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতিতে সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের দুর্দশা লাঘব এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

**৮. স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ :** স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ নেতৃত্ব সৃষ্টি ও নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সমষ্টির সম্পদ ও সামর্থ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং সমষ্টির নিজস্ব চাহিদা পূরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তা যথাযথ পরিচালনা ও যুগোপযোগী কর্মসূচি প্রণয়নে সমষ্টি উন্নয়ন প্রয়োগ করা যায়।

**৯. সম্পদের সদ্ব্যবহার ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন :** গ্রামীণ জনসমষ্টির বস্তুগত ও অবস্তুগত অনেক সম্পদ থাকে যা অব্যবহৃত থেকে যায়। সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টির এ সম্পদসমূহ যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সমষ্টিকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। এছাড়া গ্রামীণ এলাকার জনগণের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে পারস্পরিক পরিচিতি ও বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে সমষ্টি উন্নয়ন প্রয়োগ করা যায়।

**১০. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ :** মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ও শিক্ষাদান, রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, মাতৃত্বকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা দূর করতে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

এছাড়াও সমষ্টির জনগণের বিভিন্ন চিত্তবিনোদনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা, সামাজিক কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূরীকরণে সচেতনতা সৃষ্টি, সমন্বিত উপায়ে সমস্যার সমাধান, প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতির সংস্কার সাধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ এবং সমস্যার কার্যকর সমাধানের মাধ্যমে সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখতে অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি পদ্ধতি। সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন আবার সমষ্টির অবস্থানের প্রেক্ষিতে প্রয়োগের দিক থেকে দু'ধরনের। যথা– সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্ব এবং উন্নত বিশ্বের অনুন্নত এলাকায় সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। আবার উন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের শহরাঞ্চলে সাধারনত সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগক্ষেত্র হলো– ১) পল্লী উন্নয়ন, ২) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ৩) কার্যকর স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রবর্তন, ৪) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ৫) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ৬) শিক্ষা সম্প্রসারণ, ৭) গৃহায়ন, ৮) স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ, ৯) স্বাবলম্বন, ১০) স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ ইত্যাদি। অন্যদিকে বাংলাদেশের শহর সমষ্টিতে সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগ ক্ষেত্রসমূহ হলো– ১) সমষ্টির সমস্যা নির্ণয়, ২) স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ, ৩) সংস্থার কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধান, ৪) সংস্থার দ্বন্দ্ব দূরীকরণ, ৫) জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ৬) সমষ্টির সম্পদের যথাযথ ব্যবহার।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সাধারণত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সমষ্টির সার্বিক উন্নয়নে সমাজকর্মের কোন মৌলিক পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়?
ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম
গ) সমষ্টি উন্নয়ন ঘ) সমষ্টি সংগঠন

২। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে সকল ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে–
i. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
ii. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি
iii. চিত্তবিনোদন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। শহর সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়?
ক) সমষ্টি উন্নয়ন খ) সমষ্টি সংগঠন
গ) সমাজকর্ম প্রশাসন ঘ) সামাজিক কার্যক্রম

## পাঠ-৮.১৩ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর আন্তসম্পর্ক (Interrelationship among the Basic Methods of Social Work)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৮.১৩.১ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যকার আন্তসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৮.১৩.১ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আন্তসম্পর্ক

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর পেশা। সমাজকর্ম হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে সাহায্য করার এবং এই লক্ষ্যার্জনে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া। সমাজকর্মের সাহায্য প্রক্রিয়ার মৌলিক পদ্ধতি তিনটি। যথা– ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি সমাজকর্ম । সঙ্গত কারণে এই তিনটি পদ্ধতির মৌল একক হলো ব্যক্তি। এজন্য সমাজকর্মের এই মৌলিক পদ্ধতি তিনটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ব্যক্তি কখনো একক, কখনো দলের সদস্য আবার কখনো সে সমষ্টির অংশীদার। একারণে ব্যক্তিকে সেবা দিতে গিয়ে দল ও সমষ্টিকে সেবা দিতে হয়। অন্যদিকে দলকে সেবা দিতে গিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে এবং সমষ্টিকে সেবা দিতে গিয়ে ব্যক্তি ও দলকে সেবাপ্রদান করতে হয়। অর্থাৎ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবসময়ই কেন্দ্রে অবস্থান করে ব্যক্তি। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যকার আন্তসম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

**প্রথমত :** ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয় ব্যক্তি সমাজকর্ম। কিন্তু ব্যক্তি যেহেতু দল ও সমষ্টির একক, সেহেতু ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগের সাথে সাথে ব্যক্তির সমস্যার যথাযথ সমাধানে দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্মের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

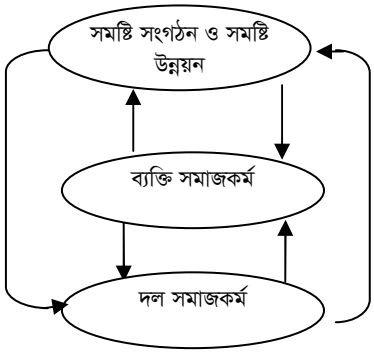
**দ্বিতীয়ত :** ব্যক্তি সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিকে তার সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে দল ও সমষ্টিতে ব্যক্তি যাতে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সেক্ষেত্রেও তাকে সক্ষম করে তোলা হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেবা ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়, দল ও সমষ্টিকেন্দ্রিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে তার যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা হয়।

**তৃতীয়ত :** দল সমাজকর্ম সাধারণত দলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দলের সদস্যদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা দল সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। কিন্তু দল গঠিত হয় কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে। আবার দল হলো সমষ্টির একক। সুতরাং দলের উদ্দেশ্য অর্জন করতে গিয়ে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে হয়। আবার দল যেহেতু সমষ্টির একক সেহেতু সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমষ্টির দিকটিও যথাযথ বিবেচনায় আনতে হবে।

**চতুর্থত :** সমষ্টি সমাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। সমষ্টি হলো কতিপয় দল ও অনেকগুলো ব্যক্তির সমষ্টি। সুতরাং সমষ্টির পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ সাধন দল ও ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।

**পঞ্চমত :** সমাজকর্মের কতগুলো সাধারণ নীতিমালা রয়েছে। যেমন– ব্যক্তি মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের জন্য সমান সুযোগ, স্বাতন্ত্রীকরণ, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সম্পদের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। সমাজকর্মের এই নীতিসমূহ সকল মৌলিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োগ করা হয়।

**ষষ্ঠত :** ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা যেমন একক কোনো কারণে সৃষ্টি হয় না, তেমনি সমস্যার সমাধানও একক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব নয়। ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য যেমন সমষ্টির সম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। তেমনি দলের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্যও প্রয়োজন হয়। সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন অনুশীলন ও প্রয়োগ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিচের চিত্রের সাহায্যে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হলো :




চিত্র : ৮.১৩.১.১ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির পারস্পরিক আন্তসম্পর্ক

ব্যক্তি হলো সমাজকর্ম অনুশীলনের মৌলিক একক। তাই সমষ্টি কেন্দ্রিক হোক কিংবা দলকেন্দ্রিক সমাজকর্ম অনুশীলন করতে যাওয়া হোক না কেন ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি হলো সমাজকর্ম অনুশীলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ব্যক্তি সমাজকর্ম অনুশীলন করতে গেলে ব্যক্তির সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিকাশ ও নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে দল ও সমষ্টির প্রয়োজন অপরিহার্য। আবার দল সমাজকর্ম অনুশীলন করতে গিয়ে দলীয় পরিবেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেবা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে প্রয়োজন দেখা দেয় সমষ্টির সম্পদেরও। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলো পরস্পর ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত।

## সারসংক্ষেপ

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিনির্ভর পেশা হলো সমাজকর্ম। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে সাহায্য করা এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুকূল পরিবেশ

সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো সমাজকর্ম। সমাজকর্মের কার্যক্রম ত্রিমাত্রিক। যথা– ব্যক্তিকেন্দ্রিক, দলকেন্দ্রিক ও সমষ্টিকেন্দ্রিক। সঙ্গত কারণে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি তিনটি যথা– ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। সমাজকর্মের এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যেকার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তি কখনো একক, কখনো দলের সদস্য আবার কখনো সমষ্টির অংশীদার। একারণে ব্যক্তিকে সেবা দিতে গিয়ে দল ও সমষ্টিকে সেবা দিতে হয়। অন্যদিকে দলকে সেবা দিতে গিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে এবং সমষ্টিকে সেবা দিতে গিয়ে ব্যক্তি ও দলকে সেবা দিতে হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদ্ধতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মৌল একক কোনটি?

ক) ব্যক্তি খ) দল
গ) সমষ্টি ঘ) প্রতিষ্ঠান

২। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বিদ্যমান–

i. ঘনিষ্ট সম্পর্ক
ii. প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক
iii. আন্তসম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। আমরা অনুভূতি কোন দলের বৈশিষ্ট্য?

ক) অন্তঃদল খ) বহিঃদল
গ) গৌণ দল ঘ) আনুষ্ঠানিক দল

২। দলের লক্ষ্য অর্জনে সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত দলীয় প্রক্রিয়াকে কী বলে?

ক) দলীয় প্রক্রিয়া খ) দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া
গ) সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঘ) সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া

৩। অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে কী বলা হয়?

ক) দল খ) সমষ্টি
গ) সংঘ ঘ) প্রতিষ্ঠান

৪। যে কোন সমস্যার মূলকেন্দ্র বিন্দুতে থাকে–

ক) ব্যক্তি খ) দল
গ) সমষ্টি ঘ) প্রতিষ্ঠান

৫। যে দলের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং পরিচিতি বিদ্যমান থাকে তাকে বলে–

ক) প্রাথমিক দল খ) গৌণ দল
গ) অন্তঃদল ঘ) বহিঃদল

৬। সমষ্টির সুষম উন্নয়নের জন্য সমষ্টি উন্নয়নের কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়?
ক) একক কার্যপ্রক্রিয়া খ) বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া
গ) আন্তসম্পদ প্রক্রিয়া ঘ) উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া

৭। সমষ্টি সংগঠন কোন ধরনের এলাকায় ব্যবহৃত হয়?
ক) উন্নত এলাকায় খ) অনুন্নত এলাকায়
গ) গ্রামীণ এলাকায় ঘ) বস্তি এলাকায়

৮। দলের পর্যায়ভুক্ত নয়–
i. উদ্দেশ্যহীন সমাবেশ
ii. সম্পর্কহীন সমাবেশ
iii. রাজনৈতিক সমাবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯। বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হলো–
i. সম্পদের অপর্যাপ্ততা
ii. পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব
iii. কারিগরি শিক্ষার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
মেহেদী গ্রামে বসবাস করে। সেখানকার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। সনাতন পদ্ধতিতে তারা চাষাবাদ করে। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কারসহ নানাবিধ সমস্যা তার এলাকার উন্নয়নের পথে বড় বাধা বলে সে মনে করে।

১০। মেহেদীর এলাকার উন্নয়নে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে?
ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম
গ) সমষ্টি উন্নয়ন ঘ) সমষ্টি সংগঠন

১১। মেহেদীর এলাকার বিদ্যমান সমস্যাবলী দূর করে সার্বিক উন্নয়ন সাধন করতে সমষ্টি উন্নয়নের কোন প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্যকরী?
ক) একক কার্যপ্রক্রিয়া খ) বহুমুখী কার্যপ্রক্রিয়া
গ) আন্তসম্পদ প্রক্রিয়া ঘ) উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া

### খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জাহিদ সাহেব তার দুই ছেলেমেয়ে, মা-বাবা, ছোটবোন ও বৃদ্ধা দাদীকে নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। তাদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান। তারা প্রত্যেকেই একে অপরের সুখে যেমন আনন্দিত হন তেমনি বিপদে আপদে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

ক) দল সমাজকর্মের উপাদান কয়টি? ১
খ) সমষ্টি উন্নয়ন ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। ২
গ) উদ্দীপকের জাহিদ সাহেবের পরিবার কোন ধরনের সামাজিক দল?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত "সামাজিক দল সবচেয়ে বেশি স্থায়ী"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। মিজান একজন পেশাদার সমাজকর্মী। মিজানকে তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এমন একটি এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেরণ করে যেখানে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, স্বাস্থ্যহীনতা, দারিদ্র্য নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। মিজান তার নিয়োজিত এলাকার সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন।

ক. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি ? ১
খ. উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝেন? ২
গ. উদ্দীপকে মিজানের নিযুক্ত এলাকার সমস্যার সমাধানে মিজান সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে থাকেন?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মিজানের প্রয়োগকৃত পদ্ধতির আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে– উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করুন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১। খ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ : ১। খ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১০ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১১ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১২ : ১। গ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৩ : ১। ক ২। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৮ : ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। ক ৫। ক ৬। গ ৭। ক ৮। ক ৯। ঘ ১০। গ ১১। গ

# সমাজকর্ম পদ্ধতি : সমাজকল্যাণ প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম ও সমাজকর্ম গবেষণা (Social Work Methods : Social Welfare Administration, Social Action and Social Work Research)

**ইউনিট ৯**

## ভূমিকা

আধুনিক জটিল সমাজব্যবস্থায় নানাবিধ মনো-সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাদার প্রক্রিয়া হলো সমাজকর্ম। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে সরাসরি প্রয়োগ করা হয় সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলো সরাসরি প্রয়োগ করা হলেও এগুলোর কার্যকারিতা ও সফল বাস্তবায়নে কতিপয় পদ্ধতি পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয়। এগুলো সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি তিনটি। যথা– সমাজকল্যাণ প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম এবং সমাজকর্ম গবেষণা।

শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থায় পুঁজি ও যন্ত্রের দ্রুত বিকাশের ফলে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এরই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের সমাজকল্যাণমূলক কার্যসম্পাদনের প্রেক্ষিতে উদ্ভব হয় সমাজকল্যাণ প্রশাসন। এটি সময়ের চাহিদা প্রেক্ষিতে সামাজিক নীতি ও আইনের আলোকে জনগণের কল্যাণ সাধনে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অন্যদিকে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত অবস্থার সুপরিকল্পিত সংশোধন বা পরিবর্তন, মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গৃহীত সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলো সামাজিক কার্যক্রম। আবার সমাজকর্ম পেশার সাহায্যদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় ও দূরীকরণ, সফলতা নির্ণয়, প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবনের আগ্রহ ও উৎসুকতা থেকে সমাজকর্ম গবেষণা উদ্ভব হয়েছে । সমাজকর্মের এই সহায়ক পদ্ধতিগুলো মৌলিক পদ্ধতিসমূহের কার্যকর প্রয়োগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনতে সহায়তা করে।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ-৯.১ : প্রশাসন ও সমাজকল্যাণ প্রশাসনের ধারণা
পাঠ-৯.২ : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদান
পাঠ-৯.৩ : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব
পাঠ-৯.৪ : সামাজিক কার্যক্রমের ধারণা
পাঠ-৯.৫ : সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান
পাঠ-৯.৬ : সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া
পাঠ-৯.৭ : সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব
পাঠ-৯.৮ : গবেষণা, সামাজিক গবেষণা ও সমাজকর্ম গবেষণার ধারণা
পাঠ-৯.৯ : সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ
পাঠ-৯.১০ : গবেষণা প্রস্তাবনা
পাঠ-৯.১১ : সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব
পাঠ-৯.১২ : সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

# পাঠ-৯.১ প্রশাসন ও সমাজকল্যাণ প্রশাসনের ধারণা (Concept of Administration and Social Welfare Administration)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.১.১ প্রশাসন ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৯.১.২ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।

## ৯.১.১ প্রশাসন

প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে আসছে। আর এই দলবদ্ধ জীবনে কোনো না কোনো নেতা বা গোত্রপ্রধানের নেতৃত্বে কতিপয় নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলতে হতো। সময়ের বিবর্তনে রাষ্ট্র ধারণা উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি ও আইনসমূহকে বাস্তব রুপদানের ক্ষেত্রে প্রশাসন ধারণাটি উদ্ভব হয়েছে। সাধারণভাবে প্রশাসন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা কোনো ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্যার্জনে কার্য সম্পাদনে নির্দেশনা দান, নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় করে থাকে।

এইচ. বি ট্রেকার বলেন, প্রশাসন হচ্ছে চিন্তা, পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের এমন এক সৃজনশীল প্রক্রিয়া, যা কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলীর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। এই প্রক্রিয়ায় জনগণের সাথে কাজ করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ, দায়িত্ব বন্টন, সাংগঠিক সম্পর্ক স্থাপন, কর্মসূচি পরিচালনা এবং সম্পাদিত কার্যাবলীর মূল্যায়ন করা হয়।

এল. ডি হোয়াইটের মতে, প্রশাসন হচ্ছে এমন একটি কলা, যার মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্জনের নিমিত্তে মানুষের কার্যাবলীকে নির্দেশনা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা হয়।

সূতরাং প্রশাসন হলো এমন একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে।

## ৯.১.২ সমাজকল্যাণ প্রশাসন

সমাজকল্যাণ প্রশাসন পেশাদার সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। সমাজকল্যাণ অনুশীলনের মৌলিক পদ্ধতিগুলো বাস্তবায়নে নিয়োজিত এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে সমাজকল্যাণ প্রশাসন হিসেবে নির্দেশ করা হয়ে থকে যা প্রত্যক্ষভাবে সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবামূলক কার্যাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার যথাযথ সমাধান, জনকল্যাণমূলক সেবার প্রবর্তন এবং সামাজিক নীতিকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নীতি ও মূল্যবোধের আলোকে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থা হলো সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

ডি. পাল চৌধুরী সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সংজ্ঞায় বলেন, সমাজকল্যাণ প্রশাসন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যেখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলী বাস্তবায়নের পেশাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। সামাজিক নীতি সমাজসেবায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবেও একে আখ্যায়িত করা যায়।

রাসেল এইচ. কার্জ এর মতে, সমাজকল্যাণ প্রশাসন সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরের এমন এক বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেবা, যার দ্বারা নীতি বা পদ্ধতি সংশোধিত হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, জনগণের সার্বিক কল্যাণের নিমিত্তে সামাজিক নীতির আলোকে গৃহীত কার্যাবলী ও দায়িত্বের সুসংহত বণ্টন এবং কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়াই হলো সমাজকর্ম প্রশাসন। আর এ কার্যসম্পাদনের সকল স্তরে যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল, নীতি ও মূল্যবোধ অনুশীলিত হয়।

## সারসংক্ষেপ

প্রশাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা নির্ধারণ এবং লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ প্রশাসন হলো সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করে তার মূল্যায়ন ও সংশোধন করার সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সমাজকল্যাণ প্রশাসন সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের কার্যকর সহায়তা করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?

ক) সামাজিক প্রশাসন খ) সমাজকল্যাণ প্রশাসন

গ) সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঘ) সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া

২। কোন উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে মানুষের কার্যাবলীকে প্রশাসন–

i. নির্দেশনা প্রদান করে ii. নিয়ন্ত্রণ করে iii. সমন্বয় সাধন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৯.২ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদান (Elements of Social Welfare Administration)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.২.১ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদানগুলো কী তা জানতে পারবেন এবং বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৯.২.১ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদান

সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করা। আর এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যম হলো সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদান। এসব উপাদান একে অপরের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হয়ে সমাজকল্যাণ প্রশাসনকে কার্যকর ও গতিশীল করে তোলে। নিম্নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো :

১) **কর্মসূচি :** সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম উপাদান হলো প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার লক্ষ্যে নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। মূলত এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রণীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের উপর প্রশাসনের সফলতা নির্ভর করে।

২) **অর্থ ও বাজেট :** যেকোনো প্রশাসনের জন্য অর্থ অপরিহার্য উপাদান। অর্থ ব্যতীত প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি অর্থের যথাযথ ব্যবহার ছাড়া প্রশাসন চালানোও অসম্ভব। বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে অর্থের যোগান, আয়-ব্যয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিধায় অর্থ ও বাজেট সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩) **কর্মী :** প্রশাসনের অপরিহার্য উপাদান হলো কর্মী। দক্ষ ও সক্রিয় কর্মীবাহিনী ছাড়া প্রশাসন ব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়ে। প্রশাসনে পেশাদার ও অপেশাদারকর্মী নিয়োজিত থাকেন। প্রশাসনের উদ্দেশ্য অর্জন, কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ প্রশাসন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ কর্মীবাহিনী একান্ত আবশ্যক।

৪) **কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো :** সুষ্ঠু ও কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এই সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় প্রশাসনের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সকল পর্যায়ে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব।

৫) **জনসংযোগ :** সমাজকর্মের সেবা কর্মসূচি জনগণের কল্যাণে নিবেদিত। এ কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছানোর জন্য জনসংযোগ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেবা কর্মসূচির যথাযথ ব্যবহার ও কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ, জনসমর্থন যাচাই, আগ্রহ সৃষ্টি ও সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে জনসংযোগ সমাজকল্যাণ প্রশাসনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে।

৬) **ভৌত অবকাঠামো :** ভৌত অবকাঠামো সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভৌত অবকাঠামো ব্যতীত প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও সম্পন্ন করতে পারেনা। ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে অফিস কক্ষ/ভবন, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, যোগাযোগের জন্য ফোন বা মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ, ফটোকপি মেশিন, টেলিভিশন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭) **পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া :** প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া রয়েছে। এসকল পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশাসনের কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়।

৮) **গবেষণা ও মূল্যায়ন :** সমাজকল্যাণ প্রশাসন প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো গবেষণা ও মূল্যায়ন। বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে সমস্যা নির্ণয়, সমস্যা সমাধানে নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন, এজেন্সির কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথাযথ তথ্য জানার জন্য গবেষণা ও মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ও কর্মীবাহিনীর দক্ষতা যাচাই এবং এজেন্সির কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপনের জন্য গবেষণা ও মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকল্যাণ একটি সক্ষমকারী পেশা। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সমাজকল্যাণ প্রশাসন সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহায়তায় এর উপাদানসমূহ সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদানগুলো হলো– ১) কর্মসূচি, ২) অর্থসংস্থান ও বাজেট, ৩) কর্মীবাহিনী, ৪) কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো, ৫) গণসংযোগ, ৬) পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, ৭) ভৌত কাঠামো এবং ৮) গবেষণা ও মূল্যায়ন। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদানসমূহ একে অপরের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হয়ে সমাজকর্ম প্রশাসনকে কার্যকর ও গতিশীল করে তুলতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কোন উপাদানটি কার্যকর?

ক) কর্মসূচি খ) কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো

গ) জনসংযোগ ঘ) গবেষণা ও মূল্যায়ন

২। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সম্পদ হলো–

i. বস্তুগত ও অবস্তুগত ii. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক iii. মানবীয় ও অমানবীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৯.৩ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব (Importance of Social Welfare Administration)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.৩.১ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৯.৩.১ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব

সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী পেশা যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানবিক সম্পর্ক এবং ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিকে সামাজিক ও সমষ্টিগত সন্তুষ্টি এবং স্বাধীনতা লাভে একক বা দলগতভাবে সহায়তা করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসন বহুমুখী কার্যসম্পাদন করে থাকে। সমাজকল্যাণ প্রশাসন সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে প্রতিষ্ঠানের সেবার মানোন্নয়নে সচেষ্ট হয়। এটি একটি সহযোগিতামূলক সেবাকর্ম যা বিভিন্ন কর্মসূচির

যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবকল্যাণে ব্রতী হয়। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কার্যক্রম সম্পকে এম. এন. হুসাইন ও এম. আলাউদ্দিন বলেন, এটি এমন একটি কার্যক্রম যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্নভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। এটি সহযোগিতামূলক ও পরিব্যাপক কাজ যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনকল্যাণে মাজকল্যাণ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে কতগুলো শিরোনামে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

**১. অনুকুল পরিবেশ তৈরি :** সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রশাসনের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রশাসনের অভ্যন্তরে জটিলতা সৃষ্টি হলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়। এজন্য প্রশাসন যোগাযোগ, সমন্বয়, তত্ত্বাবধায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে অনুকূল কর্মপরিবেশ তৈরি করে।

**২. এজেন্সির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ :** সমাজকল্যাণ প্রশাসন এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে প্রচলিত সেবাকার্যক্রম বিশ্লেষণ করে এজেন্সির জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

**৩. জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ :** সমাজকল্যাণ প্রশাসন লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পরস্পরের সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সকলের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সমষ্টির নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সচেষ্ট হয়।

**৪. সমন্বয় সাধন :** সমাজকল্যাণ প্রশাসন সর্বদা সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরে সচেষ্ট থাকে। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের প্রধান উপায় হলো পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসন এজেন্সির বিভিন্ন কার্যক্রম ও উপবিভাগ এবং সমষ্টিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে।

**৫. দ্বন্দ্ব নিরসন ও সামঞ্জস্য বিধান :** সমাজকল্যাণ প্রশাসন এজেন্সিতে কর্মরত কর্মীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। এজেন্সিতে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যা এজেন্সির লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এছাড়া অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতির সঙ্গে অনেকেই খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসন এজেন্সির নিয়মনীতি ও কার্যাবলীর সাথে কর্মীদের সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে থাকে।

**৬. নিয়ন্ত্রণ ও উদ্বুদ্ধকরণ :** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সর্বস্তরের কর্মীদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অনেক সময় নিয়ন্ত্রণের অভাবে কর্মীদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয়, ফলে সেবার মান ক্ষুন্ন হয় এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যর্থ হয়। এ কারণে প্রয়োজনে কর্মীদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরি হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় সমাজকল্যাণ প্রশাসন সহকর্মীদের মধ্যে বাস্তবজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এজেন্সির কার্যাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অনুপ্রাণিত করতে প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, অবসরভাতা, বিনোদনভাতা, বেতন বৃদ্ধিসহ নানাধরনের প্রেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

**৭. পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান :** সমাজকল্যাণ প্রশাসন জনগণের কল্যাণধর্মী সেবায় নিয়োজিত একটি কর্মপ্রক্রিয়া। সমাজকল্যাণ প্রশাসন তাই প্রয়োজনে জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। আবার অনেক সময় সমধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও কার্যক্রমের যথাযথ তত্ত্বাবধানে সমাজকর্ম প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছে কিনা, গৃহীত কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, কর্মীবাহিনী তাদের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কি না তা নিরূপন করা হয়।

**৮. বাজেট প্রণয়ন :** প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের সেবাদানের যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাই হলো বাজেট। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ প্রথমে আলাদা আলদা খসড়া বাজেট তৈরি করে। খসড়া বাজেটের আলোকে বাজেট কমিটি চূড়ান্ত বাজেট প্রণয়ন করে। মূলত বাজেটের আলোকেই প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের (সাধারণত এক বছর) জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে।

**৯. নথিপত্র সংরক্ষণ :** প্রতিষ্ঠানের গঠণতন্ত্র, আয়-ব্যয়ের হিসাব, বার্ষিক রিপোর্ট, কর্মীদের পরিচিতি, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিবরণীসহ বিভিন্ন নথিপত্র সংরক্ষণে সমাজকল্যাণ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ধরনের নথি সংরক্ষণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে ।

**১০. গবেষণা ও মূল্যায়ন :** প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কর্মসূচি লক্ষ্যদলের চাহিদার পূরণ ও সমাধান কতটা কার্যকর, কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে কি না; যদি সম্ভব না হয় তাহলে এর কারণ কী এসব বিষয় যাচাইয়ের জন্য সমাজকল্যাণ প্রশাসন গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো কর্মসূচি পুনরায় গ্রহণ হবে কি না ? কর্মসূচির পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হবে কি না তা মূল্যায়ন করা হয় ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকল্যাণ প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনে সচেষ্ট। সমাজকল্যাণ প্রশাসন বহুমুখী কার্য সম্পাদন করে থাকে। সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্নয়নে সামাজিক প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকল্যাণ প্রশাসন– ১) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি, ২) এজেন্সির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, ৩) জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, ৪) সমন্বয় সাধন, ৫) দ্বন্দ্ব নিরসন ও সামাঞ্জস্য বিধান, ৬) কর্মী নিয়ন্ত্রণ ও অনুপ্রাণিতকরণ, ৭) পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান, ৮) বাজেট প্রণয়ন, ৯) নথিপত্র সংরক্ষণ এবং ১০) গবেষণা ও মূল্যায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকল্যাণ প্রশাসন সামাজিক নীতিকে রূপান্তর করে–

ক) সমাজসেবায় খ) সামাজিক বীমায়

গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সামাজিক উন্নয়নে

২। সমাজকর্ম প্রশাসন-

i. বস্তুগত ও অবস্তুগত ii. পরিব্যাপক কাজ iii. সকলেই এতে অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৯.৪ সামাজিক কার্যক্রম (Social Action)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.৪.১ সামাজিক কার্যক্রম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ৯.৪.১ সামাজিক কার্যক্রমের ধারণা

সামাজিক কার্যক্রম সমাজকর্মের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি সহায়ক পদ্ধতি। সামাজিক কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত উপায়ে সমাজ পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। সমাজে যেসব প্রচলিত অপসংস্কৃতি, কুপ্রথা এবং অব্যবস্থা রয়েছে তা দূর করে একটি কাঙ্খিত বা বাঞ্ছিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শুধু অব্যবস্থা দূর করাই নয় কীভাবে সমাজকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করা যায় তার জন্য সামাজিক কার্যক্রম বিশেষভাবে পরিচালিত হয়। এ অর্থে সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এবং সমাজব্যবস্থাকে গতিশীল করার জন্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সাধারণভাবে সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত অনভিপ্রেত অবস্থাকে সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া হলো সামাজিক কার্যক্রম।

সমাজকর্ম অভিধানের ভাষায়, সামাজিক কার্যক্রম হলো সামাজিক সমস্যার সমাধান, অন্যায় বা অবিচার সংশোধন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

Arthur Dunhum এর মতে, "সামাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন অথবা অবাঞ্ছিত পরিবর্তনকে বাধা দেয়ার জন্য গৃহীত সম্মিলিত প্রচেষ্টাই হলো সামাজিক কার্যক্রম।"

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সামাজিক কার্যক্রম হলো একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত অবস্থার সুপরিকল্পিত পরিবর্তন সাধন করে জনগণের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক উন্নয়ন সাধনে প্রচেষ্টা চালানো হয়।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত উপায়ে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। সমাজে প্রচলিত যেসব কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং অবাঞ্ছিত অবস্থা রয়েছে তা দূর করে একটি কাঙ্খিত ও বাঞ্ছিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পরিচালিত যৌথ প্রচেষ্টাই হলো সামাজিক কার্যক্রম। মূলত সামাজিক কার্যক্রম হলো সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত এমন একটি দলীয় প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন, সমাজের প্রয়োজন পূরণ, সামাজিক আইন ও নীতি বাস্তবায়ন, সমাজসংস্কার এবং বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধিত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজে বিদ্যমান অনভিপ্রেত অবস্থাকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করার দলীয় প্রচেষ্টাকে কী বলা হয়?
ক) সামাজিক কার্যক্রম খ) সমাজসংস্কার
গ) সামাজিক প্রশাসন ঘ) সামাজিক আইন

২। সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো–
i. সামাজিক উন্নয়ন ii. সামাজিক আইন ও নীতি বাস্তবায়ন iii. সমাজ সংস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৯.৫ সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান (Elements of Social Action)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.৫.১ সামাজিক কার্যক্রমের উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৯.৫.১ সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান

সামাজিক কার্যক্রম একটি পরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত প্রক্রিয়া, যা কোনো সামাজিক বিষয়ের পরিবর্তন আনয়নে জনগণের সমর্থন অর্জনের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছায়। সামাজিক কার্যক্রমে লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া বহুবিধ উপাদানের সমষ্টি। নাখান ই. কোহেনের মতে, সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান পাঁচটি। যথা– ১) গবেষণা, ২) পরিকল্পনা, ৩) জনসমর্থন আদায়, ৪) ব্যাখ্যাকরণ ও ৫) বাস্তবায়ন। আবার স্যোশ্যাল ওয়ার্ক ইয়ার বুক : ১৯৫১ অনুযায়ী সামাজিক কার্যক্রমের উপাদানগুলো হলো– ১) গবেষণা, ২) সমস্যা সমাধান পরিকল্পনা, ৩) জনসমর্থন আদায়, ৪) সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপনা এবং ৫) কার্যকরকরণ। সার্বিকভাবে সামাজিক কার্যক্রমের উপাদানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১) **সমস্যা :** সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম উপাদান হলো সমস্যা। যে বিষয়কে কেন্দ্র করে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে সামাজিক কার্যক্রমের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন– যৌতুক প্রথা, বাল্যবিবাহ, ইভ টিজিং ইত্যাদি।

২) **সমাজকর্মী বা সামাজিক আন্দোলন কর্মী :** সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমাজকর্মী বা সামাজিক আন্দোলন কর্মী। সামাজিক কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা নেতৃত্বদানকারী এবং সচেতনতা সৃষ্টিকারী। সমাজকর্মীকে এজন্য সামাজিক আন্দোলন কর্মী বলা হয়। সমাজকর্মী ব্যতীত সামাজিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।

৩) **সামাজিক গবেষণা :** গবেষণা সামাজিক কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখন কোনো বিষয় বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তখন উক্ত বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে তথ্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য হতে সমস্যা বা নির্দিষ্ট বিষয়ের গভীরতা, ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় এবং সে অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

৪) **সমাধান পরিকল্পনা :** সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো সমাজ হতে অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত কুপ্রথা, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধন। এক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে যথাযথভাবে জেনে সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কারণ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ব্যতীত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না।

৫) **জনসমর্থন আদায় :** সামাজিক কার্যক্রম হলো একটি দলীয় প্রচেষ্টা। জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা পরিচালিত কর্ম প্রক্রিয়া হলো সামাজিক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে কর্মসূচির প্রতি জনগণের সমর্থন আদায় অপরিহার্য উপাদান। সমস্যা ও সমস্যার সমাধান ব্যবস্থার খুটিনাটি সকল দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে করে তাদের সমর্থন আদায় এবং কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬) **প্রস্তাব উপস্থাপন :** গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যা নির্দিষ্টকরণ, সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সমস্যা সংশ্লিষ্ট সমাধান কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থন আদায়ের সাথে সাথে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন করা সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রস্তাবনা মূলত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপস্থাপনাকেই বুঝায়। সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনাকারীগণ কর্তৃপক্ষের নিকট সুর্নিদিষ্ট প্রস্তাবনা উপস্থাপণ করে থাকেন।

৭) **কার্যকরকরণ :** সামাজিক কার্যক্রমের সর্বশেষ উপাদান হলো কার্যকরকরণ। সামাজিক কোনো বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনসমর্থন আদায় এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপণার পরও যদি সেগুলো কার্যকর করা না হয় তাহলে কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। এজন্য অবশ্যই এগুলো যথাযথভাবে কার্যকর বা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হয়। সামাজিক কার্যক্রম কার্যকরকরণের দুটি উপায় রয়েছে। যথা– সামাজিক আইন ও সামাজিক নীতি প্রণয়ন।

## সারসংক্ষেপ

সামাজিক কার্যক্রম একটি সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়া যা সমাজ হতে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত অবস্থা দূর করে সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন ও কাঙ্খিত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রমের কতগুলো সুনির্দিষ্ট উপাদান পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। সামাজিক কার্যক্রমের এই উপাদানগুলো হলো– ১) সুনির্দিষ্ট বিষয় বা সমস্যা, ২) সমাজকর্মী বা সামাজিক আন্দোলন কর্মী, ৩) সামাজিক গবেষণা, ৪) সমাধান পরিকল্পনা, ৫) জনসমর্থন আদায়, ৬) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও ৭) কার্যকরকরণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপায় কোনটি?

ক) সমাজ সংস্কার খ) সামাজিক আইন

গ) সামাজিক উন্নয়ন ঘ) সামাজিক পরিকল্পনা

২। সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান হলো–

i. সামাজিক গবেষণা ii. জনসমর্থন আদায় iii. সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৯.৬ সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া (Process of Social Action)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.৬.১ সামাজিক কার্যক্রমের প্রক্রিয়াগুলো কী জানতে পারবেন এবং সেগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

## ৯.৬.১ সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া

সামাজিক কার্যক্রম একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া। এ প্রাক্রিয়াটি ধারাবাহিক ও সুপরিকল্পিতভাবে সামাজিক অনভিপ্রেত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে দলীয়ভাবে প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রম সুর্নির্দিষ্ট ও পর্যায়ক্রমিক কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। আরমান্ডো টি. মরেলস ও ব্রাডফোর্ড ডব্লিউ. শেফর সামাজিক কার্যক্রমের ৯টি প্রক্রিয়া উল্লেখ করেছেন। যথা– ১) গবেষণা, ২) শিক্ষা, ৩) সমন্বয় সাধন, ৪) সংগঠন, ৫) মধ্যস্থতা, ৬) সমঝোতা, ৭) মৃদু শক্তি প্রয়োগ, ৮) সামাজিক আইন ভঙ্গ এবং ৯. যৌথ কার্যক্রম। ভারতের সর্বদায়া আন্দোলনের কর্মীরা সামাজিক কার্যক্রমের যে সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকেন তা হলো– ১) প্রচার, ২) পরিচিতি, ৩) অধ্যয়ন বা অনুধ্যন, ৪) সভা বা সমিতি, ৫) সেবা, ৬) প্রতিকার, ৭) গঠনমূলক কাজ বা সমষ্টি সেবা এবং ৮) পরিবর্তিত পরিস্থিতি উপযোগী পরিবেশ গঠন। সার্বিকভাবে সামাজিক কার্যক্রমের প্রক্রিয়াসমূহ নিচে আলোচান করা হলো :

১) **অনুভূত প্রয়োজন বা সমস্যা চিহ্নিতকরণ :** সামাজিক কার্যক্রম সফল করতে হলে প্রথমেই নির্দিষ্ট বিষয় বা সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করতে হয়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বহুমুখী ও পরস্পর নির্ভরশীল সমস্যা বিরাজমান। এ ধরনের সমস্যার মধ্যে থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বা প্রাধান্য বিস্তারকারী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান ব্যবস্থা গ্রহণ করে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। সমস্যা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কিত জনগণের মতামত, যথাযথ তথ্য সংগ্রহ, শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ শ্রেণির মতামত গ্রহণ, সরকারি-বেসরকারি রেকর্ড পর্যালোচনা এবং গণমাধ্যমে সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রভৃতি বিবেচনায় আনতে হয়।

২) **গবেষণা :** সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যা চিহ্নিতকরণের পর সমস্যা সম্পর্কিত যথাযথ ধারণা লাভের জন্য তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যার প্রকৃতি, ধরন, কারণ এবং প্রভাব নির্ণয়ের মাধমে সমাধান পরিকল্পনার নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

৩) **সচেতনতা সৃষ্টি :** সমস্যার প্রকৃতি, ধরন, কারণ এবং প্রভাব নির্ণয়ের পর সমস্যার ব্যাপকতা ও প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে সচেতনতা সৃষ্টি সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম প্রক্রিয়া। জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে সভা-সমাবেশ, সেমিনার, চিত্রপ্রদর্শনী, প্রচারপত্র বিলি, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪) **সমাধান পরিকল্পনা :** সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাজ হতে দূর করতে যথাযত সমাধান ব্যবস্থা গ্রহণ সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, দল, সমষ্টি ও প্রতিষ্ঠানের মনোভাব ও চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৫) **সংশ্লিষ্ট দল ও গোষ্ঠীর সমর্থন আদায় :** সমস্যার ব্যাপকতা, প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সরবরাহ করে সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ ও তার যথাযথ কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর সমর্থন আদায় এবং সমস্যা মোকাবিলায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ পদক্ষেপের ফলে সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হয়। এছাড়া দল ও সমষ্টিতে অবস্থানরত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করে কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকেন।

৬) **কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন :** কোনো বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে জনমত আদায়ের পর জনগণের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জনসমর্থিত বিষয়াবলী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষ বলতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বুঝানো

হয়ে থাকে। সামাজিক কার্যক্রম তখনই সফল হবে যখন যথাযথ কর্তৃপক্ষ উপস্থাপিত বিষয়টি যথার্থ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৭) **কার্যক্রম পরিচালনা :** কর্তৃপক্ষের নিকট জনসমর্থিত প্রস্তাবনা উপস্থাপনার পর তা অনুমোদনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ পর্যায়ে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমবেত প্রচেষ্টা চালানো হয় যাতে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। সমবেত প্রচেষ্টার ফলে অনেক সময় গণআন্দোলন বা গণবিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, যুবসমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের যথাযথ ইতিবাচক ভূমিকা এ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় যথার্থ সহায়তা করে থাকে।

৮) **বাস্তবায়ন :** যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রস্তাবনা গৃহীত ও অনুমোদিত হওয়ার পর তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে বিষয়টি বাস্তবায়নে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা হয়।

৯) **মূল্যায়ন :** সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পর্যায় হলো মূল্যায়ন। এ পর্যায়ে কার্যক্রমের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কতটা কার্যকর হলো তা মূল্যায়ন করা হয়। কার্যক্রমের এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সমস্যা চিহ্নিতকরণ পর্যায় থেকে শুরু হয়ে বাস্তবায়ন পর্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলমান।

## সারসংক্ষেপ

সামাজিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত দলীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজে বিরাজমান ক্ষতিকর ও অনভিপ্রেত প্রথা দূরীকরণ, বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন, প্রশাসনকে প্রভাবিত করে আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও জনসমষ্টির সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। সামাজিক কার্যক্রমে অনুসৃত প্রক্রিয়াসমূহ হলো– ১) সমস্যা চিহ্নিতকরণ, ২) সামাজিক গবেষণা, ৩) জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, ৪) সমাধান পরিকল্পনা, ৫) জনসমর্থন আদায়, ৬) নির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন, ৭) কার্যক্রম পরিচালনা, ৮) বাস্তবায়ন ও ৯) মূল্যায়ন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মরেলস ও শেফরের মতে সামাজিক কার্যক্রমের প্রক্রিয়া কয়টি?

ক) ৩ টি খ) ৫টি
গ) ৭টি ঘ) ৯টি

২। সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার কোন পর্যায়ে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে?

ক) সচেতনতা সৃষ্টি খ) জনসমর্থন আদায়
গ) কার্যক্রম পরিচালনা ঘ) বাস্তবায়ন

৩। সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ হলো–

i. প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ
ii. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা
iii. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রধান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৯.৭ সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব (Importance of Social Action)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.৭.১ সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

## ৯.৭.১ সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব

সামাজিক কার্যক্রম এমন একটি সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন কুপ্রথা, কুসংস্কার, অনাচার, অসমতা, বৈষম্য, আর্থ-মনো-সামাজিক বঞ্চনাসহ বিভিন্ন অবাঞ্ছিত অবস্থা যা জনসমষ্টির উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে; তার অবসান ঘটিয়ে স্বাভাবিক সামাজিক উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে জনকল্যাণমুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তি, দল, সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

**১. সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ :** বাংলাদেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, জনসংখ্যাস্ফীতি, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, সুচিকিৎসার অভাব, দূর্নীতি, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ ও সন্ত্রাস, কিশোর অপরাধ, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, ইভ টিজিং, জঙ্গিবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামীসহ নানা সমস্যা বিরাজমান যা সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ সকল সমস্যাবলীর বিরুদ্ধে জনমত গঠন, সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

**২. কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণ :** সুশিক্ষার অভাবে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাঝে আজও পশ্চাৎমুখী মনোভাব, কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদী চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। এ সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার, কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সকল কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর করে সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সামাজিক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

**৩. অধিকার প্রতিষ্ঠা :** সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম সমাজে বসবাসরত মানুষকে, বিশেষ করে বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। যথোপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, সেমিনার, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নাটক ও বিজ্ঞাপন গণমাধ্যমে জনগণকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে সামাজিক কার্যক্রম। ফলে জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য এবং কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে জনগণ সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ।

**৪. আইন ও নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :** সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটেই সামাজিক কার্যক্রমের উদ্ভব হয়েছে। সামাজিক সমস্যা সমাধানে অনেক সময় প্রয়োজনীয় নীতি ও আইন প্রণয়ন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চিহ্নিত বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে জনমত গঠন করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে। প্রণীত আইন ও নীতির যথাযথ বাস্তবায়নও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রণীত আইন ও নীতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি জনকল্যাণের লক্ষ্যে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক নীতি ও আইন বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সামাজিক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

**৫. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ :** দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, অপহরণ, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও নিপীড়ন, তাদের অনৈতিক বিভিন্ন কাজে ব্যবহারসহ নানা কারণে তারা তাদের স্বাভাবিক সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারেনা। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টি, জনমত গঠন ও নারী অধিকার আদায়ে নারীদের মধ্যে সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ ও তাদের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

**৬. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন :** আধুনিক, জীবনমুখী ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রচলিত পশ্চাদমুখী ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণকে স্বাবলম্বী ও আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে সচেতন করে তুলতে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া বর্তমান সমাজে খাদ্যে ভেজাল, বিষক্রিয়া এবং রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন। ব্যবসায়ী ও ভোক্তা শ্রেণির মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে নিবৃত্ত করা এবং এ সমস্ত খাবার পরিহারে জনগণকে সচেতন করতে সামাজিক কার্যক্রম যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে।

**৭. দুর্নীতি দূরীকরণ :** বাংলাদেশের সমাজকাঠামোয় দুর্নীতি একটি মারাত্মক ব্যধি। দুর্নীতি দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধবকতা সৃষ্টি করছে। দুর্নীতির এ ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় কঠোর আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

**৮. দারিদ্র্য বিমোচন :** দারিদ্র্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যার মূলে রয়েছে জনসংখ্যাধিক্য জনিত বেকারত্ব ও নারীর নির্ভরশীলতা। এছাড়া আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে উৎপাদনশীল মনোভাবের খুবই অভাব রয়েছে। দারিদ্র্যের যথাযথ কারণ চিহ্নিত করে তা কার্যকরভাবে মোকাবিলার কৌশল উদ্ভাবনে সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**৯. মাদকাসক্তি দূরীকরণ ও মাদকের ব্যবহার রোধ :** বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্রুত ক্রমবর্ধমান ভয়াবহ সমস্যা হলো মাদকাসক্তি। মাদকের সহজলভ্যতা এবং বিভিন্নরকম মনো-সামাজিক কারণে শিশু থেকে শুরু করে কম বেশি সব বয়সী, পেশা ও শ্রেণির মানুষ মাদকে আসক্ত। বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় যুবসমাজ মাদকের ছোবলে আজ কর্মবিমুখ। ফলে সমাজে অনৈতিকতা, খুন, অপরাধসহ নানা সমাজবিরোধী কাজ বেড়ে গেছে। এ অবস্থার বিরুদ্ধে সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তুলে জনগণকে সচেতন করতে এবং প্রচলিত মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করতে সামাজিক কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

সামাজিক কার্যক্রম একটি সম্মিলিত কর্মপ্রক্রিয়া। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন নেতিবাচক অবস্থা যা জনগণের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত করে। এমন অবস্থার অবসান ঘাটিয়ে সমাজের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখাই সামাজিক কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, জনসংখ্যাস্ফীতি, ভিক্ষাবৃত্তি, নারী নির্যাতন, যৌতুকপ্রথা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ, নারীর প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়ন, দুর্নীতি, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, খাদ্যে ভেজাল, সুচিকিৎসার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, জঙ্গিবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামীসহ নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ধারাকে বাধাগ্রস্ত করছে। সমাজ থেকে এসকল সমস্যা দূর করে জনসাধারণের স্বাভাবিক সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার এবং সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা অপরিসীম।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কিসের অভাবে মানুষের মধ্যে কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদী চিন্তা-চেতনা লক্ষ্য করা যায়?
ক) শিক্ষা খ) চিকিৎসা
গ) সম্পদ ঘ) চিত্তবিনোদন

২। অবুঝ শিশু থেকে শুরু করে কম বেশি সব বয়সী মানুষ কিসের সাথে জড়িত?
ক) মাদকাসক্তি খ) চাঁদাবাজি
গ) অপরাধ ঘ) দুর্নীতি

৩। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ–
i. জনসংখ্যাস্ফীতি
ii. বেকারত্ব
iii. নারীর নির্ভরশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে–
i. প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করানো যায়
ii. প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করানো যায়
iii. প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করানো যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৯.৮ গবেষণা, সামাজিক গবেষণা ও সমাজকর্ম গবেষণা (Research, Social Research and Social Work Research)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.৮.১ গবেষণা কী জানতে পারবেন।
৯.৮.২ সামাজিক গবেষণার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
৯.৮.৩ সমাজকর্ম গবেষণা ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৯.৮.১ গবেষণা কী?

গবেষণা হলো একটি পদ্ধতিগত সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ তথ্য আহরণ করা যায় এবং সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কোনো ঘটনা বা সমস্যার প্রকৃতি, কারণ, প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কার্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। গবেষণার ইংরেজি প্রতিশব্দ Research যার শাব্দিক অর্থ হলো পুনরায় (Re) অনুসন্ধান (Search)। সমাজকর্ম অভিধান অনুযায়ী গবেষণা হলো একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব স্যোশ্যাল সাইন্সেস (১৯৩০) এর ভাষ্যমতে, গবেষণা হলো জ্ঞান সৃষ্টি, সংশোধন বা যাচাইপূর্বক সাধারণীকরণের উদ্দেশ্যে বস্তু, প্রত্যয় বা প্রতীক নিয়ে কাজ করা, যাতে সেই জ্ঞান কোনো তত্ত্ব সৃষ্টি বা কোনো কৌশল অনুসন্ধানে সহায়তা করতে পারে।

খুরশীদ আলম তাঁর *'সমাজ গবেষণা পদ্ধতি'* (২০০৩) গ্রন্থে বলেন, গবেষণার কাজ হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সত্যকে অুসন্ধান করা। অন্যকথায়, গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্ক জানা– ক) পুরাতন তথ্য দিয়ে নতুন তথ্য

সামান্যকীরণ করা; খ) নতুন তথ্য দিয়ে পুরাতন সত্যকে জানা; গ) পুরাতন তথ্য দিয়ে নিত্য নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; ঘ) সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্ব বা ধারণা সৃষ্টি করা বা নতুন কোনো ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করা; এবং ঙ) গবেষণাধীন বিষয়ে কোনো বৈপরীত্য থাকলে তা দূর করা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, গবেষণা মূলত জ্ঞনার্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ, সার্বিক ও যথাযথ সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব।

## ৯.৮.২ সামাজিক গবেষণা

সামাজিক গবেষণা সামাজিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের সঠিক চিত্র তুলে ধরে সামাজিক গবেষণা। সমস্যার কারণ, সমস্যার বিশ্লেষণ, সমাধান ব্যবস্থা এমনকি সমস্যা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব জানার ক্ষেত্রেও সামাজিক গবেষণা সহায়তা করে। সাধারণভাবে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের তত্ত্ব গঠন, কোনো ঘটনা বা বিষয় এবং সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি উদঘাটনের জন্য যেসব গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয় তাই হলো সামাজিক গবেষণা।

সামাজিক গবেষণার সংজ্ঞায় কেনেথ ডি. বেইলি বলেন, "সামাজিক গবেষণা হচ্ছে তথ্য আহরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়াস যা সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আমাদেরকে সহায়তা করে এবং সমাজ সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞাত হতে সক্ষম করে তোলে।"

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল রিসার্চ (ভলিউম-১,১৯৯৭) এর ভাষ্য অনুযায়ী, সামাজিক গবেষণা সামাজিক প্রপঞ্চ নিয়ে অনুসন্ধান করে এটা সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের আচার-আচরণ, তাদের অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাপন প্রণালী ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিক জানার চেষ্টা করে।

পি. ভি ইয়ং মতে, "সামাজিক গবেষণাকে একটি বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে; যৌক্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যার লক্ষ্য হলো– ক) নতুন তথ্য উদঘাটন বা পুরাতন তথ্য যাচাই করা; খ) উপযুক্ত তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসরণে এদের পারস্পরিক অনুক্রম, আন্তসম্পর্ক এবং কার্যকরণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা; গ) নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ মানব আচরণ অধ্যয়নের সুবিধার্থে নতুন বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার, প্রত্যয় ও তত্ত্ব উন্নয়ন করা।"

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিক গবেষণা এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও যুক্তিসঙ্গতভাবে সমাজের নতুন কোনো তথ্য উদঘাটন, অতীত বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ বা যাচাই এবং এগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক আন্তসম্পর্ক ও কার্যকরণ সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের আচরণের সংশ্লিষ্টতা নিরূপণ করা হয়।

## ৯.৮.৩ সমাজকর্ম গবেষণা

সমাজকর্ম গবেষণা নানাবিধ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও সমাধানের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক পদ্ধতি। সাধারণভাবে বলা যায়, সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার স্বরুপ, প্রকৃতি, কারণ নির্ণয় এবং সমাধানের জন্য সেবার মাত্রা নির্ধারণ, প্রদত্ত সেবার যথার্থতা মূল্যায়ন এমনকি সমাজকর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের কার্যকারিতা পরীক্ষা ও যাচাইয়ের লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা।

ওয়াল্টার এ. ফ্রিডল্যান্ডার সমাজকর্ম গবেষণার সংজ্ঞায় বলেন, সমাজকর্ম গবেষণা হচ্ছে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা, প্রত্যয় এবং তত্ত্বের যাচাই, সাধারণীকরণ এবং প্রসারের লক্ষ্যে সমাজকর্ম সংগঠন, কার্যক্রম এবং পদ্ধতির যথার্থতা নির্ণয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক ও পর্যালোচনামূলক অনুসন্ধান।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া (ভলিউম-৩.১৯৮৭) এর ভাষ্যানুযায়ী, "সমাজকর্ম গবেষণা হচ্ছে জ্ঞান এবং বিকল্প অনুশীলিত জ্ঞান সমৃদ্ধকরণে ব্যবহৃত বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যা পেশাগত সমাজকর্মে সরাসরি প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করে এবং যা সমাজকর্ম পদ্ধতিসমূহকে অনুশীলনের ক্ষেত্রে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।"

আরনেস্ট গ্রিনউড এর মতে, "সমাজকর্ম গবেষণা হচ্ছে সমাজকল্যাণক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রশ্নের (সমস্যা) এমন এক সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকর্মের সমস্যাবলীর উত্তর (সমাধান) খুঁজে বের করা এবং সমাজকর্মের জ্ঞান ও ধারণাসমূহের সম্প্রসারণ ও সাধারণীকরণ করা।"

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজকর্ম গবেষণা হলো সমাজকর্মে ব্যবহৃত জ্ঞান, কৌশল ও পদ্ধতিসমূহের ধারণা সাধারণীকরণের লক্ষ্যে এদের যথার্থতা ও কার্যকারিতা নির্ণয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যা সমাজের ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকেন্দ্রিক সমস্যাবলীর কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমাধান ব্যবস্থায় যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি পেশাগত সাহায্যদান প্রক্রিয়া। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমস্যার যথাযথ সমাধান প্রদান করা সমাজকর্মের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির মাঝে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করে তার স্বরূপ, প্রকৃতি, ধরন ও কারণ নির্ণয়ের মাধ্যমে সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতির উদ্ভাবন, যথাযথ প্রয়োগ এবং প্রয়োগকৃত পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় তাই হলো সমাজকর্ম গবেষণা। সমাজকর্ম গবেষণা সামাজিক গবেষণার রূপান্তরিত রূপ। অন্যদিকে সমাজের কোনো ঘটনা, বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্যের মাধ্যমে নতুন কোনো তত্ত্ব গঠন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো সামাজিক গবেষণা, যা মূলত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিন্নরূপ। আবার গবেষণা হলো একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?
ক) গবেষণা খ) জরিপ
গ) আদমশুমারী ঘ) সমাজকর্ম

২। সামাজিক গবেষণা কাজ করে–
ক) অর্থনৈতিক পাপঞ্চ নিয়ে খ) সামাজিক প্রপঞ্চ নিয়ে
গ) রাজনৈতিক প্রপঞ্চ নিয়ে ঘ) সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ নিয়ে

৩। সমাজকর্ম গবেষণা–
i. সমাজকর্ম পেশার জন্য নতুন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে
ii. সমাজকর্মে প্রয়োগকৃত পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা যাচাই করে
iii. সমাজকর্মে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহকে আরও সমৃদ্ধ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৯.৯ সমাজকর্ম গবেষণার ধাপসমূহ (Steps of Social Work Research)

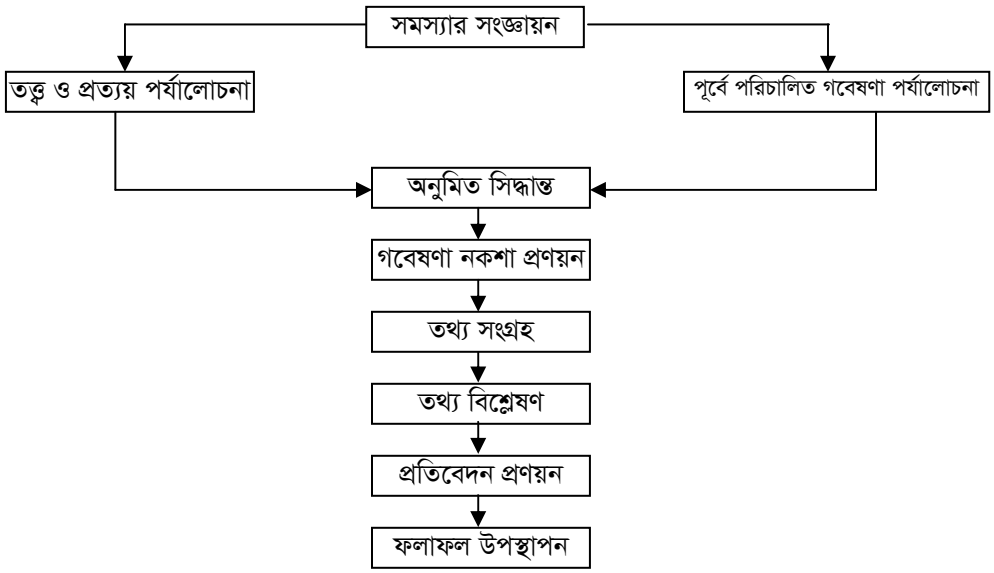
## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.৯.১ সমাজকর্ম গবেষণার ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

## ৯.৯.১ সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ

সমাজকর্ম গবেষণা মূলত সমস্যার সমাধান কর্মসূচি প্রণয়ন বা তার যথাযর্থ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতগুলো ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করে সামগ্রিক গবেষণা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। সি. আর কোথারি সমাজকর্ম গবেষণার ধাপসমূহ নিম্নোক্তভাবে দেখিয়েছেন :




চিত্র : ৯.১.১.১ সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ

সার্বিকভাবে সমাজকর্ম গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব ধাপ অতিক্রম করতে হয় তা আলোচনা করা হলো :

**১. গবেষণার সমস্যা বা বিষয় নির্বাচন :** সমাজকর্ম গবেষণার প্রথম ধাপে সমাজকর্মী সুনির্দিষ্ট কোনো গবেষণা সমস্যা বা গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট বিষয় নির্বাচন করে থাকেন। সাধারণত সমস্যা হলো সমাজের এমন অবাঞ্ছিত অবস্থা যা সমাজের অধিকাংশ লোকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। কিন্তু গবেষণা সমস্যা অন্য অর্থ পরিগ্রহ করে। গবেষক কোন সামাজিক সমস্যা নিয়ে কোন বিষয়ের প্রতি জনগণের মনোভাব জানার জন্য বা কোন পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। যে বিষয়ের ওপর গবেষণা পরিচালিত হয় তাকেই গবেষণা সমস্যা বলা হয় ।

**২. প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা :** গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনা অপরিহার্য বিষয়। সমস্যা বা বিষয় নির্দিষ্ট করার পর উক্ত বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন জরুরি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, পত্রপত্রিকা পাঠ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া গবেষণাধীন বিষয়ে পূর্বে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকলে উক্ত গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণা বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা পাওয়া যায়।

**৩. উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ :** প্রত্যেকটি গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। উদ্দেশ্য নির্ধারণের ম্যাধমে গবেষণা কোন পথে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করা হয়। গবেষণায় একটি সাধারণ বা মূল উদ্দেশ্য থাকে এবং একাধিক বিশেষ বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে।

**৪. অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন :** হাইপোথিসিস বা অনুকল্প হলো গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্ত যার সত্যতা নিরূপণের জন্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। এ পর্যায়ে গবেষক গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গবেষণার পরিভাষায় যা হলো অনুকল্প বা পূর্বানুমান। এই অনুমিত সিদ্ধান্তই সমগ্র গবেষণা প্রক্রিয়ায় গবেষকের দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

**৫. গবেষণা নকশা প্রণয়ন :** গবেষণা নকশা অনুসন্ধান কার্যের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার একটি কার্যক্রম বিশেষ। গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর উক্ত অনুকল্প প্রমাণের জন্য গবেষককে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হয় যা গবেষণা নকশা হিসেবে পরিচিত। নকশার মাধ্যমে গবেষণা সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রম জানা যায়। তাই গবেষণা নকশাকে গবেষণার ব্লুপ্রিন্ট বলা হয়। একটি উত্তম গবেষণা নকশায় যে সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে তা হলো– তথ্যের উৎস্য ও প্রকৃতি নির্ধারণ; গবেষণার জন্য সুনির্দিষ্ট এলাকা নির্বাচন; গবেষণার সমগ্রক, নমুনা ও বিশ্লেষণের একক নির্বাচন; তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, কৌশল ও মাধ্যম নির্ণয়; প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কর্মী সংগ্রহ; কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; বাজেট প্রণয়ন এবং সময়সূচি নির্ধারণ।

**৬. প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন :** গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক কিছু চলক বা বিশেষ অর্থবোধক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এসকল চলক বা প্রত্যয়ের কার্যকরী সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান জরুরি। কেননা অনেক সময় কোনো কোনো চলক একাধিক অর্থবোধক হতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী চলকসমূহের সংজ্ঞা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

**৭. পদ্ধতি নির্ধারণ :** গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলত কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়। সামাজিক জরিপ, কেস স্ট্যাডি, নৃ-তাত্ত্বিক পদ্ধতি বা পরিবীক্ষণ পদ্ধতি কোনটা ব্যবহার করা হবে সেটির সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকতে হয়। কারণ পদ্ধতি প্রয়োগের ভিন্নতার জন্য গবেষণার নকশা, ফলাফল বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের ধরনও পরিবর্তিত হয়।

**৮. তথ্য সংগ্রহ :** সমাজকর্ম গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। তথ্য সংগ্রহের উপরই মূলত গবেষণার ফলাফল নির্ধারিত হয়। প্রয়োজনীয় ও যথাযথ তথ্য সংগৃহীত না হলে অনেক সময় গবেষণাকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ পর্যায়ে গবেষক নিজে বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ বেতনভুক্ত কর্মীদের দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নপত্র, অভীক্ষণ, ফোকাস দল আলোচনা, সরেজমিন অংশগ্রহণসহ নানা ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

**৯. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ :** গবেষণার সংগৃহীত তথ্যাবলী সাধারণত অবিন্যস্ত, অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে। ফলে উক্ত তথ্য থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ফলাফল প্রদান করা যায় না। সমাজকর্ম গবেষণার এ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাবলী সম্পাদনার পর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সুবিন্যস্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস ও তালিকাকরণ করা হয় এবং উক্ত তথ্যগুলো যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়।

**১০. গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন :** সমাজকর্ম গবেষণার এ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়। সাধারণত চিত্র, সারণি, তালিকা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে গবেষণা ফলাফল যথাযথভাবে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদন সাধারণত পর্যায়ক্রমিক এবং সহজ ও বোধগম্য হয়ে থাকে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম গবেষণা হলো প্রণালীবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কতগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধাপ বা পর্যায় অনুসরণ করা হয়। যদিও এই ধাপ বা পর্যায়গুলোর প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা কাজ সম্পন্ন হয়, তথাপিও এগুলো একে অপরের উপর পরস্পর নির্ভরশীল। মূলত এই পর্যায়গুলোর যথাযথ বাস্তবায়নই সমাজকর্ম গবেষণার পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায়। সমাজকর্ম গবেষণার পর্যায় বা ধাপসমূহ হলো– ১) গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ, ২) সাহিত্য সমীক্ষা, ৩) উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ, ৪) অনুকল্প গঠন, ৫) গবেষণা নকশা প্রণয়ন, ৬) প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন, ৭) পদ্ধতি নির্ধারণ, ৮) তথ্য সংগ্রহ, ৯) তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ এবং ১০) গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। গবেষণার 'ব্লুপ্রিন্ট' বলা হয় কোনটিকে?
ক) অনুমিত সিদ্ধান্ত খ) সাহিত্য পর্যালোচনা
গ) গবেষণা নকশা ঘ) প্রতিবেদন উপস্থান

২। চিত্র, সারণি ও তালিকা এগুলো গবেষণার কোন পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়?
ক) সমস্যা চিহ্নিতকরণে খ) গবেষণা নকশা প্রণয়নে
গ) তথ্য সম্পাদনায় ঘ) প্রতিবেদন উপস্থাপনে

৩। তথ্য সংগ্রহ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাবলী যে অবস্থায় থাকে–
i. অবিন্যস্ত
ii. সুশৃঙ্খল
iii. অসংগঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। কোনটি গবেষককে গবেষণা প্রক্রিয়ায় দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে?
ক) উদ্দেশ্য নির্ধারণ খ) অনুকল্প
গ) গবেষণা নকশা ঘ) পদ্ধতি নির্ধারণ

## পাঠ-৯.১০ গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.১০.১ গবেষণা প্রস্তাবনা কীভাবে প্রস্তুত করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৯.১০.১ গবেষণা প্রস্তাবনা

গবেষণা প্রস্তাবনা সামগ্রিক গবেষণা কার্যক্রমের পূর্ব পরিকল্পনা। একজন গবেষক যখন কোনো বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করতে চান, তখন অবশ্যই তাকে গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করতে হয়। গবেষণা প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করেই গবেষক সামগ্রিক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকেন। একটি উত্তম গবেষণা প্রস্তাবনায় যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে তা হলো :

১) **গবেষণা শিরোনাম :** গবেষণাধীন বিষয়ের একটি সুনির্দিষ্ট শিরোনাম থাকতে হয়। অর্থাৎ গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করবেন তার একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট শিরোনাম ঠিক করবেন যার মাধ্যমে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। গবেষণা শিরোনামটি এমন হতে হবে যেন খুব বেশি বড় না হয়, আবার ছোটও না হয়। গবেষণা শিরোনামটি দেখে যে কেউ যেন এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

২) **সারসংক্ষেপ :** গবেষণা প্রস্তাবনার এ অংশে যে বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে। এর মধ্যে গবেষণার তাত্ত্বিক বিষয়বস্তু, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, গবেষণাকর্মটি কাদের জন্য পরিচালিত হবে, কী বিষয়ে অনুসন্ধান করা হবে এবং কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে।

৩) **ভূমিকা :** গবেষণার বিষয় সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ বিবরণ থাকবে। গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করবেন তা কী? কতখানি গুরুত্বপূর্ণ? এর যৌক্তিকতাই বা কী? ভূমিকায় এ সকল বিষয়ের সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকবে।

৪) **গবেষণা সমস্যার বিবৃতি :** যে বিষয়ের ওপর গবেষণা পরিচালিত হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো গবেষণা সমস্যার বিবৃতি । এখানে কতগুলো প্রশ্ন তুলে ধরা হয় যা বর্তমান গবেষণায় অনুসন্ধান করা হবে ।

৫) **ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন :** গবেষণা প্রস্তাবনার এ অংশে গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন চলক বা প্রত্যয়সমূহের সাধারণ ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। প্রত্যয়সমূহ গবেষণাকার্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান আবশ্যক। একমাত্র সংজ্ঞায়নের মাধ্যমেই গবেষণার প্রত্যয়সমূহ কী অর্থে ব্যবহৃত হবে বা এর ব্যাপ্তি কী হবে তার যথাযথ ধারণা পাওয়া যায়।

৬) **সাহিত্য সমীক্ষা :** গবেষণার জন্য নির্বাচিত ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িকী, প্রতিবেদন, কলাম, পত্রপত্রিকা পাঠ আবশ্যক। এর মাধ্যমে গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পাওয়া সম্ভব। এছাড়া গবেষণার বিষয়ে পূর্বে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকলে সে সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাঠ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বিষয় সম্পর্ক জানা যায় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ইতোপূর্বে গবেষণা পরিচালিত হয়নি তা চিহ্নিত করা হয়।

৭) **গবেষণার যৌক্তিকতা :** বর্তমাণ গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা কী গবেষণালব্ধ জ্ঞান তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে ও বাস্তবায়নে কী সহায়তা করবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

৮) **গবেষণার উদ্দেশ্য :** গবেষণা প্রকল্পে প্রকৃতপক্ষে কী অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণ করা হবে তা এখানে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। গবেষণা প্রধান বা সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিশেষ উদ্দেশ্য কী এখানে ব্যাখ্যা করা হয়।

৯) **গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ :** গবেষণা প্রস্তাবনায় গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে, কেন প্রয়োগ করা হবে তার বর্ণনা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নমুনায়ন, তথ্য সংগ্রহ, এবং তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকবে।

এছাড়াও গবেষণায় প্রস্তাবনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকে :

**ক) প্রস্তাবিত সময়সূচি :** গবেষণা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য সময়সূচি তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে গবেষণা সম্পাদনের জন্য পর্যায়ক্রমানুসারে প্রধান প্রধান কাজ। যেমন– গবেষণা নকশা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ, গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদির তালিকা তৈরি করে কত সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করা হবে তার সুস্পষ্ট বিবরণ থাকতে হবে।

**খ) বাজেট প্রণয়ন :** গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য অর্থ একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস্য, উক্ত অর্থ কোন খাতে কত ব্যয় হবে এবং কীভাবে ব্যয় করা হবে তার বিশদ বিবরণ থাকতে হবে।

**গ) সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :** গবেষণা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ, জার্নাল, গবেষণা প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকা, রিপোর্ট, ওয়েবসাইট প্রভৃতি যা গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হবে তার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। এটিই হলো সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি। সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে গ্রন্থপঞ্জি লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন– সরকার, আবদুল হাকিম (২০০০) "ব্যক্তি সমাজকর্ম নির্দেশিকা", ঢাকা : ঈমা প্রকাশনী।

## সারসংক্ষেপ

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার প্রাথমিক কাজ হলো গবেষণা প্রস্তাবনা প্রস্তুত ও কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদান। গবেষণা প্রস্তাবনা সামগ্রিক গবেষণা কার্যক্রমের পূর্বে পরিকল্পনা। যাতে গবেষণার বিষয় বা সমস্যা, গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়। গবেষণা প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করেই গবেষক সামগ্রিক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকেন। গবেষণা প্রস্তাবনায় সাধারণত যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয় তা হলো– ১) গবেষণা শিরোনাম, ২) সারসংক্ষেপ, ৩) ভূমিকা, ৪) গবেষণা সমস্যার বিবৃতি, ৫) প্রত্যয়সমূহের কার্যকর সংজ্ঞায়ন, ৬) সাহিত্য সমীক্ষা, ৭) গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা এবং ৮) গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামগ্রিক গবেষণা কার্যক্রমের পূর্ব পরিকল্পনাকে কী বলা হয়?
ক) গবেষণা প্রস্তাবনা খ) অনুকল্প
গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সারসংক্ষেপ

২। গবেষণা প্রস্তাবনার কোন স্তরে প্রত্যয়সমূহের ব্যাখ্যা দেয়া হয়?
ক) ভূমিকা খ) সারসংক্ষেপ
গ) প্রত্যয়সমূহের কার্যকর সংজ্ঞায়ন ঘ) সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৩। গবেষণা প্রস্তাবনার বাজেটে যে সকল বিষয়ের বিবরণ থাকে–
i. অর্থের উৎস নির্ধারণ ii. কোন খাতে কত অর্থ ব্যয় হবে iii. অর্থ কীভাবে ব্যয় হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। গবেষণা প্রস্তাবনার কোনটি দেখে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়?
ক) গবেষণা শিরোনাম খ) গবেষণার সার সংক্ষেপ
গ) গবেষণার যৌক্তিকতা ঘ) প্রস্তাবিত সময়সূচি

# পাঠ-৯.১১ সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব (Importance of Social Work Research)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.১১.১ পেশাগত সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

## ৯.১১.১ সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব

সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার এক পেশাগত কর্মপ্রক্রিয়া যা তাদের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতাকে পুনরুদ্ধার ও শক্তিশালী করে তোলে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সম্পর্কিত যথাযথ তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়, নির্ণীত সমস্যার সমাধানে যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে পেশাগত সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

**১. সমস্যা সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ :** সমস্যা সমাজকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সমস্যার সমাধানই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী সমাধান ব্যবস্থা প্রদানে সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কিত যথাযথ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

**২. সামাজিক সমস্যার কারণ উদ্‌ঘাটন :** সামাজিক সমস্যা বহুমাত্রিক এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই বহুমাত্রিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সমস্যার বহুবিধ কারণ উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন। সমাজকর্ম গবেষণা সমস্যার যথাযথ কারণ উদ্‌ঘাটন করে সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণে যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকে।

**৩. সম্পদ নির্ধারণ :** সমাজে নানাবিধ সম্পদ বিদ্যমান। এসব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ব্যতীত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার কার্যকর সমাধান সম্ভব নয়। সকল প্রকার বস্তুগত ও অবস্তুগত, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও আহরণ এবং যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

**৪. সামাজিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন :** সামাজিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে তার সাথে প্রচলিত সম্পদের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা যথাযথ চাহিদা নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণে কর্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

**৫. সামাজিক নীতি ও আইন প্রণয়নে সহায়তা :** সামাজিক নীতি ও আইন হলো আধুনিক সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ ও মানুষের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক সময় নীতি ও আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা সামাজিক সমস্যা বা প্রয়োজনের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে যথাযথ নীতি ও আইন প্রণয়নে সহায়তা করে থাকে।

**৬. সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ :** সমাজকর্ম একটি সমাধানমূলক কর্মপ্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধানে কতিপয় সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী পদ্ধতিগুলোর যথাযথ প্রয়োগ এবং পদ্ধতিসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

**৭. সমাজকর্মের নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন :** সমাজ একটি গতিশীল ব্যবস্থা। সমাজের এ গতিশীলতার সাথে সাথে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। এসকল সমস্যার বাস্তবমুখী ও টেকসই সমাধানের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবনে যথাযথ সহায়তা করে থাকে।

**৮. সমাজকর্ম সেবার মূল্যায়ন :** সমাজকর্ম একটি সেবামূলক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধানে যথাযথ সেবা প্রদান করা হয়। প্রদত্ত এ সেবা ব্যবস্থা সমস্যা সমাধানে কতটা কার্যকর তা মূল্যায়নে সমাজকর্ম গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এছাড়াও সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য বৃদ্ধি, পেশাগত মূল্যাবোধ ও নীতিমালা প্রণয়ন, সামাজিক ঘটনা বা সমস্যার মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক আবিষ্কার, সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ, সমস্যা সম্পর্কিত ভবিষ্যতবাণীকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সূতরাং বলা যায়, সমাজকর্ম গবেষণা পেশাগত সমাজকর্ম অনুশীলনে সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম গবেষণা নানাবিধ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও তার সমাধানে প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করে থাকে। এজন্য সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলনে সহায়ক হিসেবে পরিগণিত। সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা করে একে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়, সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা প্রদান, প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন, প্রয়োগ ও প্রয়োগের কার্যকারিতা নির্ণয়, সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ ও উন্নয়ন সাধনে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির মূল্যায়ন, সামাজিক কার্যক্রম, সমাজকর্ম প্রশাসন ব্যবস্থার যথাযথ ভূমিকা পালনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন নানাবিধ ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বহুমাত্রিক ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কোনটি?
ক) সামাজিক সমস্যা খ) সামাজিক নীতি গ) সামাজিক পরিকল্পনা ঘ) সামাজিক কর্মসূচি

২। সমাজকর্ম গবেষণা–
i. সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগে সহায়তা করে
ii. সামাজিক আইন ও নীতি প্রণয়নে সহায়তা করে
iii. সমাজকর্মের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৯.১২ সমাজকর্মের মৌলিক এবং সহায়ক পদ্ধতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelationship between Basic and Auxiliary Methods of Social Work)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৯.১২.১ সমাজর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৯.১২.১ সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির সম্পর্ক

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর সাহায্যকারী পেশা যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে তাদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলে। এ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্মের তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এগুলোকে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি বলা হয় । পদ্ধতি তিনটি হলো– ১) ব্যক্তি সমাজকর্ম, ২) দল সমাজকর্ম এবং ৩) সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। এই তিনটি মৌলিক পদ্ধতিকে সহায়তা করার জন্য রয়েছে আরো তিনটি সহায়ক পদ্ধতি। যথা– ১) সমাজকল্যাণ প্রশাসন, ২) সামাজিক কার্যক্রম ও ৩) সমাজকর্ম গবেষণা। সমাজকর্মের এই মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। একটি ছাড়া এদের অন্যটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা যায় না। নিচে বিভিন্ন আঙ্গিকে সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

**১. ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে :** ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক, মনো-দৈহিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব নির্ণয়ের মাধ্যমে একটি বাস্তবমুখী ও কার্যকর সমাধান পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতিকে সমাজকর্ম গবেষণা সহায়তা করে। সমাজকর্ম গবেষণা অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করে। ব্যক্তির সমস্যা নির্ণয়ের পর সমাধান ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসন অত্যন্ত জরুরি। ব্যক্তি সমাজকর্ম পরিচালিত হয় কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। আর প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায়। অর্থাৎ

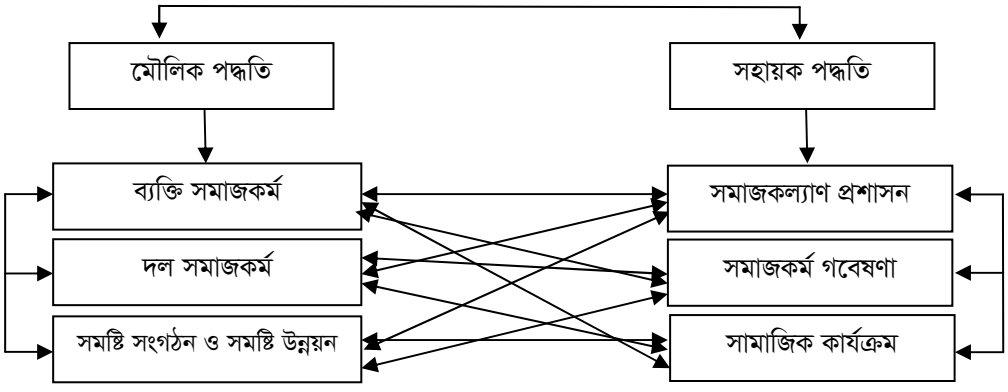
ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন, সমন্বয় সাধন, মূল্যায়ন, প্রয়োজনে রেফারেল বা অন্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ সকল ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সহায়তা অত্যাবশ্যক।

অনেক সময় ব্যক্তির মধ্যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, কুপ্রথা, গোঁড়ামীসহ নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান থাকে। ফলে ব্যক্তির মনো-সামাজিক সমস্যা দূর করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নানা সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সূতরাং দেখা যায় যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগে সাহায্যার্থীকে গ্রহণ থেকে শুরু করে সমাধান ব্যবস্থা ও মূল্যায়ন পর্যন্ত সকল স্তরে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতিগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ ব্যক্তি সমাজকর্মের সাথে সহায়ক পদ্ধতিগুলোর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

**২. দলকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে :** দল সমাজকর্ম এমন একটি পদ্ধতি যা দলীয় সদস্যদেরকে এমনভাবে সহায়তা করে যাতে তারা সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও দলীয় অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসন দলীয় সদস্যদের আন্তক্রিয়া যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যাতে দলের লক্ষ্যার্জন ত্বরান্বিত হয়। দল সমাজকর্মে দল ও দলীয় সদস্যদের সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ, দলের চাহিদা বা সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন অতীব জরুরি যা সমাজকর্ম গবেষণা ব্যতীত সম্ভব নয়। দলের সদস্যদের ভূমিকা ও আন্তক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক সময় দল সমাজকর্মী বিভিন্ন সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে। অনেক সময় দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মনোমালিন্য, বিক্ষোভ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে দল সমাজকর্মীকে সামাজিক কার্যক্রমের জ্ঞান সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যায়, সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতিগুলোর সহায়তা ছাড়া দল সমাজকর্ম পদ্ধতির লক্ষ্যার্জন সম্ভব নয়।

**৩. সমষ্টিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে :** সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্য হলো জনসমষ্টির চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উন্নয়নমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাতে তারা উন্নততর জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হতে পারে। সমাজকর্মেও অন্যান্য মৌলিক পদ্ধতির ন্যায় সহায়ক পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। সমষ্টির উন্নয়ন ও সমস্যা মোকাবিলায় সমষ্টির বিদ্যমান সমস্যাবলীর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যা নির্ণয়, সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ, বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা যথাযথ অনুসন্ধানের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে সমষ্টির উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনে বহিঃসম্পদ সরবরাহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন নানাবিধ কর্মসম্পাদনে সমাজকল্যাণ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমষ্টির বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে জনসচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয় যা সমষ্টির ব্যাপকভিত্তিক পরিবর্তনে সহায়ক। এক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিচের চিত্রের সাহায্যে সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হলো :

**সমাজকর্ম পদ্ধতি**




চিত্র : ৯.১২.১.১ সমাজকর্ম পদ্ধতিসমূহের মধ্যকার আন্তসম্পর্ক

সমাজকর্মের পদ্ধতিসমূহের মধ্যকার আন্তসম্পর্ক একটি উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো দুর্যোগে এদেশের মানুষের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। দুর্যোগজনিত সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলোর সমন্বিত প্রয়োগ দেখানো হলো :

স্বভাবতই দুর্যোগের কারণে ব্যক্তি তার স্বাভাবিক সক্ষমতাগুলো হারিয়ে ফেলে। ফলে ব্যক্তি তার নিজের সমস্যার সমাধান নিজে করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে পেশাগত সমাজকর্মের ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে তার সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা হয়।

দুর্যোগের কারণে যখন কোনো এলাকার জনগোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন দল সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করে দলীয় অভিজ্ঞতার আলোকে ক্ষুদ্র ঋণ, সমবায় সমিতি গঠনসহ নানা উপায়ে সম্পদ সঞ্চালনের মাধ্যমে দলীয়ভাবে সক্ষম করে তোলা হয়।

দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন– রাস্তাঘাট, বেড়িবাঁধ, পুল-কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত, পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ, দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ পরবর্তী ও সার্বিক উন্নয়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের ভূমিকা অত্যাবশ্যক।

দুর্যোগের প্রভাব, ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয়, ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ, গৃহীত কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের জন্য সমাজকর্ম গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অন্যদিকে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ, দুর্যোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করণীয় সম্পর্কে জনসাধাণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজের মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যবহৃত সমাজকর্মের পদ্ধতিসমূহ পরস্পর পরিপূরক। একদিকে যেমন সহায়ক পদ্ধতিসমূহের সহায়তা ব্যতীত মৌলিক পদ্ধতিসমূহের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব নয়, তেমনি মৌলিক পদ্ধতিসমূহ সহায়ক পদ্ধতিগুলোকে অর্থবহ করে তুলেছে। তাই বলা যায়, সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিসমূহ পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধানের জন্য এমনভাবে সহায়তা করে যাতে তারা নিজেদের সমস্যা সমাধানে নিজেরাই সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম তিনটি মৌলিক পদ্ধতি যথা– ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন সরাসরি প্রয়োগ করে থাকে। আবার সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর যথাযথ প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় লাগসই কৌশল উদ্ভবন ও প্রয়োগ ঘটিয়ে মৌলিক পদ্ধতিগুলোকে সমৃদ্ধকরণে সমাজকর্মের আরও তিনটি সহায়ক পদ্ধতি যেমন– সমাজকর্ম প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম ও সমাজকর্ম গবেষণা সহায়তা করে থাকে। সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলো পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত। একদিকে যেমন সহায়ক পদ্ধতিগুলোর সহায়তা ছাড়া মৌলিক পদ্ধতির প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয়না, তেমনি সহায়ক পদ্ধতিগুলোকে যথাযথ অর্থবহ করে তুলেছে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহ। সুতরাং বলা যায়, সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলো একে অন্যের পরিপুরক এবং পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি সমাজকর্মকে সহায়তা করে নিচের কোন পদ্ধতি?
ক) সমাজকল্যাণ প্রশাসন খ) সামাজিক প্রশাসন
গ) সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান

২। ব্যক্তির মধ্যকার অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোড়ামী ইত্যাদি দূরীকরণে কার্যকর কোন পদ্ধতি?
ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম
গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সমাজকল্যাণ প্রশাসন

৩। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়নে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিটি অধিক কার্যকর?
ক) সমষ্টি সংগঠন খ) সমষ্টি উন্নয়ন
গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সামাজিক প্রশাসন

৪। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের ভূমিকা অত্যাবশ্যক–
i. দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণে
ii. দুর্যোগকালীন জরুরি ত্রাণ সরবরাহে ও পুনর্বাসনে
iii. দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন ও উন্নয়ন সাধনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়া কোনটি?
ক) সমাজকল্যাণ প্রশাসন খ) সামাজিক কার্যক্রম গ) সমষ্টি সংগঠন ঘ) সমষ্টি উন্নয়ন

২। কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধানকে কী বলে?
ক) জরিপ খ) গবেষণা গ) কেস স্টাডি ঘ) আদমশুমারী

৩। সামাজিক কার্যক্রম কোন ধরনের প্রচেষ্টা?
ক) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা খ) সরকারি প্রচেষ্টা গ) দলীয় প্রচেষ্টা ঘ) বেসরকারি প্রচেষ্টা

৪। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম কাজ হলো এজেন্সির–
i. উদ্দেশ্য নির্ধারণ ii. বাজেট প্রণয়ন iii. কর্মসূচি বাস্তবায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতিকে সহায়তা করে–
i. সমাজকল্যাণ প্রশাসন ii. সমাজকর্ম গবেষণা iii. সমষ্টি সংগঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। মানহা যৌতুক প্রথা রোধে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এর জন্য প্রয়োজন–
i. নকশা তৈরি করা ii. অনুমান গঠন করা iii. তথ্য সংগ্রহ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। সামাজিক কার্যক্রম জনগণের মধ্য থেকে কোন বিষয়টি দূর করতে সহায়তা করে?
ক) কুসংস্কার খ) দারিদ্র্য গ) ভিক্ষাবৃত্তি ঘ) দুর্নীতি

৮। সমাজকর্ম গবেষণা–
i. সমাজকর্মের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে
ii. নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে
iii. সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলোকে আরও কার্যকর করে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**
স্বর্ণা তার গ্রামের যৌতুকপ্রথা দূর করতে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে স্থানীয় একটি সংগঠনের সাথে কাজ করেন। তিনি মনে করেন এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রশাসনকে প্রভাবিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (নীতি ও আইন প্রণয়ন) গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯। স্বর্ণার প্রচেষ্টা কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে?
ক) দল সমাজকর্ম খ) সামাজিক কার্যক্রম গ) সমষ্টি উন্নয়ন ঘ) সামাজিক গবেষণা

১০। স্বর্ণার এই প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়–
i. জনসচেতনতা সৃষ্টি করে
ii. কর্মসূচি প্রণয়ন করে
iii. সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

### খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ফারজানা দেখলেন যে, তার গ্রামের মেয়েদের অধিকাংশেরই ১৮ বছরের আগে বিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। এ সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধান কাজ শুরু করলেন। তিনি ধারণা করলেন, নারী শিক্ষার অভাবই এর মূল কারণ। এরপর তিনি অনুসন্ধান চালানোর জন্য একটি পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি তথ্য সংগ্রহ করলেন। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে, তার ধারণাই সঠিক।

ক. সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান কয়টি? ১
খ. গবেষণা প্রস্তাবনা বলতে কী বোঝেন? ২
গ. উদ্দীপকে ফারজানার কাজ সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে?– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "পেশাগত সমাজকর্মে ফারজানার কাজের গুরুত্ব অপরিসীম"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। রিফাত হুসাইন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করা। এ জন্য তিনি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। প্রয়োজনে তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকেন।

ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি ও কি কি? ১
খ. সামাজিক কার্যক্রম বলতে কী বোঝেন? ২
গ. উদ্দীপকে রিফাতের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে কিসের প্রতিফলন ঘটেছে?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. "সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নিবিড়"– বিশ্লেষণ করুন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ : ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ : ১। ক ২। ক ৩। ঘ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৮ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৯ : ১। গ ২। ঘ ৩। খ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১০ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১১ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১২ : ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৯ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ক ৮। ঘ ৯। খ ১০। ঘ

# সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম
## (Social Policy and, Planning and Social Work)

**ইউনিট ১০**

### ভূমিকা

নীতি শব্দটি আধুনিক বিশ্বের সমাজব্যবস্থায় কাঙ্খিত উন্নয়ন ও সমাজকর্মের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত একটি প্রত্যয়। সামগ্রিক কল্যাণের ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন হিসেবে সমাজসেবা কার্যক্রমের স্বরূপ, প্রকৃতি, পরিচালনা ও প্রশাসন ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা দেয় সামাজিক নীতি। সাধারণ অর্থে নীতি হলো কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথনির্দেশিকা। কোনো সমাজে সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ সমাজসেবামূলক ব্যবস্থা সামাজিক নীতি কাঠামোর আওতাতেই গড়ে ওঠে। সমাজসেবা ছাড়াও সামাজিক নীতির আরো উল্লেখযোগ্য পরিচয়বাহী বিষয় হলো শাসনতন্ত্র ও সামাজিক আইন এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতার চুক্তিপত্র। মূলত সমাজ উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে যে নীতি প্রণয়ন করা হয় তাই সামাজিক নীতি। একটি সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রণীত হয়ে থাকে। যেমন– শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, শিশুনীতি, জনসংখ্যানীতি, নারী উন্নয়ন নীতি, শ্রমনীতি প্রভৃতি।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ-১০.১ : সামাজিক নীতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-১০.২ : সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য
পাঠ-১০.৩ : সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া
পাঠ-১০.৪ : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০
পাঠ-১০.৫ : বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২
পাঠ-১০.৬ : জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
পাঠ-১০.৭ : জাতীয় শিশুনীতি ২০১১
পাঠ-১০.৮ : সমাজ উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব
পাঠ-১০.৯ : সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা
পাঠ-১০.১০ : সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-১০.১১ : পরিকল্পনা ও সামাজিক পরিকল্পনা
পাঠ-১০.১২ : পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ
পাঠ-১০.১৩ : বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা
পাঠ-১০.১৪ : সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা
পাঠ-১০.১৫ : সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

# পাঠ-১০.১ সামাজিক নীতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য (Concept and Characteristics of Social Policy)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১.১ সামাজিক নীতি ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১০.১.২ সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

## ১০.১.১ সামাজিক নীতির ধারণা

নীতি হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনের সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা। সমাজ জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য কর্মপন্থা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনাই হলো নীতি। সাধারণভাবে কোনো কাজ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনা করার মাধ্যমে বাঞ্ছিত ও ইপ্সিত লক্ষ্যে উপণীত হওয়ার জন্য যেসব নিয়মকানুন, পদ্ধতি বা কর্মকৌশল, যা কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয় তাকেই নীতি বলা হয়। অন্যদিকে সামাজিক নীতি হলো সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপন্থা। সামাজিক নীতি হলো সেসব নিয়মকানুন বা কর্মপন্থা যা কেবল সমাজকল্যাণমূলক কোনো কর্মসূচি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।

সমাজকর্ম অভিধান অনুযায়ী, সামাজিক নীতি হলো সমাজের সেসব কার্যক্রম ও বিধিবিধান যেগুলো ব্যক্তি, দল, সমষ্টি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের পথ নির্দেশ করে। এসব কার্যক্রম ও বিধিবিধানগুলো সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রথার ফলশ্রুতি।

অধ্যাপক মার্শাল বলেন, সামাজিক নীতি প্রত্যয়টি সরকার গৃহীত সেসব নীতিমালার নির্দেশক, যেগুলো নাগরিকদের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কল্যাণ নিশ্চিত করার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক এর মতে, সামাজিক নীতি হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থার নির্দেশনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায়, যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, সামাজিক নীতি হলো সমাজের কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন পূরণ তথা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের নিমিত্তে কতিপয় নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি বা কৌশল যা মানুষের ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ লাভ এবং সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যেখানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং তা আদর্শ হিসেবে অনুসরণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপণীত হওয়ার প্রয়াস চালায়।

## ১০.১.২ সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য

সমাজের কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক সুসমন্বিত নীতিমালা ও কর্মকৌশল হলো সামাজিক নীতি। জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করে সমাজের গতিশীলতা ত্বরান্বিত করতে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো :

১. সামাজিক নীতি সামাজিক উন্নয়নের পথনির্দেশক ও অনুসরণীয় আদর্শ।
২. সামাজিক নীতি সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কর্মপ্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজসেবামূলক কাজের শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়।
৩. সামাজিক নীতি জনগণের মানবীয় প্রয়োজন পূরণ ও সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করে।
৪. সামাজিক নীতি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং সরকার ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় তা বাস্তবায়িত হয়।
৫. সামাজিক নীতি সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ অনেকগুলো বিকল্প কর্মপন্থা থেকে কোনটি গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারণ করে দেয়।
৬. সামাজিক নীতি বাঞ্ছিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়। সুপরিকল্পিত উপায়ে সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য সামাজিক নীতি প্রণীত হয়।
৭. সামাজিক নীতি সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৮. সামাজিক নীতি সামাজিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে। কারণ সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক সময় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা । যেমন– কুপ্রথা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা প্রভৃতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব বাধা দূর করতে প্রয়োজন হয় সামাজিক কার্যক্রমের। সামাজিক নীতি এর ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়।

৯. সামাজিক নীতি সমাজে বসবাসরত মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে। সামাজিক নীতি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যাতে মানুষ পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়।

১০. সামাজিক নীতি সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সামাজিক সমতা, স্থিরতা, শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

## সারসংক্ষেপ

নীতি হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনের কর্মপন্থা। সমাজ জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য কর্মপন্থা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনাই হলো নীতি। সাধারণভাবে কোনো কাজ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনা করার মাধ্যমে বাঞ্ছিত ও ইপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যেসব নিয়মকানুন, পদ্ধতি বা কর্মকৌশল যা কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাকেই নীতি বলা হয়। অন্যদিকে, সামাজিক নীতি হলো সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপন্থা। সামাজিক নীতি হলো সেসব নিয়ম-কানুন বা কর্মপন্থা, যা কেবল সমাজকল্যাণমূলক কোনো কর্মসূচি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের লক্ষ্য ক্ষেত্রে পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজ জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য কর্মপন্থা সম্পর্কিত নির্দেশনাকে কী বলা হয়?
ক) সামাজিক নীতি খ) সামাজিক পরিকল্পনা
গ) সামাজিক কর্মসূচি ঘ) সামাজিক কার্যক্রম

২। সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য হলো–
i. সামাজিক উন্নয়নের পথনির্দেশক
ii. সমাজ সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কর্মপ্রক্রিয়া
iii. বাঞ্ছিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.২ সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য (Objectives of Social Policy Formulation)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.২.১ সামাজি নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১০.২.১ সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য

কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন, মানবীয় প্রয়োজন পূরণ এবং সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর টি.এইচ মার্শাল বলেন, সামাজিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো তিনটি যথা– দারিদ্র্য দূরীকরণ, সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক সমতা নিশ্চিতকরণ। অধ্যাপক স্লেক এর মতে, সামাজিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ হলো– ক) যথাসম্ভব অকালমৃত্যু, কষ্ট ও সামাজিক অনিষ্ট লাঘব করা; খ) দুর্বলদের রক্ষা

করা, যখন তারা নিজেরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে অপারগ হয়ে পড়ে; এবং গ) সমাজ ও সমাজের প্রতিটি সদস্যের কল্যাণ সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। সার্বিকভাবে সামাজিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

**১. সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে পথনির্দেশনা দান :** স্বীকৃত মানবীয় প্রয়োজন পূরণ ও সামাজিক সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় পথনির্দেশনা দান সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সামাজিক নীতি শুধু সমস্যার সমাধান দেয় না, সাথে সাথে এসব সমস্যার উদ্ভব ও প্রতিরোধেরও পথনির্দেশ দান করে।

**২. কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন :** সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজের কাঙ্ক্ষিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়ন। অর্থাৎ জনগণের চাহিদা পূরণ ও সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন সাধন। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে জনগণকে সহায়তা করে।

**৩. সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান :** বিভিন্ন সামাজিক বিপর্যয়কর অবস্থা যেমন– দুর্ঘটনা, অকালমৃত্যু, বেকারত্ব, অবসর, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে মানুষের অর্থনৈতিক অক্ষমতা থেকে রক্ষা করা সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

**৪. সামাজিক সাম্য ও সমতা বিধান :** সমাজে সম্পদ ও সুযোগের সুসম বণ্টনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সাম্য ও সমতা বিধান সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে সামাজিক নীতি মানুষের মৌলিক স্বাধীনতায় সমঅধিকার নিশ্চিত করতে সামাজিক পরিবর্তন এবং সম্পদ ও সুযোগের সুসম বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়।

**৫. সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপন :** সামাজিক নীতি সমাজে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ সমাজকাঠামো বিনির্মাণে প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি সামাজিক মানুষের ব্যক্তিগত ও দলীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ব্যবস্থার যথাযথ অনুশীলনে জনসাধারণকে উৎসাহিত করে।

**৬. উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ :** সামাজিক নীতির একটি মূখ্য উদ্দেশ্য হলো সামাজিক উন্নয়নের পথনির্দেশনা ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সামাজিক নীতি শুধুমাত্র সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নেই সহায়তা করেনা, একইভাবে এর উদ্দেশ্য হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্তরায় দূর করা এবং উন্নয়নের কার্যকর সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা।

**৭. নাগরিকের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা :** সামাজিক নীতির মূখ্য উদ্দেশ্য হলো নাগরিকের সামগ্রিক ও সর্বোত্তম কল্যাণমূলক সেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সাধারণত এ ধরনের সেবার মধ্যে সামাজিক বীমা, সামাজিক সাহায্য, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, গৃহায়ণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসব সেবা প্রদানে সামাজিক নীতি সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা দান করে।

**৮. সমাজসেবার কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ :** সমাজসেবা ব্যবস্থাকে (সরকারি ও বেসরকারি) অর্থবহ, সুশৃঙ্খল ও কার্যকর করার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে সামাজিক নীতি সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কী কৌশল অনুসরণ করা হবে, কী ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ করে থাকে।

**৯. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ :** সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত অপরিপক্কতার কারণে এগুলোর যথাযথ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়না। সামাজিক নীতি এসমস্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদ খুঁজে বের করে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

**১০. সুশৃঙ্খল সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা :** সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা, যা উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করে ধারাবাহিক ও দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা, সম্পদ ও সুযোগের সমবণ্টন, সামাজিক সমতার নীতি অবলম্বন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে।

এছাড়াও সামাজিক নীতির আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন :

ক) সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা;
খ) সামাজিক সমস্যার উদ্ভব, বিস্তার ও প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
গ) সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, দুঃস্থ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ;
ঘ) দেশের অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়ন সাধন;
ঙ) সামাজিক সাম্য ও সমতা বিধান;
চ) জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদি।

## সারসংক্ষেপ

কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তন, মানবীয় প্রয়োজন পূরণ এবং সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। প্রফেসর টি. এইচ. মার্শাল এর মতে, সামাজিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো তিনটি যথা– দারিদ্র্য দূরীকরণ, সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক সমতা নিশ্চিতকরণ। সামগ্রিকভাবে সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হলো– ১) সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে পথনির্দেশনা দান, ২) কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তন, ৩) সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ৪) সামাজিক সাম্য ও সমতা বিধান, ৫) সামাজিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপন, ৬) উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ, ৭) নাগরিকের সমগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা, ৮) সমাজসেবামূলক কাজের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, ৯) সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ১০) সুশৃঙ্খল সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। টি.এইচ মার্শালের মতে সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য কয়টি?

ক) ২টি খ) ৩টি

গ) ৪টি ঘ) ৫টি

২। অধ্যাপক স্লেক এর মতে সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হলো–

i. যথাসম্ভব অকালমৃত্যু, কষ্ট ও সামাজিক অনিষ্ট লাঘব করা

ii. দুর্বলদের রক্ষা করা, যখন তারা নিজেরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে অপারগ হয়ে পড়ে

iii. সমাজ ও সমাজের প্রতিটি সদস্যের কল্যাণ বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.৩ সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া (Process of Social Policy Formulation)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৩.১ সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১০.৩.১ সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

সামাজিক নীতি সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। সামাজিক নীতি একটি দেশের দর্পণ বিশেষ, যার মাধ্যমে উক্ত দেশ বা সমাজের উন্নয়নের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। সামাজিক নীতিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। সামাজিক নীতি যেহেতু সামাজিক উন্নয়নের পথনির্দেশক সেহেতু এখানে জনসমর্থন ও সহায়ক নেতৃত্বের উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়। সামাজিক নীতি একটি বহুমুখী জটিল প্রক্রিয়া। কারণ এতে যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকে তেমনি বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপাদানও সক্রিয় থাকে। তাই সামগ্রিকভাবে প্রাসঙ্গিক সকল দিক বিবেচনায় এনে জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি রেখে সামাজিক নীতি প্রণয়নে কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াসমূহ হলো :

**১. নীতির অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ :** কোনো বিষয়ে নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন তা নির্ধারণের মাধ্যমেই নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ শুরু হয়। নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে থাকে জনগণের সচেতন অংশ এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন দল ও সংস্থা। সাধারণত সরকার নিজ থেকে কোনো বিষয়ে নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করে না; বরং এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় জনমতের চাপ ও প্রত্যাশার মাত্রা সরকারকে নীতি প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করে।

**২. যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** এটি নীতি প্রণয়নের দ্বিতীয় ধাপ। জনগণের আগ্রহ ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সামাজিক নীতি নির্ধারণের জন্য যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যথাযথ ও ব্যাপক জরিপ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই নীতি প্রণয়নের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব।

**৩. কমিটি গঠন :** এ পর্যায়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে নীতি প্রণয়নের জন্য একটি কার্যকর কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সাধারণত দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয়। কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ, লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সদস্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এছাড়াও সাংবাদিক, সমাজকর্মী, সমাজচিন্তাবিদগণ অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

**৪. নীতি বিশ্লেষণ :** নীতি প্রণয়নের কার্যপ্রণালী স্থির করার পর সে অনুযায়ী গঠিত কমিটি নীতি প্রণয়নের জন্য নীতির আবশ্যকতা, সামাজিক বাস্তবতা, নীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতা ও সমস্যা, বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রদান করেন। পরবর্তীতে এর উপর ভিত্তি করেই খসড়া নীতি প্রণয়ন করা হয়।

**৫. খসড়া নীতি প্রণয়ন :** এ পর্যায়ে কমিটির মতামতের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষামূলক খসড়া নীতি প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে নীতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সম্পদের উৎস্য, কত সময়ে নীতি বাস্তবায়িত হবে, প্রণীত নীতি জনগণের জন্য কতটুকু কল্যাণ বয়ে আনবে, জনগণ প্রণীত নীতি গ্রহণ করবে কি না তা নির্দিষ্ট করতে হয়। প্রণীত খসড়া নীতি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হয়।

**৬. খসড়া নীতি চূড়ান্ত প্রণয়ন :** সামাজিক নীতি প্রণয়নের এ পর্যায়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত খসড়া নীতির ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মূল্যায়ন, সংশোধন, সংযোজন ও পর্যালোচনা করে খসড়া নীতি চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

**৭. জনসমর্থন আদায়ে আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ :** প্রণীত খসড়া নীতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য এ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন– রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সেমিনার, নাটক, বিভিন্ন ব্লগ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ প্রচারকার্য চালানো হয়ে থাকে। এছাড়া সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের এর মাধ্যমেও প্রচারকার্য চালানো হয়। এক্ষেত্রে প্রণীত খসড়া নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইতিবাচক দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।

**৮. নীতির পরীক্ষামূলক অনুশীলন :** এ পর্যায়ে খসড়া নীতি পরীক্ষামূলকভাবে অনুশীলন করা হয়। পরীক্ষামূলক প্রয়োগের মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের ফলাফল ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করে এর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়। নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দূর করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষে নিকট প্রেরণ করা হয়।

**৯. নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন :** খসড়া নীতিতে যেসকল ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা থাকে তা দূর করে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে থাকে।

## সারসংক্ষেপ

সামাজিক নীতি সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। সামাজিক নীতি একটি দেশের দর্পণ বিশেষ, যার মাধ্যমে উক্ত দেশ বা সমাজের উন্নয়নের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। সামাজিক নীতিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। সামাজিক নীতি যেহেতু সামাজিক উন্নয়নের পথনির্দেশক সেহেতু এখানে জনসমর্থন ও সহায়ক নেতৃত্বের উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়। সামাজিক নীতি একটি বহুমুখী জটিল প্রক্রিয়া। কারণ এতে যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকে তেমনি বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপাদানও সক্রিয় থাকে। সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতগুলো সুনির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। পর্যায়গুলো হলো– ১) নীতির অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ, ২) যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ৩) নীতি প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন, ৪) নীতি বিশ্লেষণ, ৫) খসড়া নীতি প্রণয়ন, ৬) খসড়া নীতির চূড়ান্ত প্রণয়ন, ৭) জনসমর্থন আদায়ে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ, ৮) নীতির পরীক্ষামূলক অনুশীলন এবং ৯) নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ কোনটি?

ক) নীতির অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ খ) যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গ) খসড়া নীতি প্রণয়ন ঘ) নীতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ

২। সামাজিক নীতি প্রণয়নে গঠিত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকেন–

i. সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা
ii. অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধি
iii. লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সদস্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.৪ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ (National Education Policy 2010)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৪.১ বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.৪.২ বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.৪.৩ বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

### ভূমিকা

একটা জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যপূরণে শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তাচেতনায় অগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। তাই শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। স্বাধীনতার পরপরই একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত এ খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিশন ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ১৯৭৪ সালে গণমুখী আধুনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সময়ের প্রয়োজনে এটি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিশীল নেতৃত্বদানে উপযোগী মানবতাবাদী, মননশীল, যুক্তিবাদী, কুসংস্কারমুক্ত, অসম্প্রদায়িক ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা।

### শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও কৌশল হিসেবে কাজ করবে। এই আলোকে শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত তাগিদ নিম্নরূপ :

১) শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
২) ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন মানুষ তথা জাতি গঠনে সহায়তা করা।
৩) মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলী যেমন– ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার, সচেতনতা, মুক্তিবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো।
৪) জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
৫) দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তাচেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬) দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭) জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণী–বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮) বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯) গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য ভিন্ন মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০) মুখস্ত বিদ্যার পরিবর্তে চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১) বিশ্বপরিমন্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২) জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩) শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪) সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।

১৭) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা, এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮) শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯) সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২) পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩) দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪) সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫) দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬) শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭) বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।

২৮) শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০) মাদকজাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

## প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

### ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কাজেই ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়সী শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবে– শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন। অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

### খ. প্রাথমিক শিক্ষা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। একাজ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে বলে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা তাদের যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালয় ভেদে সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের দুর্বলতাসহ বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে জাতির সার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা হবে।

### প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।

২. কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সবধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।

৩. শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।

৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা। শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা।

৫. শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবনদক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৭. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া।

৮. সবধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

## প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ও বাস্তবায়ন

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দু'টি বিষয় হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে :

১. প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা;
২. প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৩. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।
   প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।

## বিভিন্ন ধারার সমন্বয়

১. একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা যথা– সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম), ইবতেদায়িসহ সবধরনের মাদরাসার মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য কিংবা অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে।
২. শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়িসহ সবধরনের মাদরাসাসমূহ আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।
৩. বিভিন্ন ধরনের (কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রেজিষ্ট্রিকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সাধারণ কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম ও সবধরনের মাদ্রাসাসহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিয়মনীতি মেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

## শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করবে। সর্বত্র অবকাঠামো তৈরি এবং কম্পিউটার সরবরাহ ও কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও মূল্যায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি-সহজপাঠ ও অনুশীলন পুস্তকভিত্তিক হবে। মানসম্পন্ন ইংরেজি লিখন-কথনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম শুরু থেকেই গ্রহণ করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে ওপরের শ্রেণিসমূহে প্রয়োজনানুসারে জোরদার করা হবে। প্রথম শ্রেণি থেকে সহশিক্ষাক্রম বিষয় থাকতে পারে। প্রাথমিক স্তর থেকে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণিতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যারা কোনো কারণে আর উচ্চতর পর্যায়ে পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

## ভর্তির বয়স

১. বর্তমানে চালু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে।
২. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ : ৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে।

## বিদ্যালয়ের পরিবেশ

১. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক/শিক্ষিকার আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের কাছে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলে সেদিকে নজর দেওয়া হবে এবং শিক্ষা পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক, পঠনে আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক।
২. সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

## শিক্ষা সামগ্রী

প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম-কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথিমক পর্যায়ের জন্য পৃথক বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শ্রেণিগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা সামগ্রী যথা পাঠ্যপুস্তক এবং প্রয়োজনবোধে সম্পূরক পঠন সামগ্রী এবং অনুশীলন পুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (বিশ্লেষণ, উদাহরণ ও অনুশীলন সংবলিত পুস্তক) প্রণয়ন করবে। সকল পাঠ্যপুস্তক সহজ ও সাবলীল ভাষায় রচিত, আকর্ষণীয় এবং নির্ভুল করা হবে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে।

## ঝরে পড়া সমস্যার সমাধান

১. দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা হবে।
২. স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উল্লেখযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো হবে। ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে।
৩. দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে।
৪. পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেওয়া হবে।
৫. হাওর, চর এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমন এলাকার বিদ্যালয়ে সময়সূচি এবং ছুটির দিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থার সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।
৬. মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা হবে।
৭. বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণি শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণি শেষ করার আগে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া দ্রুত কমিয়ে আনা জরুরি। ২০১৮ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী যেন অষ্টম শ্রেণি শেষ করে সেই লক্ষ্যে উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করা হবে।

## আদিবাসী শিশু

১. আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।
২. আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আদিবাসী অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় আদিবাসীদের বসতি হালকা তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকেও নজর দেওয়া হবে।

## প্রতিবন্ধী শিশু

১. সবধরনের প্রতিবন্ধীর জন্য প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধীবান্ধব সুযোগ-সুবিধা। যেমন– শৌচাগার ব্যবহারসহ চলাফেরা করা ও অন্যান্য সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

২. প্রতিবন্ধীদের বিশেষ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনা করা হবে।
৩. প্রত্যেক পিটিআইতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

### পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশু

এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনাখরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

### শিক্ষণ পদ্ধতি

শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এককভাবে বা দলগতভাবে কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা উৎসাহিত করা হবে এবং সেজন্য সহায়তা দেওয়া হবে।

### শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণিতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণি শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণি শেষে আপাতত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

### বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

#### বয়স্ক শিক্ষা

বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে স্বাক্ষর করে তোলা। বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে স্বাক্ষর, লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ, মানবিক গুণাবলির চেতনায় উদ্দীপ্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন এবং পেশাগত দক্ষতায় উন্নত করে তোলা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত এবং প্রাপ্তবয়স্ক সকলকে সাক্ষর করে না তোলা পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

#### উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত যে সকল শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না এবং যারা ঝরে পড়ে যায় এই ব্যবস্থায় তারা মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পাবে যা তারা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগতে পারে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী যোগ্যতাসম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় উপযুক্ত শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে।

### মাধ্যমিক শিক্ষা

#### উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।
২. কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।
৩. মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ভিত শক্ত হবে।

৪. বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্যও যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা।
৫. নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারার অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

### শিক্ষার মাধ্যম

এই পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত বাংলা, তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া যাবে। বিদেশিদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

### শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

১. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ধারা থাকবে সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাধারা এবং প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে। সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা– বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রত্যেক ধারায় এসকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য প্রত্যেক ধারায় সেই ধারা-সংশিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় থাকবে।
২. ধারা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধারার শিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জনের প্রয়োজনভিত্তিক বিন্যাস এবং সেই অনুসারে স্ব স্ব শিক্ষাক্রম তৈরি করা হবে।
৩. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি সকল ধারার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে।
৪. মাধ্যমিক স্তরে মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহ ব্যতীত সকল ধারার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং সাধারণ ধারার বিশেষ বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

### শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১ : ৩০ এ উন্নীত করা হবে।

### শিক্ষক নিয়োগ

সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন প্রতি বছর যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করবে এবং তাঁদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করবে।

### শিক্ষক প্রশিক্ষণ

সকল বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কাজে যোগদানের আগে মৌলিক শিক্ষকতা– প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। শূন্যপদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

### শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

দশম শ্রেণি শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণির শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।

## বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অসম-প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। দেশের প্রয়োজন ছাড়াও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই চাহিদা আরো বাড়বে। কাজেই দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় অনেক বৃদ্ধি সম্ভব। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
৩. দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি করা।

## মাদ্‌রাসা শিক্ষা

মাদ্‌রাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী অনুধাবনের পাশাপাশি জীবনধারণ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয় ও তার উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণ বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা যেন সমানভাবে অংশ নিতে পারে সেজন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা:) এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সমর্থ করে তোলা।
২. দ্বীন ও ইসলামের ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনুকরণীয় চরিত্র গঠন এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা ও ধর্ম অনুমোদিত পথে জীবনযাপনের জন্য তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।
৩. শিক্ষার্থীরা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বোঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়।
৪. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা।

## ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো– প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান। প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া এবং ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া।

নৈতিকতার মৌলিক উৎস ধর্ম। তবে সামাজিক ও সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং দেশজ আবহও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে নৈতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে।

## উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলোর জন্য স্বশাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য। বর্তমানে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক

নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয় পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিশ্বজগত সম্পর্কে অভিনব উপলব্ধি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জ্ঞানের জগতে সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি অতিক্রম করে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস আবশ্যক। মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং ক্ষেত্রবিশেষে (যথা– বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায়) বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে পারে সেই আলোকে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নিয়মানুসারে চালিত হতে হবে।

## উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১. কার্যকরভাবে বিশ্বমানের শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানো এবং মানবিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দান।
২. অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তাদান করা।
৩. পাঠদান পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের বাস্তবতাকে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা সনাক্ত করা ও সমাধান বের করা।
৪. নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।
৫. আধুনিক ও দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে কার্যকর পরিচিতি ঘটানো।
৬. জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি।
৭. জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী হতে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি।
৮. মেধার বিকাশ এবং সৃজনশীল নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবন।
৯. জ্ঞান, সৃজনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টি।

## প্রকৌশল শিক্ষা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে তো বটেই, আমাদের সমাজেও সাধারণ মানুষের জীবনে সকলক্ষেত্রেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান এবং এগুলোর প্রয়োগ হয়ে পড়েছে একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে সামাজিক জীবনযাত্রার পটপরিবর্তন হচ্ছে এবং সমাজ জীবনের কার্যধারাতেও আসছে গতিশীল পরিবর্তন। একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৌশল বিষয়ে শিক্ষাক্রম অনেক বদলে যাবে। প্রকৌশল শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো– সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবধর্মী, দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা যাতে তারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন। সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া যাতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ায় প্রকৌশলীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।

## চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

একটি সুস্থ সবল জনগোষ্ঠীই শুধু দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এজন্যে প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতা, রোগ প্রতিরোধমূলক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং যথাযথ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা। সেলক্ষ্যে যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে হবে। একদিকে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে অন্যদিকে তারা যেন সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. আপামর জনগণের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্তমানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য জনশক্তি গড়ে তোলা।

২. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সরকারিভাবে সকলের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল তৈরি করা।

৩. চিকিৎসা পেশা অন্যান্য পেশার তুলনায় স্পর্শকাতর এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্ট/অসুস্থতা তথা জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে জড়িত হওয়ায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী যেন সংবেদনশীল, সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হন সে লক্ষ্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল উন্নতির সুফল দেশের জনগণের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা এবং এঁদের সবাইকে সমাজের ও মানব সেবায় অনুপ্রাণিত করা।

৫. দেশবাসীর ব্যাধি ও চিকিৎসা সমস্যাবলীর মোকাবিলায় উপযুক্ত চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৬. চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করে এ দেশের স্থানীয় রোগ ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

### বিজ্ঞান শিক্ষা

বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে অনুধাবন করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রহস্যকে বিজ্ঞান উন্মোচন করে যাচ্ছে। এটি একদিকে মানবজাতির অজানাকে জানার কৌতূহলকে পূরণ করে, অন্যদিকে বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞান প্রতিনিয়তই নানা ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারের ভেতর দিয়ে মানব সভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শুধুমাত্র যথাযথ বিজ্ঞান শিক্ষাই একটা জাতিকে দ্রুত তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞান সাধনা এবং সৃজনশীলতায় তারা আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে।

২. বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মানবিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের একটি যে অন্যটির পরিপূরক এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।

### তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা

তথ্যপ্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করে সর্বক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা এনে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করার ক্ষেত্রেও তথ্যপ্রযুক্তি অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহসহ সম্ভাবনাময় রপ্তানিখাত হিসেবে সফটওয়্যার, ডাটা প্রসেসিং বা কলসেন্টার জাতীয় service industry বিকাশে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. উপর্যুক্ত কর্মযজ্ঞের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মান ও গুণসম্পন্ন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির প্রচেষ্টা চালানো।

২. তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটার বিজ্ঞানের মাঝে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ।

### ব্যবসায় শিক্ষা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অবদান অপরিসীম। শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখাসমূহের সমন্বিত ব্যবস্থাকে ব্যবসায় শিক্ষা বলে এই নীতিমালায় অভিহিত করা হচ্ছে। এ শাখায় শিক্ষা যথার্থভাবে আয়ত্ত করতে পারলে চাকরি এবং চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসায়কে আত্মকর্মসংস্থান ভিত্তিক জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে বাজার অর্থনীতির প্রচলন, বিশ্ববিস্তৃত পণ্যের বাজার এবং তীব্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও তার সহায়ক কার্যাবলি

প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে পরিগণিত। তাই বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব ও চাহিদা অতি উঁচু পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিভিন্ন স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা।
২. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।
৩. একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করা।
৪. আর্থিক, ব্যবসায়িক ও কর্মী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে সহায়তা করা এবং কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপক সৃষ্টি করা।
৫. শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে ঝরে পড়লে অর্জিত শিক্ষা দ্বারা আত্মকর্মসংস্থানের পথ সুগম করা।
৬. ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, বীমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত ডিগ্রি অর্জনের পথ সুগম করা।

## কৃষিশিক্ষা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। তাই উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কৃষি উন্নয়ন ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কৃষি একটি ফলিত বিজ্ঞান। কৃষি উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশের শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও বনসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। উচ্চতর কৃষিশিক্ষা বলতে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল, কৃষি অর্থনীতি ও মৎস্য বিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়ন ও উচ্চতর গবেষণা বোঝায়। কৃষি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. দেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দেশের পরিবেশগত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন।
২. জাতীয় উন্নয়নে কৃষিনির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
৩. প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে দেশের স্থলজ ও জলজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
৪. জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ব্যাপক অভিঘাত মোকাবিলা করে কৃষি উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য জোরদার গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ। কৃষিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে উপলব্ধি করার জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সচেতনতা সৃষ্টি।
৫. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অপুষ্টি দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচন।

## আইনশিক্ষা

আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার বাংলাদেশের সকল নাগরিকের এবং বাংলাদেশে অবস্থানকারী সকল ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধান অনুযায়ী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ও দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইনশিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। দেশে ন্যায়বিচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্যও সঠিক ও যুগোপযোগী আইনশিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আইনশিক্ষার দুটি দিক রয়েছে তা হলো– পেশাগত ও ব্যবহারিক। দেশের প্রচলিত আইনশিক্ষায় এ দুটি দিকের কোনোটারই সুষ্ঠু বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আইনশিক্ষার মান যেমন নানা কারণে নিম্নমুখী হচ্ছে তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর কল্যাণকর ফলাফল সব সময় লক্ষিত হচ্ছে না। তাই আইন শিক্ষার সার্বিক পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আইন শিক্ষার্থীরা যাতে আইনের শাসন, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং দেশের অভ্যন্তরে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে পারে সে লক্ষ্যে আইনশিক্ষাকে অধিকতর বিশ্লেষণধর্মী ও প্রয়োগমুখী করা হবে।

## নারীশিক্ষা

দেশ ও সমাজ উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে এ দেশের সর্বস্তরে ব্যাপক সংখ্যক নারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীশিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশুযত্ন ও ঘরকন্নার

কাজে সীমাবদ্ধ রেখে জাতীয় উন্নয়নে নারীকে নিষ্ক্রিয় রাখার বিরাজমান প্রবণতা দূর করা হবে। সার্বিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। নারীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা এবং সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা।
২. সকল পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বুদ্ধ করা ও দেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩. বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে কাজে নিয়োজিত হয়ে এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধনে ভূমিকা পালন করা।
৪. যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরসন এবং নারীর অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন ও তার সম-অধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় নারী যাতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন তার উপযোগী করে নারীকে গড়ে তোলা।

## কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা

একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্য সচেতন সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরি। এ শিক্ষার অন্তর্গত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও হস্তশিল্প, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য বা অঙ্গবিক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মন ও মননকে বিকশিত করে এবং তার চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে। দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন এর মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়, তেমনি বিভিন্ন দেশের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করা যায়। এ শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের একদিকে চিত্তোৎকর্ষ সাধন করা যায়, অন্যদিকে এই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

## বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী

ক. **প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা :** বিভিন্নভাবে সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত শিশুদের আওতায় পড়ে দৃষ্টি, শ্রবণ, শরীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধিত্বের মাত্রানুসারে এদের মৃদু প্রতিবন্ধী, মাঝারি প্রতিবন্ধী ও গুরুতর প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবন্ধিত্বের ধরন ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা হবে, তবে প্রতিবন্ধিত্বের গুরুতর মাত্রার কারণে যাদেরকে এভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর হবে না তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

খ. **স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা :** বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের একটি অবহেলিত অংশ স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা। শিক্ষিত জাতিগঠনে সাধারণ শিক্ষার মতো স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটোকে বাদ দিলে সাধারণ শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না। শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে তারা শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী হবে, তারা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিখতে সমর্থ হবে। সময়ানুবর্তিতা শারীরিক শিক্ষার অন্যতম পাঠ। শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এ উপায়ে তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বরেণ্য ক্রীড়াবিদ/খেলোয়াড়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে তাহলে বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে। খেলাধুলার উপযুক্ত পরিবেশ পেলে মাদকদ্রব্যের মতো ভয়াল অভিশাপ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারবে না।

গ. **স্কাউট, গার্লস গাইড ও বিএনসিসি :** এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দেশের শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণতরুণীদের যথাক্রমে স্কাউট ও গার্লস গাইড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল, সৎ, চরিত্রবান, কর্মোদ্যোগী, সেবাপরায়ণ, স্বাস্থ্য সচেতন, সর্বোপরি আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অবদান রাখা। স্কাউট ও গার্লস গাইড কর্মসূচি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে তরুণ-তরুণীদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল, আত্মসচেতন ও পরোপকারী হিসেবে গড়ে ওঠার গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দান করা।

ঘ. **ব্রতচারী :** অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের বিবেচনায় ব্রতচারী কার্যক্রম অনেকটা স্কাউটিং ও গার্লস গাইডিংয়ের অনুরুপ, তবে এটি এই দেশের সংস্কৃতির ভেতর থেকে উঠে এসেছে। এটি গীত ও নৃত্য–ভিত্তিক সুশৃঙ্খল একটি কার্যক্রম, যা বিদ্যালয়ে বিনোদন চর্চার বিষয় হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। ব্রতচারীর উদ্দেশ্যসমূহকে উপজীব্য করে ছড়া ও গীত

এর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। যাঁরা তা পরিবেশন করেন এবং যাঁরা শোনেন-দেখেন সবাইকে এই কার্যক্রম ব্রতচারীর উদ্দেশ্যসমূহের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে সহজেই। ব্রতচারী কার্যক্রম সিলেট, ঢাকা, খুলনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং জয়পুরহাটের অনেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। নীতিগতভাবে ব্রতচারী কার্যক্রমের স্বীকৃতি দেয়া হবে ও অন্যান্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এটি চালু করার জন্য উৎসাহ দেয়া হবে।

## ক্রীড়াশিক্ষা

ছাত্র-ছাত্রীসহ তরুণ-তরুণীদের পূর্ণবিকাশে শরীরচর্চা ও ক্রীড়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীলতা, সৃজনশীলতা এবং আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুস্থ দেহ ও মনের সমন্বয় মানব উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শরীর, মন ও মেধার সমন্বয়ে মানুষের জীবন পূর্ণতা লাভ করে। বাংলাদেশে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকলেও দেশে প্রচলিত ক্রীড়া ও শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষে। উল্লেখ, বর্তমানে ক্রীড়াশিক্ষা ও এক্ষেত্রে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এদেশে ক্রীড়াশিক্ষা সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার সভ্যতার দর্পণ বলে বিবেচিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগত মান ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রাণস্পন্দনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। দেশের নাগরিকদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজলভ্য করার দায়িত্ব হলো গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের। এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

## পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপিত হয়। শিক্ষার্থীর আচরণের যে দিকগুলো তার সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষাবিদগণ চিহ্নিত করছেন সেগুলো হলো জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত, অনুভূতি সম্পর্কিত ও মনন সম্পর্কিত। এই তিন প্রকার আচরণের মধ্যে আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পথমটি মূল্যায়ন করা হয়। এটি আরো কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর অন্য দুটি দিকও যাচাই করার জন্য যথাযথ নিয়মনীতি তৈরী করা আবশ্যক। পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## শিক্ষার্থীকল্যাণ ব্যবস্থা ও নির্দেশনা

অনেক সময় বহু সমস্যার আবর্তে অনেক শিক্ষার্থী অত্যাচারিত, বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, ফলে অনেকের জীবন নষ্ট হয়। তাই শিক্ষার্থী নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি কার্যকরভাবে প্রবর্তন করা হবে। তা করা হলে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার এবং শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার পরিবেশ উন্নত করা যাবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

## শিক্ষার্থী ভর্তি

একজন শিক্ষার্থীকে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে তাকে তার মেধা ও মননের উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর আঞ্চলিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তে তার মেধা ও প্রবণতা যেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির মাপকাঠি হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। কোনো কোনো স্কুলে ভর্তি করার জন্যে কোমলমতি শিশুদের নানারকম তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করে প্রথম শ্রেণিতেই বিষয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা হবে। প্রাথমিকউত্তর সকল পর্যায়ে ভর্তির জন্য নীতিমালা তৈরি করা হবে এবং সেগুলো অনুসরণ করা হবে। প্রসঙ্গত যে কোনো পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিচিতিতে মাতা-পিতা উভয়ের নাম অথবা আইনগত অভিভাবকের নাম উল্লেখ করা হবে এবং প্রাথমিক পরীক্ষা পাসের সনদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এদের নাম থাকবে।

### শিক্ষক প্রশিক্ষণ

সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগপোযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা। দেশের প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর র্নিভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারী। তাই আশানুরূপ ফলফাভ হচেছ না। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ৫টি এইচএসটিটিআই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী নয়। তাই প্রশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করা হবে।

### শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

সামাজিক বাস্তবতা সামনে রেখে সকল স্তরের ও ধারার শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা এবং দায়-দায়িত্বের বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করে তা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়টির দু'টি বিশেষ দিক রয়েছে– শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা শুধুমাত্র সুবিন্যস্ত বাক্য গাঁথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকৃত অর্থে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া না হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের আত্মপ্রত্যয়ী, কর্মদক্ষ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এক একজন সফল অবদানকারী হিসেবে গড়ে তোলা জরুরি। এজন্য শিক্ষকদের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, শিক্ষাখাতকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাপ্ত বৈদেশিক বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ শিক্ষকদের দেওয়া হবে। আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হবে। প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, মর্যাদা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ জরুরি। তাদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা মূল্যায়নের অব্যাহত ব্যবস্থা থাকবে।

### শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্ক্ষিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় তাই পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করা হবে। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হবে। আর সেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হবে পাঠ্যপুস্তক। পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হবে যে প্রকৃত শিক্ষা যেন জীবনঘনিষ্ঠ হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে এবং চিন্তাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হয়।

### শিক্ষা প্রশাসন

শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসনের ওপর। শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন এবং নাগরিকগণের জন্য শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য যথাযথ কর্মসূচি এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রশাসনকে আধুনিকায়ন প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, গতিশীল, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

## সারসংক্ষেপ

একটা জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যপূরণে শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। তাই শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। স্বাধীনতার পরপরই একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত এ খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিশন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৯৭৪ সালে গণমুখী আধুনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ণ করে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সময়ের প্রয়োজনে এটি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় যা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ নামে প্রজাতন্ত্রের অনুমোদন লাভ করে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিশীল নেতৃত্বদানে উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী কুসংস্কারমুক্ত, অসম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসহ মোট ২৮টি বিষয় এবং ২টি সংযোজনীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে আলোচিত ২৮টি বিষয় হলো– ১) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ২) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, ৩) বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ৪) মাধ্যমিক শিক্ষা, ৫) বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, ৬) মাদরাসা শিক্ষা, ৭) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, ৮) উচ্চশিক্ষা, ৯) প্রকৌশল শিক্ষা, ১০) চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, ১১) বিজ্ঞান শিক্ষা, ১২) তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, ১৩) ব্যবসায় শিক্ষা, ১৪) কৃষি শিক্ষা, ১৫) আইনশিক্ষা, ১৬) নারীশিক্ষা, ১৭) কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা, ১৮) বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্লস গাইড এবং ব্রতচারী, ১৯) ক্রীড়াশিক্ষা, ২০) গ্রন্থাগার, ২১) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, ২২) শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা, ২৩) শিক্ষার্থী ভর্তি, ২৪) শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ২৫) শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব, ২৬) শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক, ২৭) শিক্ষা প্রশাসন এবং ২৮) শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ শিক্ষার কয়টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে?
ক) ২০ খ) ২৫
গ) ৩০ ঘ) ৩৫

২। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা কোন শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েচে?
ক) পঞ্চম শ্রেণি খ) ষষ্ঠ শ্রেণি
গ) সপ্তম শ্রেণি ঘ) অষ্টম শ্রেণি

৩। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কত?
ক) ১ : ৩০ খ) ১ : ৪০
গ) ১ : ৫০ ঘ) ১ : ৬০

৪। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো–
i. শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক চরিত্র গঠন
ii. প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান
iii. প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী কৃষিশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো–
i. দেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি
ii. জাতীয় উন্নয়নে কৃষি নির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
iii. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-১০.৫ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ (Bangladesh Population Policy 2012)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৫.১ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির রূপকল্প কী তা বলতে পারবেন।
১০.৫.২ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারন।
১০.৫.৩ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.৫.৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যা কার্যক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম অঙ্গীকার হলো সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দেশের মানুষের এ সকল সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে আসছে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৭৬ সালে একটি জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে ২০০৪ সালে আরও একটি জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করা হয়। ২০০৪ সালের জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য ছিল ২০১০ সালের মধ্যে নিট প্রজনন হার-১ অর্জন করা। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় কর্মসূচিতে গতিশীলতা আনার জন্য জনসংখ্যানীতিকে হালনাগাদ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয় জাতীয় জনসংখ্যানীতি ২০১২।

### জাতীয় জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করার যৌক্তিকতা

২০১১ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ। এই জনসংখ্যা প্রতিবছর ১৮-২০ লাখ বাড়ছে। ফলে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল প্রকার সেবা ও অবকাঠামোর ওপর প্রচন্ড চাপ বাড়ছে। তাই দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি ও কৌশলসমূহকে যুগোপযোগী করা অপরিহার্য।

### রূপকল্প

বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

### উদ্দেশ্যসমূহ

১. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার ৭২% এ উন্নীত করে মোট প্রজনন (TFR) হার ২.১ এ হ্রাস করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে নীট প্রজনন হার ১ (NRR=১) অর্জন করা;
২. পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করে সক্ষম দম্পতিদের কাছে পদ্ধতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং দরিদ্র ও কিশোর কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমন ও এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কাউন্সেলিং সেবাকে প্রাধান্য দেয়া;
৩. মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করা এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৪. নারী-পুরুষের সমতা (Gender equity) ও নারীর ক্ষমতায়ন (Women's empowerment) নিশ্চিত করা এবং পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমে লিঙ্গবৈষম্য (Gender discrimination) নিরসনে কর্মসূচি জোরদার করা;

৫. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে সম্পৃক্ত করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
৬. সকল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য সহজলভ্য করা।

## জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে মুখ্য কৌশলসমূহ

### ১. গ্রহীতামুখী সেবা

গ্রহীতামুখী সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেবাকেন্দ্রিক ব্যবস্থা ও বাড়ি বাড়ি সেবাকে জোরদার করা এবং একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা :

(ক) বিদ্যমান জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সেবাকেন্দ্রসহ স্যাটেলাইট ও কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা;
(খ) বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহীতা সেবা নিশ্চিত করা;
(গ) সকল সক্ষম দম্পতি বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাড়ি বাড়ি সেবা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং মাঠ পর্যায় থেকে রেফারেল ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এছাড়া ই-প্রজনন সেবা প্রচলন করা;
(ঘ) নব-দম্পতি, কিশোর-কিশোরী ও এক বা দুই সন্তানের দম্পতিদের অগ্রধিকারভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় নিয়ে আসা;
(ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও সেবার অপূর্ণ চাহিদা সংলিত দম্পতিদের চিহ্নিত করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
(চ) প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সেবা প্রদানকারীদের সহায়তায় সকল প্রসব সেবা নিশ্চিত করা;
(ছ) সকলের জন্য এবং বিশেষ করে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য যৌনরোগ, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় তথ্য ও সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
(জ) বসতবাড়ীতে ফলমূল ও শাক-সবজি উৎপাদনে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ভিটামিন-এ এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সরবরাহ নিশ্চিত করা। শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের অপুষ্টি রোধ করা এবং এ বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম বৃদ্ধি করা;
(ঝ) সকল মহিলা ও শিশুকে টিকাদান নিশ্চিত করার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
(ঞ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে দিবা-রাত্রি সেবা নিশ্চিত করা। সকল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসক, পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার, ফার্মাসিস্ট, এমএলএসএস ও আয়া নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মিডওয়াইফ হিসেবে তৈরি করা;
(ট) সকল সেবাকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও যন্ত্রপাতির নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবাদান কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর প্রাপ্যতা সহজলভ্য করা এবং কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
(ঠ) অবহিতকরণ ও স্বেচ্ছায় সম্মতির (Informed choice and voluntarism) ভিত্তিতে সকল সক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা;
(ড) দুর্যোগ বা জরুরি প্রয়োজনে বিশেষায়িত (Specialized) জরুরি প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

### ২. নগর স্বাস্থ্যসেবা

শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকার বস্তি, ভাসমান ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা। বিশেষ করে শহরে গ্রহীতামুখী সেবা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ করা।

**৩. এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা কর্মকৌশল**

বাংলাদেশের বর্তমান স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, সেবা গ্রহণে এলাকাভিত্তিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষার অগ্রগতির তারতম্য রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়ভাবে বৃহত্তর পরিকল্পনা ও কর্মকৌশলের পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক এবং অপেক্ষাকৃত কম অগ্রগতিসম্পন্ন এলাকায় বিশেষ কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ করা :

(ক) স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ও লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থানীয়ভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা;

(খ) দেশের উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীকে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উপকূলীয় এলাকার বাস্তবতার আলোকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(গ) স্থানীয়ভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকাণ্ডের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচির সমন্বয় করা ও প্রয়োজনে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঘ) স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সক্ষম দম্পতিদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ভিত্তিতে গ্রহীতা বিভাজন (Client segmentation) করা ও উপযুক্ত সেবা নিশ্চিত করা।

**৪. আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ (BCC) কার্যক্রম**

জনসংখ্যা, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য কার্যক্রমে আচরণ পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা :

(ক) "দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়"–এ শ্লোগানকে জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা;

(খ) মা ও শিশুমৃত্যু হ্রাস ও পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা এবং বিদ্যমান সুবিধা ও অসুবিধাসমূহসহ অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব উল্লেখপূর্বক এগুলোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচারণা জোরদার করা;

(গ) প্রসব-পূর্ববতী, প্রসবকালীন এবং প্রসব-পরবর্তী সেবা গ্রহণে আচরণ পরিবর্তনে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঘ) প্রজননতন্ত্র ও যৌনরোগের সংক্রমণ, এইচআইভি/এইডসসহ যাবতীয় সংক্রামক ব্যাধি রোধকল্পে আচরণ পরিবর্তনমূলক প্রচারণায় সহায়তা করা;

(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং অন্যান্য গণযোগাযোগ মাধ্যমে জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্যসহ বহুমুখী এবং হৃদয়গ্রাহী জরুরি বার্তা নিয়মিত প্রচার নিশ্চিত করা;

(চ) লিঙ্গভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ ও এর ব্যবহারের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করা;

(ছ) তৃণমূল হতে জেলা পর্যায় পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন, সরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন, মহিলা নেতৃবৃন্দ, নবদম্পতি ইত্যাদির গ্রুপভিত্তিক বিষয় নির্বাচনপূর্বক অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা;

(জ) অঞ্চলভিত্তিক ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বার্তা তৈরি ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলোর সহায়তায় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উল্লিখিত বার্তা প্রচার নিশ্চিত করা;

(ঝ) বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক তাদের প্রচারিত বিজ্ঞাপনে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রচার করা। বিশেষ করে সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে বেসরকারি রেডিও ও টেলিভিশনে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রচারণার ব্যবস্থা করা;

(ঞ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

### ৫. কিশোর-কিশোরীকল্যাণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি কিশোর-কিশোরী (Adolescent) এবং কিশোরীদের প্রতি তিন জনের একজন হয় মা অথবা গর্ভবতী। আইনগতভাবে ১৮ বছরের আগে বিয়ের বিধান না থাকলেও কিশোর-কিশোরীদের দুই-তৃতীয়াংশের বিয়ে ১৮ বছরের পূর্বেই হচ্ছে। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং নিবন্ধনকারীদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা। আরো যেসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ নীতি অগ্রসর হবে তা হলো :

(ক) বিলম্বে বিয়ে ও যথেষ্ট বিরতিতে সন্তান নেয়ার পক্ষে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করা;
(খ) অবিবাহিত মহিলাদের গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; ঋণ সুবিধা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ করা;
(গ) স্কুল ও কলেজে কিশোর-কিশোরীদের জন্য মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক অবহিতকরণ সভা, রচনা এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির আয়োজন করা;
(ঘ) কিশোর-কিশোরীদেরকে স্বাস্থ্য ও জীবনমুখী দক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা এবং বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে পিতা-মাতা, শিক্ষক ও সেবা প্রদানকারীদের সচেতন করা;
(ঙ) কিশোর-কিশোরীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

### ৬. বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ

জনসংখ্যা কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা :

(ক) অধিভুক্তিকৃত এনজিও (বেসরকারি সংস্থা) কে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সেবা বঞ্চিত এলাকাসমূহে কাজ করতে উৎসাহিত করা;
(খ) সরকারের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের সহায়তায় কিংবা যৌথ উদ্যোগে কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং যথাসম্ভব স্বল্প মূল্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
(গ) সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের মধ্যে আলোচনা ও সমন্বয় জোরদার করা এবং সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে কার্যক্রম গ্রহণ করা;
(ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বেসরকারি ও ব্যক্তিখাত প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর "ফোকাল পয়েন্ট" হিসেবে কাজ করা।

### ৭. নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী–পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব

নারী-পুরুষের অংশীদারিত্ব ও সমতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীসমাজ এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। কিছু কিছু পরিবারে মেয়েশিশুরা পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেশিশুদের চেয়ে কম সুযোগ পাচ্ছে। সমাজে গভীরভাবে গ্রথিত কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারী-পুরুষের মাঝে অনেক বৈষম্যমূলক আচরণের সৃষ্টি হয়েছে। মহিলারা এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম পারিশ্রমিকের কাজে নিয়োজিত আছে এবং পুরুষের চেয়ে কম আয় করছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা সহজে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল গ্রহণ করা :

(ক) সরকারি ও বেসরকারি সকল কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জেণ্ডার সেন্সিটিভ (Gender sensitive) কর্মকৌশল প্রণয়ন করা;
(খ) উপযুক্ত শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করাসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
(গ) শহর ও গ্রামের কর্ম এলাকায় দিবা-যত্ন কেন্দ্রের (Day care centre) ব্যবস্থাসহ শিশুযত্নের প্রয়োজনীয় সহায়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

(ঘ) নারী উন্নয়নে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহকে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;
(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সকল সমাজকল্যাণ ও বিভিন্ন ঋণদান কর্মসূচিতে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়কে সম্পৃক্ত করা;
(চ) নারী ও শিশু পাচারসহ সকল ধরনের নির্যাতন ও যৌন নিপীড়ন বন্ধ করা;
(ছ) নারীদের পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুরুষদের আরো দায়িত্বশীল করে তোলার লক্ষ্যে সচেতনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;
(জ) স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

**৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন**

সকল পর্যায়ের সেবাকেন্দ্রে মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে জনংখ্যা নীতি কাঠামোর আওতায় সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনার করার জন্য দক্ষ জনশক্তি অপরিহার্য বিধায় নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা :

(ক) সরকারি পর্যায়ে বর্তমান জনসংখ্যা অনুপাতে উন্নত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের সংখ্যা নির্ধারণ, নিয়োগ ও তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং পাশাপাশি নিয়মিত/চাকরিরত অবস্থায় (In-service) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
(খ) সময়ে সময়ে নিয়োগবিধি হালনাগাদ করা, ক্যারিয়ার প্ল্যান (Career plan) তৈরি এবং সঠিক সময়ে পদোন্নতির পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
(গ) বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহকে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান করা এবং তাদের মাধ্যমে সরকারি এবং বেসরকারি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা;
(ঘ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/ ইনস্টিটিউট সমূহে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি নিশ্চিত করা। সকল পর্যায়ের একাডেমিক ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে চাকরিপূর্ব (Pre-service) প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

**৯. আইনগত ব্যবস্থা**

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা :

(ক) জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে একক সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে কাজের দ্বৈততা পরিহার করা;
(খ) জন্মনিবন্ধন (Birth registration) তথ্য অনুযায়ী সকল শিশুর নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা, উপযুক্ত বয়সে শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা এবং কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে (Early marriage) রোধ করা। জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কুলে ভর্তির সময় এবং বিবাহ নিবন্ধনের সময় জন্মসনদপত্র ব্যবহার করা;
(গ) বিদ্যমান আইনের আলোকে সকল নাগরিকের বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক ও নিশ্চিত করা। বিবাহ নিবন্ধনের পূর্বে জন্মনিবন্ধন সনদপত্র অনুযায়ী বয়স নিশ্চিত করা।

**১০. সামাজিক ব্যবস্থা**

**বয়স্ক, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণমূলক সেবা :**

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে দরিদ্র, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী। এসব দরিদ্র, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার (Social security/safety net) ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

**১১. জনসংখ্যা ও পরিবেশ**

শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাসন স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুযোগ এবং বায়ু দূষণ প্রতিনিয়ত পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলছে। এসব সমস্যা সমাধানে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা :

(ক) গ্রাম ও শহরাঞ্চলে কৃষিজমি নষ্ট করে আবাসন ও শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা নিরুৎসাহিত করে পরিকল্পিত আবাসন ও শিল্প-কারখানা স্থাপন করা;
(খ) গ্রামে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি (Social afforestation program) শক্তিশালী করা এবং শহর ও নগরে দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
(গ) সকল নাগরিকের জন্য আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা এবং আর্সেনিকমুক্ত পানির বিকল্প উৎস চিহ্নিত করা;
(ঘ) যথাযথ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে যানবাহনসৃষ্ট দূষণ কমিয়ে আনা;
(ঙ) সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বস্তি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা;
(চ) পৌরসভা/সিটি করপোরেশন কিংবা অন্যান্য পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শহর, নগর ও হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা;
(ছ) গ্রাম এলাকায় খাল ও পুকুর খননের কার্যক্রমকে সহায়তা এবং ভূমিক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা এবং নদী ও জলাশয় ভরাট করে আবাসন ও শিল্পস্থাপন নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
(জ) জনসংখ্যা ও পরিবেশকে সর্বদাই সামাজিক নিরাপত্তার দৃষ্টিতে বিবেচনায় রেখে কর্মকৌশল গ্রহণ করা।

### ১২. নগরমুখিতা নিরুৎসাহিত করা ও পরিকল্পিত নগরায়ন

গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে গ্রাম ও শহরের নাগরিক সুবিধাসমূহের ব্যবধান কমিয়ে আনা ও গ্রামে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা।

### ১৩. সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার

আদমশুমারি, জনমিতিক জরিপ ও বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল জনসংখ্যা তথ্যের মূল উৎস। দেশে নিয়মিত আদমশুমারি, জরিপ ও গবেষণা পরিচালিত হলেও প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং এর পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকৌশলের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা :

(ক) জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে নিয়মিত জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা করা;
(খ) জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি গবেষক, নীতি-নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, ব্যবস্থাপক এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
(গ) লিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং জনসংখ্যানীতির কার্যকর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার জন্য সূচক নির্ধারণ করা;
(ঘ) সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারে আধুনিক ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সকল প্রকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা।

### ১৪. প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ

মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ (dccentralization) এবং সকল কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ (community participation) অত্যাবশ্যক। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা :

(ক) প্রশাসনিক ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনসংখ্যা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে সেবাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা;

(খ) চাহিদাভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে তার আলোকে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্টেকহোল্ডার ও সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মহিলা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(গ) প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহ/গঠন ও এর যথাযথ ব্যবহার করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের (উপজেলা ও ইউনিয়ন) কমিটিসমূহকে কার্যকর করাসহ ক্ষমতা প্রদান করা;

(ঘ) স্বচ্ছ প্রশাসন ও জনগণের অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা শক্তিশালী করা এবং কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলা প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা;

(ঙ) ইউনিয়ন ও মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাতৃমঙ্গল ক্লাব ও এ ধরনের সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা।

### ১৫. পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী আমদানি করে থাকে। দেশে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ-প্রণোদনা প্রদান এবং সকল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার (Contraceptive sccurity) জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বিশেষ করে, শ্রমঘন (Labour intensive) এলাকায় এ কাজে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় উপকরণাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা।

### ১৬. বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয়

সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় করে এ নীতি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়ন করা।

## জনসংখ্যা কার্যক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

**ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ কার্যক্রমে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। জেলা পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থিত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন– হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে। এ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের নীতি প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও পালন করবে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের সহায়তায় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়ন করবে। অধিকন্তু, জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের সচিবালয় হিসেবে এ মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করবে এবং পরিষদের নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতি এবং জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার কমিটিসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে।

**খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় :** জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যথা– বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিসিএস প্রশাসন একাডেমির শিক্ষাক্রমে অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ মন্ত্রণালয় বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

**গ) অর্থ মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় দেশের পরিকল্পিত জনসংখ্যা ও এর উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করবে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নেও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করবে।

**ঘ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী উন্নত মান বজায় রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা উৎসাহিত করার কার্যক্রম জোরদার করবে। এছাড়া বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও অপরাপর শিক্ষা

উপকরণে অধিক জনসংখ্যা ও এর ভয়াবহতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবন-দক্ষতা শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সময়োপযোগী করে অন্তর্ভুক্ত করবে। একইভাবে জনমিতি এবং জনসংখ্যা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোর্সের উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গবেষণা কার্যক্রমসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

**ঙ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী উন্নত মান বজায় রেখে প্রাথমিক পর্যায়ে পরিকল্পিত পরিবার, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা উৎসাহিত করার কার্যক্রম জোরদার করবে। এছাড়া বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও অপরাপর শিক্ষা উপকরণে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবন-দক্ষতা শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সময়োপযোগী করে অন্তর্ভুক্ত করবে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমে অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সমাজের সকল স্তরে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবে।

**চ) কৃষি মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে। এ মন্ত্রণালয় তার মন্ত্রণালয়াধীন সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কৃষিকাজে নিয়োজিত জনগণকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষক পরিবারের আয়-বৃদ্ধিকরণ ও দুই সন্তানের পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এছাড়া কাউন্সেলিং দ্বারা শহরমুখী গমন নিরুৎসাহিত করতে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

**ছ) তথ্য মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় সরকারি-বেসরকারি বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য মাধ্যমে স্বাস্থ্যশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য, নারী-পুরুষের সমতা, যৌনরোগ ও এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে তথ্য প্রচারে সময় ও সম্পদ বরাদ্দ করবে। পাশাপাশি এসব বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সকল শ্রেণির সংবাদপত্র ও বেসরকারি গণমাধ্যমকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে উৎসাহিত করবে।

**জ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারে। বিদ্যমান জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটি, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটি, ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কমিটি এবং ওয়ার্ড পরিবার পরিকল্পনা কমিটিকে সক্রিয় করে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে গতিময়তা (Momentum) আনা সম্ভব। উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যমান নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটিগুলোর সভা আয়োজন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রজনন স্বাস্থ্য ও নারী-পুরুষের সমতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মহিলা সমবায় সমিতিগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এ সমিতিগুলো সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন সম্পর্কে দেশব্যাপী প্রচারণাসহ সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করতে পারে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকাগুলোতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করতে পারে।

**ঝ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশন :** সরকারের নীতি-নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সামগ্রিকভাবে দেশের জনসংখ্যা প্রাক্কলন, প্রক্ষপণ ও উন্নয়ন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে এসব বিষয়কে সম্পৃক্ত করবে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে জনসংখ্যা সমস্যা নিরসন সম্বলিত উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করবে।

**ঞ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় :** মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচির আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে অধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এসব কেন্দ্র থেকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের জন্য জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় ভূমিকা রাখবে। এছাড়া এ মন্ত্রণালয় থেকে অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নিবন্ধনকৃত এনজিওদের জন্য জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

**ট) মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় :** মহিলাদের দক্ষতা-উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তার ব্যবস্থাকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং মহিলাদের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মহিলা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

**ঠ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় :** যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা আয়োজন করতে পারে। এ বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনে এ মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করতে পারে।

**ড) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় :** পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন করতে এ মন্ত্রণালয় কাজ করবে।

**ঢ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ধর্মীয় নেতা ও ইমামদের পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা এবং যৌনরোগ ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করতে পারে। এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকাশনায় পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

**ণ) ভূমি মন্ত্রণালয় :** আদর্শ গ্রাম, ছিন্নমূল ও বস্তি পুনর্বাসনসহ মন্ত্রণালয় পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যতথ্য ও সেবা কার্যক্রম চালু করবে।

**ত) শিল্প মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে গার্মেন্টসসহ শ্রমঘন (Labour intensive) কারখানাগুলোতে কর্মরত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যতথ্য ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে অবিবাহিত শ্রমিকদের বিলম্বে বিবাহে উৎসাহিত করা এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সহায়তা প্রদান করার দায়িত্ব পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

**থ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরে পরিকল্পিত আবাসন ও নগরায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে, যাতে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা যায়।

**দ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রমে জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে পারে।

**ধ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় ই-গভর্নেন্স কর্মসূচির ওয়েব-সাইটে জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

**ন) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদসগণকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং তাদের মাঝে এইচআইভি/এইডসসহ বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম অঙ্গীকার হলো সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দেশের মানুষের এসকল সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে আসছে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৭৬ সালে একটি জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে ২০০৪ সালে আরও একটি জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। ২০০৪ সালের জনসংখ্যানীতির উদ্দেশ্য ছিল ২০১০

সালের মধ্যে নিট প্রজনন হার-১ অর্জন করা। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় কর্মসূচিতে গতিশীলতা আনার জন্য জনসংখ্যা নীতিকে হালনাগাদ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয় জাতীয় জনসংখ্যানীতি ২০১২। ২০১১ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ। এই জনসংখ্যা প্রতিবছর ১৮-২০ লাখ বাড়ছে। ফলে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল প্রকার সেবা ও অবকাঠামোয় প্রচন্ড চাপ বাড়ছে। তাই দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি ও কৌশলসমূহকে যুগোপযোগী করা অপরিহার্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০১২ অনুযায়ী কোন সালের মধ্যে নীট প্রজনন হার-১ অর্জন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে?

ক) ২০১৫ খ) ২০১৭
গ) ২০১৯ ঘ) ২০২১

২। "দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়"– এটি কোন নীতির শ্লোগান?

ক) শিক্ষা নীতির খ) জনসংখ্যা নীতির
গ) শিশু নীতির ঘ) নারী উন্নয়ন নীতির

## পাঠ-১০.৬ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ (National Women Development Policy-2011)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৬.১ বাংলদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.৬.২ বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.৬.৩ বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।

### ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমণ্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালী কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। সকল ক্ষেত্রে নারীর সম-সুযোগ ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৭ সালে এদেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়ন, সম-অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার

লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পূনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

## জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

১. বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
২. রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৩. নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈকি, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
৪. নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
৫. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
৬. নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা;
৭. নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;
৮. নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;
৯. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা;
১০. নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা;
১১. নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা;
১২. রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
১৩. নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানি করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;
১৪. নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা;
১৫. নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা;
১৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
১৭. প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;
১৮. বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;
১৯. গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;
২০. মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা;
২১. নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা;
২২. নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

## জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম

### ক) নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

১. মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে যেমন– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সম-অধিকারী, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।
২. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৩. নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।
৪. বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৫. স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো ধর্মের, কোনো অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোনো বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করা।
৬. বৈষম্যমূলক কোনো আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক কোনো সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া।
৭. গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকুরিতে, কারিগরি প্রশিক্ষণে, সম-পারিতোষিকের ক্ষেত্রে, কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

৮. মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
৯. পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা, যেমন– জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকরির আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা।

**খ) কন্যা শিশুর উন্নয়ন**

১. বাল্য বিবাহ, কন্যা শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।
২. কন্যা শিশুর চাহিদা যেমন– খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করা ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।
৩. কন্যা শিশুর শারীরিক ও মানিসক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা।
৪. কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।
৫. কন্যা শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
৬. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন– রাস্তাঘাটে কন্যা শিশুরা যেন কোনোরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৭. কন্যা শিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করা।
৮. প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

**গ) নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ**

১. পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা।
২. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা।
৩. নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা।
৪. নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা।
৫. নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিতহারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৬. বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা।
৭. নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।
৮. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং ওসিসির কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নির্যাতনের শিকার নারীদের মানসিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
৯. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের সকল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবর্তনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১০. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
১১. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও যুবকদেরকে সম্পৃক্ত করা।

**ঘ) সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা**

১. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২. সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
৩. আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।

**ঙ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ**

১. নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসরণ করা।
২. নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত কন্যা শিশু ও নারী সমাজকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।
৩. কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা।
৪. মেয়েদের জন্যে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

**চ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি**

১. ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত অংশগহণ নিশ্চিত করা।
২. স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা।
৩. সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৪. নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা।

**ছ) জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ও সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ**

১. অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা।
২. অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
৩. নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচিতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা।
৪. সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলা।
৫. সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া।
৬. শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা।
৭. নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী, শ্রম বাজারে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সম-সুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।
৮. নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া।
৯. জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১০. সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহ, জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারীশ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।
১১. নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালনকক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**জ) নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ**

১. হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ে অন্তর্ভুক্ত করা, বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রণয়ন, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (ভিজিডি) অব্যাহত রাখা।

২. দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩. দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।
৪. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
৫. জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

**ঝ) নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন**

১. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা।
২. উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রধান করা।

**ঞ) নারীর কর্মসংস্থান**

১. নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।
২. চাকরি ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
৩. সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় চাকরি ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সম-সুযোগ প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
৪. নারী উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা।
৫. নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা।
৬. নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা। নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন ও জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হবে।

**ট) সহায়ক সেবা**

সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন– শিশুযত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নীত করা।

**ঠ) নারী ও প্রযুক্তি**

১. নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
২. উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদান মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৩. প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা।

**ড) নারীর খাদ্য নিরাপত্তা**

১. দুঃস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
২. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর শ্রম, ভূমিকা, অবদান, মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

**ঢ) নারী ও কৃষি**

১. কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর শ্রম ও অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষিশ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা।

২. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নারী কৃষিশ্রমিকদের সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।
৩. কৃষিতে নারী শ্রমিকের মজুরী বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমকাজে সমমজুরী নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৪. কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষক কার্ড, ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কৃষিশ্রমিকদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

**ণ) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন**

১. রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
২. নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
৩. রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
৪. নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।
৫. নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
৬. রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
৭. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৮. স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৯. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

**ত) নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন**

১. প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের ব্যবস্থা করা।
২. প্রশাসনিক, নীতি নির্ধারণী ও সাংবিধানিক পদে অধিকহারে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা।
৩. জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ/মনোনয়ন দেয়া।
৪. নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা।
৫. সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু রাখা।
৬. কোটার একই পদ্ধতি স্বায়ত্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য করা এবং বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এই নীতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা।
৭. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

**থ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি**

১. নারীর জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে যথা– শৈশব, কৈশোর, যৌবন, গর্ভকালীন সময় এবং বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি, সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।
২. নারীর জন্য প্রাথামিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা।
৩. মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করা।

৪. এইডস রোগসহ সকল ঘাতকব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষত গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৫. নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৬. জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।
৭. বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।
৮. উল্লেখিত সকল সেবার পরিকল্পনা, বিতরণ এবং সংরক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৯. পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
১০. নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মস্থলে কর্মক্ষমতা বাড়ানো ও মাতৃবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১১. মায়ের দুধ শিশুর অধিকার, এই অধিকার (ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু প্রসবের সময় থেকে পরবর্তী ৬ মাস ছুটি ভোগের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তাবয়ন করা এবং মাতৃত্বজনিত প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করা।

**দ) গৃহায়ন ও আশ্রয়**

১. পল্লী ও শহর এলাকায় গৃহায়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থায় নারী প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা।
২. একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবী নারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসান সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।
৩. নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন– হোস্টেল, ডরমিটরি, বয়স্কদের হোম, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা এবং গৃহায়ন ও নগরায়ন পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুঃস্থ ও শ্রমজীবী নারীর জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা করা।

**ধ) নারী ও পরিবেশ**

১. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচিতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও নারী প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
২. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩. কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করা।

**ন) দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা**

১. দুর্যোগ পূর্ববতী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২. নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুর পুনর্বাসন করা।
৩. দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা।
৪. দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫. দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় নারীদের বিপদ কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।
৬. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারীবান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।
৭. দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম যেন নারীর চাহিদা পূরণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৮. দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।

৯. গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যেমন– ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার রাখা।
১০. দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্ত নারীর কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

**প) অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম**

১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা।
২. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. অনগ্রসর নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

**ফ) প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম**

১. জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী নারীর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা।
২. প্রতিবন্ধী নারীদের সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।
৩. যে সমস্ত নারী অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, শুধুমাত্র সেসব নারীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করা।
৪. প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৫. প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও নির্ণয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং পারিবারিক পরিবেশে প্রতিবন্ধী নারীদের লালনপালন ও বিকাশের জন্য তাদের পরিবারকে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা।
৬. প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো নারী যেন জাতীয় নারী নীতির আওতায় কোনো প্রকার অধিকার, সুবিধা ও সেবাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবাসমূহ সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা।

**ব) নারী ও গণমাধ্যম**

১. গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা।
২. নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪. প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা।

**ভ) বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারী**

যদি কোনো নারী বিশেষ পরিস্থিতির কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হন তাহলে তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সহায়তা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

## জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব। সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে নারী উন্নয়ন প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে :

১. নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন– মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে।

এসব প্রতিষ্ঠানের জনবল ও সম্পদ নিশ্চিত করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত করা হবে। নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্যে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

৩. শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশুকল্যাণের নিমিত্ত সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তেনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

৪. নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। জেলা পর্যায়ে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নারী উন্নয়নকল্পে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

৫. তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ দলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে। সরকারি, বেসরকারি উৎস, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা হবে। উপরন্তু, তৃণমূল পর্যায়ের সকল সংগঠনের কার্যক্রমের স্থানীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্তির জন্যে উৎসাহিত এবং সহায়তা প্রদান করা হবে।

৬. গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের সকল স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা প্রদান করা হবে। সরকারি সকল কর্মকাণ্ডে তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৭. নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনার জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে। পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেখান থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

৮. ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৯. নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। এই সচেতনতা কর্মসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে- ১) আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদাহানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ, ২) মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং (৩) নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

১০. নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের

মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক/কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান প্রদান চলবে। ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

## সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালি কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সম অধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৭ সালে এদেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রনয়ণ করা হয়, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারীসমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়?

ক) ১৯৯৭ সালে খ) ১৯৯৯ সালে
গ) ২০০৪ সালে ঘ) ২০১১ সালে

২। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে কোন নীতিতে?

ক) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ খ) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
গ) জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ ঘ) জাতীয় জনসংখ্যানীতি ২০১২

৩। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুযায়ী কন্যা শিশুর উন্নয়নে–

i. বাল্যবিবাহ, কন্যা শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা
ii. কন্যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা
iii. কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং সকলক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-১০.৭ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ (National Child Policy 2011)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৭.১ শিশু কারা তা জানতে পারবেন।
১০.৭.২ বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.৭.৩ শিশু অধিকার বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.৭.৪ শিশু অধিকার বাস্তবায়নে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

## ১. ভূমিকা

শিশু জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ এ সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এ শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ বিধান প্রণয়ন করার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য এবং জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত হয় শিশু আইন ১৯৭৪, যা যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে শিশু আইন ২০১১ রূপে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রাসঙ্গিক সকল ক্ষেত্রে শিশুর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি সৎ, দেশপ্রেমিক ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যত্নশীল ও সক্রিয়। বাংলাদেশের ১৮ বছরের কম বয়সের জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ। সম্প্রসারিত টিকা প্রদান কার্যক্রমের (EPI) আওতায় শতকরা ৮৭ ভাগ শিশুকে আনা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে যা সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDG-3) পূরণ করেছে। বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

২০০৬ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদে প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্যান্য সকল শিশুদের সাথে সমতার ভিত্তিতে মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ভোগ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে। সনদে শিশুদের স্বার্থ বিবেচনায় প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশু নির্যাতন বন্ধ করা, বিশেষ করে কন্যা শিশুদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধ করা ও তাদের নিরাপত্তা বিধান করা অন্যতম লক্ষ্য। বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধিত পরিবর্তন, উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিত্য নতুন চাহিদা ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটির (CRC Committee) সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিশু নীতি যুগোপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে সময়োপযোগী ও আধুনিক একটি শিশু নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ বাংলাদেশের শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে একটি সুদূরপ্রসারী রূপকল্প। শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় সকল উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

## ২. সংজ্ঞা

**২.১ শিশু :** শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বুঝাবে। দেশের প্রচলিত কোনো আইনে এর ভিন্নতা থাকলে এই নীতির আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে সামঞ্জস্যবিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

**২.২ কিশোর কিশোরী:** কিশোর-কিশোরী বলতে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে বুঝাবে।

## ৩. পরিধি

জাতীয় শিশু নীতি বাংলাদেশের নাগরিক সকল শিশুর ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনভাবে প্রযোজ্য হবে।

## ৪. মূলনীতি

৪.১ বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ।

৪.২ শিশু দারিদ্র্য বিমোচন।

৪.৩ শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ।

৪.৪ কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ।

৪.৫ শিশুর সার্বিক সুরক্ষা ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ।

## ৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৫.১ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদন ও অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে বয়স, লিঙ্গগত, ধর্মীয়, জাতিগত, পেশাগত, সামাজিক, আঞ্চলিক ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় নির্বিশেষে সকল শিশু ও কিশোর-কিশোরীর জন্য মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সর্বোত্তম উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিত করা হবে।

৫.২ কন্যা শিশু এবং প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধা প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.৩ শিক্ষা ও শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের দেশ সম্পর্কে আগ্রহী ও সচেতন করে গড়ে তোলা হবে যাতে তারা সৎ, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে বিকাশ লাভ করতে পারে।

৫.৪ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শিক্ষার অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে শিশুদের একটি বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে দেশ ও বিশ্বের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়।

৫.৫ শিশুদের জন্য অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.৬ শিশু ও কিশোর-কিশোরীর জীবনকে প্রভাবিত করে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের মতামত প্রতিফলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.৭ শিশু অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

## ৬. শিশু অধিকার বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ

শিশুর নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা ও সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে :

### ৬.১ শিশুর নিরাপদ জন্ম ও সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণ

৬.১.১ সকল শিশুর নিরাপদ জন্ম গ্রহণ ও বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গর্ভবর্তী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিচর্যার মাধ্যমে শিশুর নিরাপদ জন্ম এবং বেড়ে উঠার ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রসূতিপূর্ব, প্রসূতিকালীন সময় ও প্রসূতি পরবর্তী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬.১.২ শিশুমৃত্যু রোধের ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.১.৩ মায়ের স্বাস্থ্য ও শিশুর যত্ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মজীবী মায়েদের জন্য বর্ধিত ছুটির ব্যবস্থা করা হবে।

৬.১.৪ কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর সুবিধা প্রদানে কর্মস্থলে দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.৫ শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.১.৬ কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

## ৬.২ শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন

শিশুর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিশুর– ক) পুষ্টি, খ) স্বাস্থ্য, গ) সার্বিক সুরক্ষা, ঘ) শিক্ষা এবং ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে :

৬.২.১ শিশুর পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি এবং National Plan of Action for Nutritional Intervention কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে ও জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত বিভিন্ন পুষ্টি কার্যক্রমের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে। পিতা-মাতাকে শিশুর পুষ্টি নিশ্চিতকরণে সচেতন ও উৎসাহিত করতে হবে।

৬.২.২ অনূর্ধ্ব দুই বছরের শিশুদের Protein-Energy Malnutrition (U2PEM) এবং Low Birth Weight (LBW) হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.২.৩ পথশিশুসহ সকল দরিদ্র শিশুদের পুনর্বাসন ও যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তাবলয় (Social Safety Net) সম্প্রসারিত করতে হবে। অতি দরিদ্র পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে শিশুরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে ও পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে।

## ৬.৩ শিশু স্বাস্থ্য

৬.৩.১ সকল শিশুর জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রসারিত টিকাদান কার্যক্রম (EPI), শৈশব-অসুস্থতার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা (IMCI) ও নবজাতক স্বাস্থ্য (NBH), প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌন সংক্রামক ব্যাধিসমূহ, HIV/AIDS প্রতিরোধসহ সময়োপযোগী অন্যান্য কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৬.৩.২ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী এবং চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ ধাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা হবে।

৬.৩.৩ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক মৌলিক তথ্য অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.৩.৪ শিশুর অধিকার এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় সম্পর্কে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়মিত অবহিতকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।

৬.৩.৫ শিশুদের জন্য নিরাপদ পানির উৎস সুলভ রাখা এবং লবণাক্ত উপকূলীয় এলাকা ও আর্সেনিকযুক্ত পানির এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ হবে।

৬.৩.৬ বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা স্থাপন ও পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

৬.৩.৭ কন্যা শিশু ও কিশোরীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে আলাদা পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

## ৬.৪ শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৫ বছর)

৬.৪.১ শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা হবে।

৬.৪.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করত এসব কেন্দ্রের শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.৪.৩ ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

## ৬.৫ শিশু শিক্ষা

৬.৫.১ প্রাথমিক শিক্ষা বিন্যামূল্যে প্রদান করা হবে। অর্থনৈতিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও অন্যান্য কারণে পশ্চাৎপদ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিক্ষাপোকরণসহ উৎসাহ প্রদানকারী বিশেষ সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

৬.৫.২ সকল শিশুকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার আওতায় আনা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৫.৩ আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যবিধানের লক্ষ্যে মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

৬.৫.৪ শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬.৫.৫ মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.৫.৬ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা এবং শাস্তির ফলস্বরূপ কোনো শিশু ও কিশোর-কিশোরীর যেন শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি না হয় সে লক্ষ্যে শিশুবান্ধব শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে।

৬.৫.৭ দেশের প্রচলিত বিভিন্ন ধারার শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে যাতে সকল ধারার শিক্ষার্থীরা সমভাবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ এবং দেশের উন্নয়ন চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়।

৬.৫.৮ শিশুদের শিক্ষার মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুবান্ধব উন্নত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৬.৫.৯ ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিশুদের জন্য শিশুতোষ বই-পুস্তক, পত্রিকা, সিনেমা ও সুকুমার কলা চর্চার সামগ্রী বিনামূল্যে বা ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে। নানা ধরনের সহজ ও আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল, ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৫.১০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক বা বিশেষ শিক্ষা যেমন– ক্রীড়া শিক্ষা, স্কাউট, গার্লস গাইড ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬.৫.১১ মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় স্ব-স্ব ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৬.৫.১২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালনা ব্যবস্থা আরও উন্নত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

## ৬.৬ শিশুর বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

৬.৬.১ শিশুর জন্য মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য খেলার মাঠ, খেলার সরঞ্জাম রাখা, এলাকাভিত্তিক শিশুপার্ক স্থাপন এবং নগর পরিকল্পনায় আবশ্যিকভাবে শিশুদের জন্য খেলার মাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দুর্যোগকালীন সময় ও তার পরবর্তীতে আশ্রয়কেন্দ্রে শিশুদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে।

৬.৬.২ শিশুরা যেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশাত্মবোধ, মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজ, দেশ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শ, জাতীয় চার নেতার জীবন ও কর্ম এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে এই উদ্দেশ্যে শিশুতোষ চলচ্চিত্র, নাটক, চিত্রকলা ও শিল্পের অন্যান্য শাখায় শিশুদের চর্চা ও অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

৬.৬.৩ প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং লাইব্রেরি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তাদের উপযোগী বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে।

## ৬.৭ শিশুর সুরক্ষা

৬.৭.১. সকল প্রকার সহিংসতা, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন এবং শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শিশুদের উপর সহিংসতা, নির্যাতন ও অবহেলা বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৬.৭.২ আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং বিচার প্রক্রিয়ায় শিশু অংশগ্রহণের অধিকার শিশু আইনের অধীনে নিশ্চিত করা হবে।

৬.৭.৩ শিশুদের মাদক ব্যবহার প্রতিরোধে উপযুক্ত পদক্ষেপ এবং মাদকাসক্ত শিশুদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.৭.৪ শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, প্রলোভন বা জোর করে জড়িত করা হবে না।

## ৬.৮ প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

৬.৮.১ জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৬.৮.২ প্রতিবন্ধী শিশুদের সমাজের মূলধারায় একীভূত থাকা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে।

৬.৮.৩ যে সমস্ত শিশু অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, শুধুমাত্র সেসব শিশুর জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা বিবেচনা করা হবে।

৬.৮.৪ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬.৮.৫ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও নির্ণয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং পারিবারিক পরিবেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের লালনপালন ও বিকাশের জন্য তাদের পরিবারকে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৬.৮.৬ প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো শিশু যেন জাতীয় শিশু নীতির আওতায় কোনো প্রকার অধিকার, সুবিধা ও সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবাসমূহ সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা হবে।

## ৬.৯ অটিস্টিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

৬.৯.১ অটিস্টিক শিশুদের অধিকাংশই স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, তাই তাদের সমাজে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৬.৯.২ অটিস্টিক শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা পদ্ধতি এবং উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬.৯.৩ অটিস্টিক শিশুদের যেহেতু সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বৈকল্য থাকে, সেহেতু তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করার জন্য পরিবার বা তার বাবা-মাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬.৯.৪ অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬.৯.৫ দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

## ৬.১০ শিশুর জন্ম নিবন্ধন

৬.১০.১ সকল শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা হবে।

৬.১০.২ জন্ম নিবন্ধন আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং এর প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

## ৬.১১ সংখ্যালঘু ও নৃতাত্ত্বিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

৬.১১.১ নৃতাত্ত্বিক ও সংখ্যালঘু শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৬.১১.২ নৃতাত্ত্বিক ও সংখ্যালঘু শিশু যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## ৬.১২ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুর সুরক্ষা

৬.১২.১ দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে।

৬.১২.২ দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.১২.৩ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় শিশুদের বিপদ কাটিয়ে উঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি শিশু ও তাদের অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৬.১২.৪ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো শিশুবান্ধব করা এবং পরিচর্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এতিম ও অসহায় শিশুদের জরুরি অবস্থায় সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা হবে।

৬.১২.৫ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম যেন শিশুর চাহিদা পূরণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও বিতরণ সামগ্রীর মধ্যে শিশুর খেলনা সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে করে শিশু দুর্যোগসংক্রান্ত ভয়ভীতি কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে।

৬.১২.৬ দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। সংক্রামক ও পানিবাহিত রোগ থেকে রক্ষা এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শিক্ষার সুবিধা পুনর্বহালের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.১২.৭ গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন– ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার রাখা হবে।

### ৬.১৩ শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ

শিশুর অধিকার ও উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে শিশুর উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমে তাদের মতামত ও অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

## ৭. কিশোর কিশোরীদের উন্নয়ন

৭.১ কিশোর কিশোরীদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.২ কিশোর কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.৩ কিশোর কিশোরীদের শারীরবৃত্তীয় ও আবেগজনিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে প্রজনন স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.৪ কিশোর কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা, বিয়ে, পাচার, বাণিজ্যিকভাবে যৌন কাজে বাধ্য করা এবং অন্যান্য সকল ক্ষতিকর কাজ থেকে রক্ষার মাধ্যমে তাদের সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

## ৮. শিশুশ্রম নিরসনের পদক্ষেপসমূহ

শিশুশ্রম পর্যায়ক্রমে নিরসন করা হবে। বাস্তবতার নিরিখে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে অনেক শিশু বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত। শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ এর আলোকে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে :

৮.১ ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুকে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে নিয়োগ হতে বিরত রাখতে হবে।

৮.২ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে দুঃস্থ ও নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থাপন্ন শিশুদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার পাশাপাশি মাসিক মাসোহারা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, যাতে করে তারা পড়াশুনা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে।

৮.৩ শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে শিশুকে যেন কোনো ধরনের অসামাজিক বা অমর্যাদাকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৪ কর্মস্থলে দৈনিক কর্মঘন্টা ও এর মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে কর্মবিরতি এবং বিনিময় মজুরী নিশ্চিত করা হবে।

৮.৫ শিক্ষা ও বিনোদন শিশুর মৌলিক অধিকার, আর তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মঘণ্টা অতিক্রান্ত হবার পর নিয়োগকর্তা উক্ত শিশু শ্রমিকের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবে।

৮.৬ কর্মকালীন সময়ে শিশু কোনো ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে বা অসুস্থ অনুভব করলে মালিকপক্ষ বা নিয়োগকর্তা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৮.৭ গৃহকর্মে বা অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শিশুদের প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৮ গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুরা সাধারণত সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিযুক্ত থাকে বিধায় তাদের লেখা-পড়া, থাকা-খাওয়া, আনন্দ-বিনোদন নিশ্চিত করা এবং তাকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো থেকে বিরত রাখতে হবে।

৮.৯ যে সকল প্রতিষ্ঠানে শিশুরা নিয়োজিত আছে, সেখানে শিশুরা যেন কোনোরূপ শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে হবে।

৮.১০ ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমসহ বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার করতে হবে।

৮.১১ শ্রমজীবী শিশুদের দারিদ্র্য চক্র হতে বের করে আনার লক্ষ্যে তাদের পিতামাতাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৮.১২ শ্রমজীবী শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য বৃত্তি ও আনুতোষিক প্রদান করতে হবে।

৮.১৩ শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পিতামাতা, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮.১৪ বাংলাদেশ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

## ৯. বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ

### ৯.১ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৯.১.১ শিশু অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। এই কমিটির মাধ্যমে মা ও শিশুর জন্য সর্বোত্তম উন্নয়ন ও সুরক্ষা, শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন এবং এতদসংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

৯.১.২ শিশুর উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত দপ্তরসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৯.১.৩ জাতীয় পর্যায়ে আইনের মাধ্যমে শিশুদের জন্য ন্যায়পাল (Ombudsman for Children) নিয়োগ দেয়া হবে। শিশুদের জন্যে ন্যায়পাল জাতীয় কর্মসূচিতে শিশুদের অধিকার ও কল্যাণ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে এবং জাতিসংঘ সনদ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে ভূমিকা পালন করবে।

৯.১.৪ প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উপ-সচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট ও আরেকজনকে বিকল্প ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হবে। এসকল কর্মকর্তা শিশু বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রতি তিন মাস অন্তর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

### ৯.২ সরকারি ও বেসরকারি কর্মকাণ্ডের সমন্বয়

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি উদ্যোগকে সুসংহত ও আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে। নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি কর্মকাণ্ডের সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে।

### ৯.৩ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

শিশুর উন্নয়ন ও অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ এবং কার্যক্রমের অগ্রগতির নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে।

### ৯.৪ গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা, চলমান উদ্যোগসমূহের যথাযথ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

### ৯.৫ শিশু নীতি বাস্তবায়নের জন্য অর্থসংস্থান

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশুদের উন্নয়ন একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রেক্ষিতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশু অধিকার বাস্তবায়ন ও শিশু উন্নয়নের বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

### ৯.৬ আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন

জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রণয়ন করা হবে।

## সারসংক্ষেপ

শিশু জাতি গঠনের মূলভিত্তি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ এ সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এ শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ বিধান প্রণয়ন করার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য এবং জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত হয় শিশু আইন ১৯৭৪ যা যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে শিশু আইন ২০১১ রূপে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি সৎ, দেশপ্রেমিক ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যত্নশীল ও সক্রিয়। বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। শিশু নির্যাতন বন্ধ করা, বিশেষ করে কন্যা শিশুদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধ করা ও তাদের নিরাপত্তা বিধান করা অন্যতম লক্ষ্য। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটির (CRC Committee) সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিশুনীতি যুগোপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে সময়োপযোগী ও আধুনিক একটি শিশু নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ বাংলাদেশের শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মানে একটি সুদূরপ্রসারী রূপকল্প।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ বিধান প্রণয়ন করার বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে?

ক) ২৮ (১) খ) ২৮ (২)
গ) ২৮ (৩) ঘ) ২৮ (৪)

২। শিশু নীতি ২০১১ অনুযায়ী কোন বয়সী শিশুদের জন্য বিকাশ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে?

ক) ৩-৫ বছর খ) ৪-৫ বছর
গ) ৫-৬ বছর ঘ) ৫-৭ বছর

৩। শিশুনীতি ২০১১ অনুযায়ী অটিস্টিক শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম–

i. সুনির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা পদ্ধতি এবং উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে
ii. তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করার জন্য পরিবার বা তার বাবা-মাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে
iii. শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.৮ সমাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব (Importance of Social Policy in Social Development)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৮.১ বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১০.৮.১ বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব

সামাজিক নীতি হলো সুপরিকল্পিত সামাজিক উন্নয়নের দিকনির্দেশক। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়ন সাধন, মৌল-মানবিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা হতে পরিত্রাণ লাভ এবং সন্তোষজনক জীবনমানের নিশ্চয়তা জাতীয়ভাবে প্রত্যাশিত বিষয়। আর এসকল বিষয়ের কার্যকর কর্মপন্থা নির্ধারণে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

**১. সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা :** দারিদ্র্য, জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা, অপরাধ ও সন্ত্রাস, কিশোর অপরাধ, জঙ্গিবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামী, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, যৌতুকপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, অর্থ পাচার, মাদকাসক্তি, মাদকপাচারসহ নানাবিধ সমস্যা বাংলাদেশের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজন সুচিন্তিত প্রতিকার ও প্রতিরোধ কার্যক্রম। আর এসকল ক্ষেত্রে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

**২. পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন :** বাংলাদেশের সমাজ জীবনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে জনগণের সামঞ্জস্য বিধানে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মূলত সামাজিক নীতি এক্ষেত্রে এমন সব দিকনির্দেশনা দেয়, যা সমাজের সকলের নিকট প্রত্যাশিত এবং যা সামাজিক গতিশীলতাকে ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি সামাজিক মূল্যবোধ আদর্শ, প্রথা ও মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে এবং পরিবর্তিত বিষয়কে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

**৩. অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ :** বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিশু, নারী, প্রবীণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধি, আদিবাসী, ভূমিহীন, বেকার যুবসমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠী অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর। এদের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণে কল্যাণধর্মী কার্যক্রম আবশ্যক। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি সুষ্ঠু কর্মপন্থা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসকল শ্রেণির ভাগ্যোন্নয়ন ও স্বার্থসংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

**৪. সামাজিক উন্নয়ন :** সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম যুগোপযোগী করা এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তুলে এগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**৫. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ :** বাংলাদেশের জনজীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার জন্য বিভিন্ন সামাজিক বিপর্যয়কর অবস্থা যেমন– দুর্ঘটনা, অকালমৃত্যু, বার্ধক্য, চাকুরিচ্যুতি, বেকারত্ব, অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ (বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস) ইত্যাদি দায়ী। এসকল অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন যথাযথ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। যথাযথ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রণয়নে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত সামাজিক নীতি। সুতরাং দেখা যায় বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

**৬. সম্পদের যথাযথ ব্যবহার :** সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে জনগণের প্রতিভা ও সামর্থ্যের বিকাশ ঘটিয়ে

দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং দেশজ বস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নধারাকে ত্বরান্বিত করতে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

**৭. সমাজসেবা ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন :** বাংলাদেশে মানবকল্যাণে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারিভাবে পারিচালিত সেবা কার্যক্রমের যথাযথ ব্যবহার ও মানোন্নয়নে প্রয়োজন যথাযথ সমন্বয় সাধন। এক্ষেত্রে কার্যকর সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সামাজিক নীতি যথাযথভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

**৮. সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ :** অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে প্রচলিত নানা কুপ্রথা, কুসংস্কার সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এক্ষেত্রে যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রয়োগ ঘটিয়ে সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

**৯. সম্পদের সুষম বন্টন :** সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সম্পদের সুসম বণ্টন একান্ত আবশ্যক। সম্পদের সুষম বন্টনের অভাবে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা ও অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, যা সমাজ উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীতা দূর করতে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

**১০. সামাজিক সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা :** সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন তথা সমাজের জনগণের মধ্যে গঠনমূলক ও সৌহার্দপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সামাজিক নীতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সমাজের সকলের মৌলিক স্বাধীনতা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন সাধন এবং সম্পদ ও অধিকারের যথাযথ বন্টনে সামাজিক নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## সারসংক্ষেপ

আধুনিক যুগে সমাজ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো সামাজিক নীতি। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র সুষ্ঠু নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান ও সামগ্রিক উন্নয়নে প্রয়াসী। সামাজিক নীতি বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সমাজসেবা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশক। সমাজের সার্বিক উন্নয়ন তথা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতি যে সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হলো– ১) সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা, ২) পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন, ৩) অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ, ৪) সামগ্রিক উন্নয়ন, ৫) সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ৮) কুসংস্কার দূরীকরণ, ৯) সম্পদের সুসম বণ্টন এবং ১০) সামাজিক সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশক কোনটি?

ক) সামাজিক নীতি খ) সামাজিক পরিকল্পনা
গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান

২। কোনো দেশের জনগণ যে সকল বিষয় প্রত্যাশা করে–

i. মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা
ii. সন্তোষজনক জীবনমানের নিশ্চয়তা
iii. সামাজিক সমস্যা হতে পরিত্রাণ লাভ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.৯ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা (Problems of Social Policy Implementation)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৯.১ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১০.৯.১ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা

পরিকল্পিত ও টেকসই সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের মতো উন্নয়শীল দেশগুলোতে সামাজিক পরিবর্তন সাধন ও সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও নানাবিধ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার কারণে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসকল বিষয় অন্তরায় হিসেবে কাজ করে তা হলো :

**১. সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব :** সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হলো পর্যাপ্ত সঠিক তথ্যের অভাব। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, জনগণের অনুভূত প্রয়োজন, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি এসকল বিষয়ে যদি পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য না পাওয়া যায় তাহলে সামাজিক নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

**২. সম্পদের সীমাবদ্ধতা :** জনকল্যাণমুখী নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পদের স্বল্পতা বা সীমাবদ্ধতা অন্যতম অন্তরায়। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি, আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্যহীনতা বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর সেবা ব্যবস্থায় সময়মতো প্রয়োজন মাফিক সাহায্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তাসহ নানাবিধ কারণে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

**৩. বিশেষজ্ঞের অভাব :** সামাজিক নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বের অবদান অনস্বীকার্য। জ্ঞান-দক্ষতায় সমৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ না থাকায় সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষজ্ঞের অভাব দেখা দেয় দুটি কারণে। প্রথমত, উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সুযোগের অপর্যাপ্তার কারণে পেশাগত জ্ঞানের সংকীর্ণতা এবং দ্বিতীয়ত, অধিক ব্যয়সাপেক্ষ বহিঃবিশেষজ্ঞ নিয়োগ। এছাড়া অনেক সময় রাজনৈতিক বিবেচনায় অযোগ্য ব্যক্তিদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, এর ফলে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

**৪. জনগণের সহযোগিতার অভাব :** সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন অনেকাংশ নির্ভর করে জনগণের সক্রিয় সমর্থন, সহযোগিতা বা অংশগ্রহণের উপর। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে জনগণের সচেতনতার অভাব ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনীহা সামাজিক নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, উন্নত মানসিকতার অভাব, পরিবর্তনবিমুখতা, রক্ষণশীলতা ও ভাগ্যনির্ভরতাসহ প্রভৃতি কারণে অনেক ক্ষেত্রে নীতি বাস্তবায়নে জনগণের আগ্রহের কমতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

**৫. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এসব দেশে খুব তাড়াতাড়ি ও নির্দিষ্ট সময় পরপর সরকার পরিবর্তন হয়। এক সরকারের গৃহীত নীতি অন্য সরকার বাস্তবায়ন করতে চায়না। এসব দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রভাবে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। ফলে সামাজিক নীতি বাস্বায়নের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

**৬. সরকার ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব :** উন্নয়নশীল দেশে সরকার ও জনগণের মধ্যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে একটি দুরত্ব বিরাজমান। বিশেষত শহরকেন্দ্রিক জন প্রতিনিধিত্ব এসব দেশের গ্রামীণ জনগণের আশা-আকাঙ্খা, চাহিদা, প্রয়োজন পূরণ ও স্বার্থরক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে জনগণের একটি বিশাল অংশের সাথে সরকারের যোগাযোগ গড়ে ওঠে না। একারণে অনেক সময় সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন দুরূহ হয়ে পড়ে।

**৭. দক্ষ কর্মীর অভাব :** উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় বাধা হলো নীতি অনুশীলনে দক্ষ কর্মীর অভাব। কেননা নীতির সামাজিক রূপদানে পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, নীতি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ফলাফল যাচাই ও সুপারিশ প্রদানে দক্ষকর্মীর সহায়তা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেমন দক্ষকর্মীর অভাব, তেমনি যতটুকু পাওয়া যায় তাদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

**৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বারোপ :** সাধারণত আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো সনাতন ধারণায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমুখী উন্নয়ন ঘটাতে চায়। এক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়গুলো গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সামাজিক উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব নয়; এর সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন উপাদানও ব্যাপক ও গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং দেখা যায় যে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রধান্য দেওয়াতে সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন সমস্যাগ্রস্ত হচ্ছে।

**৯. সামাজিক সমস্যার দুষ্টচক্র :** আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান সামাজিক সমস্যাবলী বিচিত্রমুখী ও জটিল। এসব সমস্যা একটি অপরটির সাথে এমনভাবে জড়িত যে, একটিকে প্রাধান্য দিয়ে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করলেও আশাব্যঞ্জক ফললাভ সম্ভব নয়। সামাজিক সমস্যার এরূপ দুষ্টচক্র সামাজিক নীতি বাস্তবায়নকে অনিশ্চিত করে তোলে।

**১০. প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতার অভাব :** সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্টদের আগ্রহ ও জবাবদিহিতার অভাব, প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে যথাযথভাবে নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দুর্নীতি। যার ফলে নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়, উদ্দেশ্য অর্জন ব্যহত হয় এবং নীতির সুফল জনগণের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হয়না।

## সারসংক্ষেপ

পরিকল্পিত সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে বাস্তবমুখী সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন। সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন পর্যায় বেশ জটিল। দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতাসহ নানাবিধ কারণে নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। সাধারণত আমাদের দেশে নীতি বাস্তবায়নে যে সকল সমস্যাগুলো বিদ্যমান তা হলো– ১) সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, ২) সম্পদের স্বল্পতা, ৩) বিশেষজ্ঞের অভাব, ৪) জনগণের সহযোগিতার অভাব, ৫) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ৬) সরকার ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব, ৭) সামাজিক নীতি অনুশীলনে দক্ষ কর্মীর অভাব, ৮) অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেয়া, ৯) সমস্যার দুষ্টচক্র এবং ১০) প্রশাসনিক দুর্বলতা।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। টেকসই সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত কোনটি?

ক) সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন খ) সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ

গ) সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ ঘ) সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা

২। আমাদের দেশে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের অন্তরায় হলো–

i. সম্পদের সীমাবদ্ধতা

ii. সরকার ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব

iii. দক্ষকর্মী বাহিনীর অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.১০ সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা (Role of Social Worker in Social Policy Formulation and Implementation)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১০.১ সামাজিক নীতি প্রণয়নে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.১০.২ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ১০.১০.১ সামাজিক নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে সামাজিক নীতি বহুল পরিচিত একটি প্রত্যয়। আধুনিক সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ কৌশল হিসেবে বিবেচিত। পেশাদার সমাজকর্মে মূলত ১৯৮০'র দশকে সামাজিক নীতির অনুশীলন শুরু হয়। এজন্য সমাজকর্মে সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বভাবতই একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের অনুশীলন করতে গিয়ে সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট কিছু পর্যায় রয়েছে। সমাজকর্মী সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। নিচে সামাজিক নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

**১. সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ :** বিশেষ কোনো সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে সামাজিক নীতি প্রণীত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা দ্বারা সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলো মোকাবিলায় যথাযথ সামাজিক নীতি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। মূলত সমাজকর্মীর কাজ হলো সমস্যার কারণ, প্রকৃতি, ব্যপ্তি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমস্যা নির্ধারণ এবং সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে সহায়তা করা।

**২. নীতি প্রণয়নে প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ :** বাস্তবভিত্তিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সামাজিক নীতি প্রণীত হয়। সমাজকর্মী সামাজিক গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করে সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত বাস্তব ও যথাযথ তথ্য সরবরাহে সহায়তা করে থাকেন। সামাজিক নীতি যাতে বাস্তবমুখী ও যথার্থ সমস্যাকেন্দ্রিক হয় সেজন্য সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের সাহায্য করতে তথ্য সরবরাহকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৩. নীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যের ভূমিকা পালন :** সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ কমিটির সদস্য হিসেবে কিংবা পরামর্শদাতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। সমাজকর্মীগণ নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মতামত প্রকাশ ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে কমিটির সদসদের প্রভাবিত করে থাকেন। এতে বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত হয়।

**৪. খসড়া নীতি প্রণয়ন :** সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো খসড়া নীতি প্রণয়ন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী যথাযথ তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নীতির খসড়া প্রস্তাব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। খসড়া প্রস্তাব তৈরির সময়ে সমাজকর্মী জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন নিশ্চিত করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন।

**৫. নীতি বিশ্লেষণ ও অনুধ্যান :** খসড়া নীতি প্রণয়নের পরবর্তী পর্যায় হলো প্রণীত খসড়া নীতি বিশ্লেষণ ও অনুধ্যান। এ পর্যায়ে নীতির বিভিন্ন দিক অনুধ্যান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর যথার্থতা যাচাই করা হয়। নীতি বিশ্লেষণ ও অনুধ্যানের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজকর্মীগণ বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করে থাকেন। পাশাপাশি সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে নীতির বাস্তব প্রয়োগ উপযোগিতা পরীক্ষা করে যৌক্তিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠায় সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

**৬. নীতির প্রচার ও জনসমর্থন আদায় :** সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রণীত খসড়া নীতির যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ পর্যায়ে সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে নীতির প্রয়োজনীয়তা ও ইতিবাচক ফলাফল প্রচারে ভূমিকা রাখেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন গনমাধ্যম যেমন– রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বিভিন্ন ব্লগ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই প্রচারণা চালিয়ে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া আলোচনা সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমেও জনমত গঠনে সমাজকর্মী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

**৭. খসড়া নীতির পরীক্ষামূলক অনুশীলন :** নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রণীত খসড়া নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করে এর ফলাফল মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায়ে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করে নীতির যথার্থতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। একজন সমাজকর্মী খসড়া নীতি অনুশীলনের মাধ্যমে এর সফলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও সংশোধনে সহায়তা করে থাকেন।

**৮. চূড়ান্ত নীতি প্রণয়ন :** সামাজিক নীতি প্রণয়নের সর্বশেষ পর্যায় হলো চূড়ান্ত নীতি প্রণয়ন। খসড়া নীতি প্রণয়ন, বিশ্লেষণ ও কার্যকারিতা যাচাই শেষে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে নীতিকে চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়। একজন সমাজকর্মী নীতি প্রণয়নের প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, নীতির সক্ষমতা ও প্রয়োগ উপযোগিতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতিকে বাস্তব উপযোগী এবং কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী একাধারে একজন সংগঠক, বিশেষজ্ঞ, জনমত গঠনকারী, গবেষক, বিশ্লেষক ও পরামর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখেন।

## ১০.১০.২ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সামাজিক নীতির বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর মুখ্য ভূমিকা হলো প্রণীত নীতিকে বাস্তবে রূপদান করা। নীতি বাস্তবায়ন স্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল, সংগঠন, জনসমষ্টি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নীতির বাস্তব অনুশীলনে কতগুলো বাহন বা মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। এসকল ক্ষেত্রে সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকেন। নিচে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের বিভিন্ন মাধ্যম ও পর্যায়ে সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

**১. আইন :** দেশের শাসনতন্ত্র ও সামাজিক আইনে সরকারের জনস্বার্থ ও সমাজসেবার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সংবিধান ও সামাজিক আইন সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম মাধ্যম। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সামাজিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেমন সমাজকর্মী আইন প্রণেতাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে আইন প্রণয়নে সহায়তা করেন তেমনি আইন বাস্তবায়নে আইন বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে থাকেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী জনগণকে আইনের প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**২. প্রশাসন :** প্রশাসন ব্যবস্থা সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম হাতিয়ার। মূলত প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় নীতি বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব। একজন সমাজকর্মী প্রশাসন ব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নীতির কার্যকর বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা :** সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। সামাজিক নীতি অধিকতর বাস্তবধর্মী ও কার্যকর করার অন্যতম উপায় হলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় ও জাতীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়কারীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন।

**৪. গবেষণা :** সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের উপায় ও সমস্যা দূরীকরণের কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। আবার নীতির অধিকতর কার্যকর ও সমৃদ্ধকরণে সামাজিক গবেষণা ব্যবহৃত হয়। একজন সমাজকর্মী যেমন সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে নীতি প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে তেমনি নীতির যথার্থ বাস্তবায়ন, নীতিকে অধিকতর উপযোগী করে তোলাসহ নীতির প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তনে সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন।

**৫. প্রশিক্ষণ :** সামাজিক নীতির কার্যকর বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নীতির খুটিনাটি সকল বিষয়ের সঙ্গে যেমন পরিচিত করে তোলা হয়, তেমনি নীতির যথাযথ বাস্তবায়নে তাকে দক্ষ করে তোলা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল প্রয়োগ করে নীতি বাস্তবায়ন কর্মীদেরকে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে, পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সাথে যথাযথ সামঞ্জস্যবিধানে এবং কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে পারদর্শী করে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সমাজকর্মীগণ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের এসকল পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা পালনের পাশাপাশি নীতি বাস্তবায়নে দেশজ সম্পদ ব্যবহার, কাঙ্ক্ষিত অনুকূল সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠন, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নীতি বাস্তবায়ন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কর্মতৎপরতার পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন স্তরে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ পরিচালনাসহ নানামুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

## সারসংক্ষেপ

সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সমাজকর্মী change agent বা পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। সামাজিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলো সামাজিক নীতি। স্বভাবতই সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে চলমান রাখতে প্রয়োজনীয় সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরি। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ সমাজের অনুভূত চাহিদা বা সমস্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে সামাজিক নীতির চূড়ান্ত প্রণয়ন পর্যন্ত নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তেমনি নীতি বাস্তবায়ন স্তরেও সমাজকর্মীগণ যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পেশাদার সমাজকর্মে সামাজিক নীতির অনুশীলন শুরু হয় কবে?

ক) ১৯৬০ এর দশকে খ) ১৯৭০ এর দশকে
গ) ১৯৮০ এর দশকে ঘ) ১৯৯০ এর দশকে

২। সমাজ উন্নয়নে পরিবর্তকের বাহক কে?

ক) সমাজকর্মী খ) সাংবাদিক
গ) ইঞ্জিনিয়ার গ) সমাজবিজ্ঞানী

৩। সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মীগণ সহায়তা করেন–

i. নীতি বাস্তবায়নে দেশজ সম্পদ ব্যবহারে
ii. নীতি বাস্তবায়নে অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ গঠনে
iii. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কর্মতৎপরতায় পরিবীক্ষণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.১১ পরিকল্পনা ও সামাজিক পরিকল্পনা (Planning and Social Planning)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১১.১ পরিকল্পনা কী তা জানতে পারবেন।

১০.১১.২ সামাজিক পরিকল্পনা ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ১০.১১.১ পরিকল্পনা কী?

কোনো কাজ করার পূর্বে কাজটি কেন, কোথায়, কীভাবে কখন এবং কার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে এমন সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত পূর্বচিন্তা থাকা আবশ্যক। কেননা এরূপ পূর্বচিন্তা কাজটিকে অর্থবহ ও কার্যকর রূপদানের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জন নিশ্চিত করে। কোনো কার্য সম্পাদনের এরূপ পূর্বচিন্তাই হলো পরিকল্পনা। মূলত কোনো কার্য সম্পাদনের পূর্বে নির্ধারিত চিত্র বা নকশাকে পরিকল্পনা বলা হয়। পরিরকল্পনা হলো কোনো কাজের বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যকার

সেতুবন্ধন। কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আওতাধীন সম্পদের সুসম বণ্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার সুশৃঙ্খল পদক্ষেপই হলো পরিকল্পনা।

অধ্যাপক নিউম্যানের মতে, পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যতে কী করতে হবে, তার জন্য অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এইচ. বি ট্রেকার বলেন, পরিকল্পনা হলো সচেতন ও সুচিন্তিত নির্দেশনা, যাতে সম্মিলিত উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়।

আর্থার ডানহাম পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, পরিকল্পনা হচ্ছে মূলত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার মানসিক প্রস্তুতি, কাজ করার আগে চিন্তা করা এবং অনুমানের পরিবর্তে সঠিক তথ্যের আলোকে কোনো কাজ সম্পাদন করা।

সুতরাং বলা যায় যে, বহুমুখী অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের মধ্য থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সম্পদ আহরণ এবং আহরিত সম্পদের সুসম বণ্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াই হলো পরিকল্পনা।

### ১০.১১.২ সামাজিক পরিকল্পনা

সাধারণত সামাজিক পরিকল্পনা বলতে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনাকে বুঝায়। সমাজজীবনে বাঞ্ছিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ ও নিদনির্দেশনাই হলো সামাজিক পরিকল্পনা। মূলত জনগণের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়ন সাধনই সামাজিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন, আধুনিক ও বাস্তবমুখী শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্পদের সুষম বন্টন প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত দিকনির্দেশনাই হলো সামাজিক পরিকল্পনা।

সমাজকর্ম অভিধান অনুযায়ী, সামাজিক পরিকল্পনা হচ্ছে পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক কাঠামো গঠন ও যুক্তিসংগত সামাজিক পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়া।

কিম্বল ইয়ং এর মতে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাামজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্য গৃহীত কর্মসূচিই হলো সামাজিক পরিকল্পনা।

পি. এন শর্মা ও সি. শাস্ত্রী বলেন, সংক্ষেপে বলতে গেলে সামাজিক পরিকল্পনার প্রধান কাজ হলো ধারাবাহিক ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, যা জনগণের জীবনমানকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।
সূতরাং বলা যায় যে, সামাজিক পরিকল্পনা হলো বাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জনগণের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়া, যা রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের কল্যাণে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়।

## সারসংক্ষেপ

আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর সমাজব্যবস্থায় মানুষ অদৃষ্টবাদিতার পরিবর্তে যুক্তিকে গ্রহণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নিতে চায়। এক্ষেত্রে কোনো কাজ করার জন্য সে পূর্বেই সবদিক চিন্তাভাবনা করে রাখে। এটাই হলো পরিকল্পনা। অন্যদিকে মানুষের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক গৃহীত পূর্ব সিদ্ধান্তই হলো সমাজিক পরিকল্পনা, যা রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের কল্যানে বাস্তবায়িত হয়। মূলত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ, সামাজিক সংহতি স্থাপন, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই হলো সামাজিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন কাজ সম্পাদনের জন্য কোনটি আবশ্যক?
ক) পূর্ব চিন্তা খ) পূর্ব পরিকল্পনা
গ) পূর্ব অভিজ্ঞতা ঘ) পূর্ব অনুমান

২। "ভবিষ্যতে কী করতে হবে, তার জন্য অগ্রিম সিদ্ধান্ত হলো পরিকল্পনা।"– উক্তিটি কার?
ক) আর্থার ডানহাম খ) অধ্যাপক নিউম্যান
গ) কিম্বল ইয়ং ঘ) শর্মা ও শাস্ত্রী

৩। সামাজিক পরিকল্পনার প্রধান কাজ হলো–
i. ধারাবাহিক ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করা
ii. উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা
iii. সামাজিক পরিবর্তন সাধন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.১২ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ (Characteristics and Types of Planning)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১২.১ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.১২.২ পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করতে পারবেন।

### ১০.১২.১ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

যেকোনো দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য প্রণীত হয় পরিকল্পনা। বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনার কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পি.এন শর্মা ও সি.শাস্ত্রী পরিকল্পনার কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন– ১) একটি সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়া, ২) বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ, ৩) কর্মসংস্থানসমূহের ব্যবস্থাপনা, অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা, ৪) নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক, ৫) বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও তথ্যের আলোকে প্রণীত এবং ৬) পরিকল্পনা একটি চলমান ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সার্বিকভাবে পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

**১. সুশৃঙ্খল কর্মপ্রচেষ্টা :** পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়া। কোনো একটি কাজ কেন করা হবে, কখন, কীভাবে এবং কার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে এসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করা হয়।

**২. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক :** পরিকল্পনা সবসময়ই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকলে সম্পদ বিনিয়োগ, প্রকল্প গ্রহণ ও কৌশল নির্ধারণ সম্ভব হয় না। ফলে পরিকল্পনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়ে তাকে।

**৩. পরিকল্পনার তথ্য নির্ভরতা :** প্রণীত পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবমুখী ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যনির্ভর হয়ে থাকে। পরিকল্পনা যেহেতু ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্দেশ করে সেহেতু অতীত এবং বর্তমানের যথাযথ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এতে একদিকে যেমন পরিকল্পনার মান বৃদ্ধি পায় তেমনি অতিদ্রুত লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব হয়।

**৪. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ :** উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে সম্পদের উৎস্য নির্ধারণ, সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, প্রাপ্ত সম্পদের খাতওয়ারী বন্টন ব্যবস্থা পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়। মূলত পরিকল্পনা হলো কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সম্পদের সাথে যথাযথ সামঞ্জস্যবিধান প্রক্রিয়া।

**৫. অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ :** পরিকল্পনা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া। এজন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ব্যক্তিবর্গের দেশের সামগ্রিক অবস্থা, দেশজ ও বৈদেশিক সম্পদ ও সহযোগিতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা এমনকি ভবিষ্যত সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। কেননা একটি অভিজ্ঞ, দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষই পারে যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে।

**৬. উত্তম বিকল্প পন্থা :** পরিকল্পনা হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনেকগুলো বিকল্প পন্থার মধ্যে উত্তম পন্থা। কেননা কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অনেকগুলো বিকল্প পথ থাকতে পারে, কিন্তু সব পথ সহজ সরল বা যথার্থ কার্যকর নয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা হলো বিকল্প পথগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম পথ।

**৭. রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা :** পরিকল্পনা যেহেতু একটি দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার নির্দেশক, সেহেতু এটি সাধারণত রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তবে অনেক সময় অনেক প্রতিষ্ঠান কর্তৃকও পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বিদ্যমান থাকে।

**৮. জটিল ও বহুমাত্রিক কর্মপ্রক্রিয়া :** পরিকল্পনা একটি জটিল ও বহুমাত্রিক কর্মপ্রক্রিয়া। কেননা কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হলে তার পূর্বাপর সকল অবস্থার বিশ্লেষণ, সম্পদ ও সুযোগ চিহ্নিতকরণ ও যথাযথ ব্যবহার, সময়সূচি প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আর এসকল কর্মপ্রক্রিয়ার সমন্বিত রূপ হলো পরিকল্পনা।

**৯. পরিকল্পনার ব্যাপ্তি :** পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র পরিব্যপ্ত থাকে। প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর সকল বিভাগ ও উপবিভাগ পরিকল্পনার আওতাধীন থাকে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে গৃহীত কোনো কর্মসূচিই পরিকল্পনার বাইরে নয়।

**১০. নিরবিচ্ছিন্নতা :** পরিকল্পনা একটি ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া। একটি শেষ হতে না হতেই আরেকটির শুরু হয়। যেহেতু উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া সেহেতু উন্নয়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখতে ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। তাই বলা হয় পরিকল্পনা একটি নিরবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রক্রিয়া।

একটি উত্তম পরিকল্পনায় উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও আরো যেসকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তা হলো– ১) পরিকল্পনার যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রণীত হয়, ২) অর্জন ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকে, ৩) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পর্যাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষে পরিকল্পনা প্রণীত হয়, ৪) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত থাকে, ৫) পরিকল্পনায় সম্পদ সংগ্রহ ও বন্টনের রূপরেখা নির্দিষ্ট করা হয়, ৬) পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে সংগতি রেখে পরিকল্পনা নমনীয় এবং ৯) স্থানীয় পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রণীত হয় জাতীয় পরিকল্পনা।

## ১০.১২.২ পরিকল্পনার প্রকারভেদ

পরিকল্পনা একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়। বিভিন্ন পরিকল্পনাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পরিকল্পনার শ্রেণিবিন্যাসের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সার্বিকভাবে যথোপযুক্ত প্রয়োগযোগ্যতার ভিত্তিতে পরিকল্পনার শ্রেণিবিন্যাস নিচে আলোচনা করা হলো :

১. প্রায়োগিক ব্যাপকতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা দুই ধরনের। যথা :

**ক. সামষ্টিক পরিকল্পনা :** যে পরিকল্পনা জাতীয় পর্যায়ে সমগ্র দেশব্যাপী প্রয়োগের জন্য ব্যাপক পরিসরে প্রণীত হয় তাই হলো সামষ্টিক পরিকল্পনা। এ ধরনের পরিকল্পনায় একটি মাত্র পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কার্যকর থাকে।

**খ. ব্যষ্টিক পরিকল্পনা :** যখন কোনো পরিকল্পনা ব্যক্তি পর্যায়ে বা সংক্ষিপ্ত পরিসরে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রণয়ন করা হয়, তখন তাকে ব্যষ্টিক পরিকল্পনা বলা হয়।

২. অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা দুই প্রকার। যথা :

**ক. বস্তুগত পরিকল্পনা :** পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের পর তা অর্জনের জন্য দেশে বিরাজমান উৎপাদনের উপাদানসমূহের প্রাপ্যতা ও সম্ভাব্য সম্পদের সামগ্রিক হিসেবের পর সেগুলো যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর প্রেক্ষিতে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাই হলো বস্তুগত পরিকল্পনা। বস্তুগত সম্পদ হলো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমিকের শ্রম, বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি।

**খ. আর্থিক পরিকল্পনা :** যে পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা, উৎপাদনের উপাদান সমূহের বন্টন, সম্ভাব্য, সম্পদের প্রাপ্যতা নির্ধারণের পর পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর্থিক মূল্যমানের ভিত্তিতে কৌশল নির্ণয় করা হয় তাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়।

৩. উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে পরিকল্পনা তিন ধরনের। যথা :

**ক. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা :** নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতির অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণসদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়, তাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

**খ. সামাজিক পরিকল্পনা :** সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন অনাচার ও সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য গৃহীত সুপরিকল্পিত পদক্ষেপই হলো সামাজিক পরিকল্পনা।

**গ. উন্নয়ন পরিকল্পনা :** দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে রাস্তাঘাট, রেলপথ, সেতু ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা।

৪. লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে পরিকল্পনা দুই প্রকার। যথা :

**ক. প্রেক্ষিত বা স্থায়ী পরিকল্পনা :** দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বিস্তৃত পরিসরে দীর্ঘ সময়ব্যাপী যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে প্রেক্ষিত বা স্থায়ী পরিকল্পনা বলা হয়। এর মেয়াদকাল সাধারণত ১৫ থেকে ২০ বছর হয়।

**খ. ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা :** বিভিন্ন ধরনের বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সমন্বয়ে এধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। কোনো একটি ক্ষেত্রে সার্বিক লক্ষ্যার্জনে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন মেয়াদের পরিকল্পনা প্রয়োগ করে ধাপে ধাপে লক্ষ্যার্জনে অগ্রসর হওয়া এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

৫. সময়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা তিন ধরনের। যথা :

**ক. স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা :** সাধারণত এক বছরের বা তার কম সময়ের জন্য এ পরিকল্পনা প্রণীত হয়। একে অনেক সময় বার্ষিক পরিকল্পনাও বলা হয়ে থাকে।

**খ. মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা :** এধরনের পরিকল্পনা সাধারণত এক বছরের বেশি কিন্তু পাঁচ বছরের কম সময়কালের জন্য প্রণীত হয়। কখনো কখনো একে অন্তবর্তীকালীন পরিকল্পনাও বলা হয়।

**গ. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা :** দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সাধারণত পাঁচ বছর হতে বিশ বছর পর্যন্ত এ পরিকল্পনার মেয়াদ নির্ধারিত হয়।

এছাড়াও পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে– ক) খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও খ) প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনা এবং দেশের উন্নয়ন স্তরের প্রসারতার ভিত্তিতে– ক) আঞ্চলিক পরিকল্পনা, খ) জাতীয় পরিকল্পনা ও গ) আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি শিরোনামেও পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে কার্যসম্পাদনের একটি সুচিন্তিত ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে একটি দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। সব ধরনের পরিকল্পনায় কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা পরিকল্পনার গঠন, বাস্তবায়ন, কার্যক্রম প্রভৃতি দিককে নির্দেশ করে। সাধারণত পরিকল্পনায় যে সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাহলো– ১) সুশৃঙ্খল কর্মপ্রচেষ্টা, ২) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপস্থিতি, ৩) তথ্যের নির্ভরতা, ৪) সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, ৫) দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন, ৬) সর্বোত্তম বিকল্প পন্থা, ৭) রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, ৮) জটিল ও বহুমাত্রিক কর্মপ্রক্রিয়া ৯) পরিকল্পনার ব্যাপকতা ১০) নিরবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা। আবার পরিকল্পনাকে প্রয়োগিক দিক ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন– ক) সামষ্টিক পরিকল্পনা, খ) ব্যষ্টিক পরিকল্পনা, গ) বস্তুগত পরিকল্পনা, ঘ) আর্থিক পরিকল্পনা, ঙ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, চ) সামাজিক পরিকল্পনা, ছ) উন্নয়ন পরিকল্পনা, জ) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ঝ) ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা, ঞ) স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা, ট) মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা, ঠ) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, ড) আঞ্চলিক পরিকল্পনা, ঢ) জাতীয় পরিকল্পনা, ণ) আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক পরিসরে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে কী বলা হয়?
ক) সামষ্টিক পরিকল্পনা খ) ব্যষ্টিক পরিকল্পনা
গ) আর্থিক পরিকল্পনা ঘ) ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা

২। সাধারণত ১ বছর বা তার কম সময়কালের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে বলা হয়–
ক) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা খ) স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা
গ) মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা ঘ) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

৩। কোনো দেশের সামাজিক খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য কী প্রণয়ন করা হয়?
ক) সামাজিক নীতি খ) সামাজিক কর্মসূচি
গ) সামাজিক পরিকল্পনা ঘ) সামাজিক কার্যক্রম

৪। পরিকল্পনা একটি–
i. সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়া
ii. বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ
iii. চলমান ধারাবাহিক প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.১৩ বাংলাদেশে গৃহীত পরিকল্পনা (Planning Adopted in Bangladesh)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১৩.১ বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১০.১৩.১ বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনা মূলত উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী পরিকল্পনা। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার মাধ্যমে কাঙ্খিত সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এদেশে বিভিন্ন মেয়াদী ও খাতওয়ারী পকিল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক পশ্চাদমুখিতা, দারিদ্র্য, বেকারত্বসহ নানাবিধ সমস্যার মধ্যে একটি সমৃদ্ধ গতিশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন সামাজিক খাত অন্তর্ভুক্ত। নিচের ছকে এসব পরিকল্পনা ও সময়কাল উপস্থাপন করা হলো–

| ক্রমিক নম্বর | পরিকল্পনাসমূহ | সময়কাল |
|---|---|---|
| ১ | প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৭৩-১৯৭৮ |
| ২ | দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৭৮-১৯৮০ |
| ৩ | দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৮০-১৯৮৫ |
| ৪ | তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৮৫-১৯৯০ |
| ৫ | চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৯০-১৯৯৫ |
| ৬ | প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা | ১৯৯৫-২০১০ |
| ৭ | পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৯৭-২০০২ |
| ৮ | দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র | ২০০৩-২০১০ |
| ৯ | দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা | ২০১০-২০২১ |
| ১০ | ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ২০১১-২০১৫ |
| ১১ | সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ২০১৬-২০২০ |

ছক : ১০.১৩.১ বাংলাদেশের প্রণীত পরিকল্পনাসমূহ

#### বার্ষিক পরিকল্পনা

প্রতিবছর সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক খাতের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিপরীতে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাই বার্ষিক পরিকল্পনা। সাধারণত ১ বছর মেয়াদকালের জন্য প্রণীত হয় বলে একে বার্ষিক পরিকল্পনা বলা হয়। একে এ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্লান (এডিপি) ও বলা হয়ে থাকে। বার্ষিক পরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকর্তৃক বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার প্রতি বছর বাজেট হতে অর্থের সংস্থান করে থাকে। সরকারের বাজেট হতে বরাদ্দ ছাড়াও প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশ প্রকল্প সাহায্য দিয়ে তাকে। এ পরিকল্পনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নির্ণয়ে সাধারণত তিনমাস পরপর মনিটরিং করা হয়ে থাকে। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পগুলো বিভিন্ন সামাজিক খাতভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুকল্যাণ, নারীকল্যাণ, প্রবীণকল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

#### পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন গতিশীল রাখতে পাঁচ বছর মেয়াদি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। সাধারণত এ পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ অর্থনীতির নির্দেশকসমূহকে একটি কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য

লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এরূপ পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধিবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন, সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৭৩ সালে পাঁচ বছর মেয়াদী (১৯৭৩-১৯৭৮) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যা প্রথম পাঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় আরোও পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০২০ সাল) প্রণয়নের জন্য সরকারের সম্ভাব্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

**প্রেক্ষিত পরিকল্পনা**

সরকার কর্তৃক গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হচ্ছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। বর্তমানে বিশ্বে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে একটি জনপ্রিয় কর্মপরিকল্পনা হলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনা (১৯৬০-১৯৮০) প্রণয়ন করে। মূলত এই পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য গৃহীত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। সাধারণত ১০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত এ পরিকল্পনার মেয়াদ নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অধিকতর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০১০ থেকে ২০২১ সাল মেয়াদী 'রূপকল্প ২০২১' নামক প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো– ক) দারিদ্র্য হ্রাস, অসমতা ও সামাজিক বঞ্চনা থেকে জনগণকে রক্ষা করা, খ) ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করা, গ) ২০২১ সাল নাগাদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ১০% এ উন্নীত করা, ঘ) ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং বেকারত্বের হার ১০% ও দারিদ্র্যের হার ১৫% এ নামিয়ে আনা, ঙ) ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৮ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা, চ) পরিবেশ সংরক্ষণ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলা করা, ছ) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহার জোরদার করা, জ) ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে ইন্টারনেট সেবার প্রসার ঘটানো।

## সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, দারিদ্র্য, বেকারত্বসহ নানাবিধ আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে আরও গতিশীল করতে এবং একটি মজবুত অর্থনীতির ভিত গড়ে তুলতে বাংলাদেশে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এগুলো হলো বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রতিবছর বার্ষিক পরিকল্পনা ছাড়াও এযাবত একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-১৯৮০); ছয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮, ১৯৮০-১৯৮৫, ১৯৮৫-১৯৯০, ১৯৯০-১৯৯৫, ১৯৯৭-২০০২, ২০১১-২০১৫) ও দুটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (১৯৯৫-২০১০ ও ২০১০-২০২১) প্রণীত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ২০০০ সালে প্রণীত জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণসহ ২০০৩-২০১০ মেয়াদে দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়?

ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৩ সালে

গ) ১৯৭৪ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

২। রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো–

i. ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা

ii. ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৮ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা

iii. ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.১৪ সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা (Problems of Social Planning Formulation and Implementation)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১৪.১ বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১০.১৪.১ বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা

সরকারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হলো পরিকল্পনা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এ যাবত ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১টি দ্বিবর্ষিক পরিকল্পনা ও ১টি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, প্রণীত পরিকল্পনাগুলোর কোনোটিই সামাজিক খাতসহ অন্যান্য খাতের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। নিম্নের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো :

| পরিকল্পনাসমূহ | মোট বরাদ্ধ (কোটি টাকা) | প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকা) | প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা %) | অর্জিত প্রবৃদ্ধি (%) | মেয়াদাকাল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ৪৪,৫৫০ | ২০,৭৪০ | ৫.৫০ | ৪.৪০ | ১৯৭৩-১৯৭৮ |
| দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা | ৩৮,৬১০ | ৩৩,৫৯০ | ৫.৬০ | ৩.৫০ | ১৯৭৮-১৯৮০ |
| ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১,৭২,০০০ | ১,৫২,৯৭০ | ৫.৪০ | ৩.৮০ | ১৯৮০-১৯৮৫ |
| ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ৩,৮৬,০০০ | ২,৭০,১১০ | ৫.৪০ | ৩.৮০ | ১৯৮৫-১৯৯০ |
| ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ৬,২০,০০০ | ৫,৯৮,৪৮০ | ৫.০০ | ৪.১৫ | ১৯৯০-১৯৯৫ |
| ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১,৯৫,৯৫২১ | ১৩,৭৩,৬৩০ | ৭.০০ | ৫.২১ | ১৯৯৭-২০০২ |
| ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৩,৪৭,০০০ | -- | ৮.০০ | ৬.৪০ | ২০১১-২০১৫ |

ছক : ১০.১৪.১.১ দেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা

উপর্যুক্ত ছকে দেখা যায় যে, প্রণীত পরিকল্পনার কোনোটিতেই ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

**১. পরিকল্পনার অপূর্ণাঙ্গতা :** আমাদের দেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা হলো পরিকল্পনার অপূর্ণাঙ্গতা। বিশেষ করে পরিকল্পনার উচ্চাভিলাষী উদ্দেশ্য, অবাস্তব বিশেষায়িত সমষ্টি মডেল নির্ভরতা, নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচির অপর্যাপ্ততা অর্থনৈতিক বা সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিকগুলোর উপেক্ষা, এসকল কারণে সামাজিক পরিকল্পনা যথাযথ পূর্ণাঙ্গতা পায়না।

**২. সম্পদের অপর্যাপ্ততা :** বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপ্রতুল সম্পদ এবং সম্পদ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা একটি বড় বাধা। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের দ্বারা যেমন পরিকল্পনার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার করা সম্ভব নয়, তেমনি বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য শর্তারোপ এবং দাতা গোষ্ঠীর সরবরাহকৃত বিশেষজ্ঞর পেছনে প্রদত্ত অর্থের সিংহভাগ খরচ হয়ে যাওয়ায় যথাযথভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না।

**৩. অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়নকারীর অভাব :** বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা হলো বিশেষজ্ঞের অভাব। যথাযথ বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অর্থনীতিবীদ, সমাজবিজ্ঞানী, পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, মানবসম্পদের স্বল্পতার কারণে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়না। অনেক সময় অতীত ব্যর্থতা মূল্যায়ন না করেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। ফলে পরিকল্পনা কার্যকর সফল হয়না।

**৪. প্রতিশ্রুতির অভাব :** আমাদের দেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যথেষ্ঠ কমিটমেন্ট বা প্রতিশ্রুতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সাধারণ জনগণের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতার অভাব ইত্যাদি কারণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়া।

**৫. জনগণের সম্পৃক্ততার অভাব :** পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততার অভাব একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। সাধারণত আমাদের দেশে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাতে সাধারণ জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনা। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটি অনীহার ভাব সৃষ্টি হয়। এজন্য সাধারণ জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকেনা।

**৬. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অভাব :** আমাদের দেশে প্রণীত সামাজিক পরিকল্পনাগুলোতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে গতানুগতিক ধারায় অনেকগুলো লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনোটির আপেক্ষিক গুরুত্ব কতখানি বা কোনোটি মূল লক্ষ্য তা নির্ধারণ করা হয়না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গৃহীত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

**৭. প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা :** বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। সরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেমন সমন্বয়ের অভাব দেখা যায় তেমনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক দুর্বলতাও অন্যতম প্রধান সমস্যা।

**৮. প্রশাসনিক ব্যর্থতা :** পরিকল্পনা প্রণয়নে অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্ভরতা, বাস্তবতার আলোকে নতুন কিছু উদ্ভাবন ও গ্রহণে অনীহা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, অর্থনৈতিক বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

**৯. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অন্যতম সমস্যা হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এখানে দ্রুত সরকার পরিবর্তিত হয়। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথেই নীতিরও পরিবর্তন হয়, যা সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এছাড়া আরো যেসকল কারণে বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয় তা হলো :

ক. যোগ্য ও দক্ষ পরিকল্পনাকর্মী ও সমাজ গবেষকের অভাবে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত ও যথাযথ তথ্যের অভাব;
খ. প্রেক্ষিত বা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অভাব;
গ. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা;
ঘ. প্রকল্প নকশা তৈরি ও প্রক্রিয়াজাতকরণে দীর্ঘসূত্রিতা;
ঙ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা ও অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা;
চ. প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয়;
ছ. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দাতাগোষ্ঠীর অধিক হস্তক্ষেপ;
জ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা;

ঝ. পরিকল্পনা প্রণয়নে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুযোগ না থাকা;
ঞ. সরকারের অস্থিতিশীলতা এবং সঠিক জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকদর্শনের অভাব ইত্যাদি।

## সারসংক্ষেপ

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হলো সামাজিক পরিকল্পনা। পূর্ণাঙ্গ, বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক ও সুষম উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু এর ব্যত্যয় ঘটলে অর্থাৎ পরিকল্পনা যদি পূর্ণাঙ্গ, বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী না হয়, তাহলে পরিকল্পনার ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় না। ফলে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ছয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা, একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। এছাড়া একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা চলমান রয়েছে। কিন্তু এযাবত বাস্তবায়িত পরিকল্পনাগুলোর কোনোটিই ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এজন্য দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিছু সমস্যা দায়ী। যেমন– ১) পরিকল্পনার অপূর্ণাঙ্গতা, ২) সম্পদের অপ্রতুলতা ও সম্পদ প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা, ৩) বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বের স্বল্পতা, ৪) পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ প্রতিশ্রুতির অভাব, ৫) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের সম্পৃক্ততার অভাব, ৬) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি, ৭) প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, ৮) প্রশাসনিক ব্যর্থতা, ৯) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল কত?
ক) ৬% খ) ৭%
গ) ৮% ঘ) ৯%

২। বাংলাদেশে এ যাবৎ কয়টি পঞ্চবার্ষিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে?
ক) ৫টি ও ১টি খ) ৬টি ও ২টি
গ) ৭টি ও ১টি ঘ) ৭টি ও ২টি

৩। বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা হলো–
i. সম্পদের অপ্রতুলতা ও সম্পদ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা
ii. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্যের অভাব
iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-১০.১৫ সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা (Role of Social Worker in Formulation and Implementation of Social Planning)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১৫.১ সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

## ১০.১৫.১ সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্মী একজন পেশাদার সেবাকর্মী, যিনি তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল বাস্তবে প্রয়োগ করে জনকল্যাণমুখী উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকেন। অন্যদিকে সামাজিক পরিকল্পনা হলো সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের হাতিয়ার। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে সরকারের সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নিচে সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

**১। পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** দেশের জনগণের চাহিদাপূরণ, সমস্যা দূরীকরণ ও সমৃদ্ধ জীবনমান অর্জনে সরকার পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী জনগণের কল্যাণ ও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করতে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকেন।

**২। বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ :** পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরপরই এর কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। কেননা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকৃতি নির্ণয় এর উপর ভিত্তি করেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নির্ধারণ করা হয় এবং সম্ভাব্য সমস্যা নিরূপন ও সম্ভাব্য সম্পদ চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যথাযথ ও পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্যের যথাযথ বিশ্লেষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৩। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণ :** জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সামাজিক পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যত বাস্তবমুখী ও সুনির্দিষ্ট হয় ততই এর অর্জন প্রয়াস সহজতর হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী বাস্তব অবস্থার উপর গবেষণা চালিয়ে সম্ভাব্য সঠিক ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে সহায়তা করে থাকেন। এছাড়া বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, দ্বৈততা ইত্যাদি পরিহারে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৪। অগ্রধিকারভিত্তিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ :** সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকারভিত্তিক সাজানো হয়। এ পর্যায়ে সমাজকর্মীগণ গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে বাস্তবমুখী ও অতি প্রয়োজনীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন, যেহেতু সমাজকর্মীগণ মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে বাস্তব অবস্থার খুব কাছাকাছি থাকেন সেহেতু তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা জরুরি।

**৫। সম্পদ সংস্থান :** পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সম্ভাব্য সম্পদ নিরূপণ ও উৎস নির্ণয় অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে সম্পদের সম্ভাব্য উৎস্য হতে পারে দেশজ বা স্থানীয় সম্পদ এবং বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ বা অনুদান। সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য খরচ নির্ণয় এবং দেশজ বা স্থানীয় সম্পদের উৎস্য নির্ণয়ে কার্যকর সহায়তা করে থাকেন। এছাড়া অতিরিক্ত খরচ বা সম্পদের অপচয়রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৬। বিকল্প কার্যক্রম গ্রহণ :** পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্প নকশা প্রস্তুত করতে হয়। প্রকল্প নকশায় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের একাধিক বিকল্প পন্থা নির্ধারিত হয়। সমাজকর্মীগণ সামাজিক পরিকল্পনার বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গ্রহণযোগ্য সর্বোত্তম বিকল্প পন্থা বা কার্যক্রম নির্ধারণে যথাযথ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৭। সম্পদ বরাদ্দ :** পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের কার্যধারা নির্ণয়ের পর খাতওয়ারী সম্পদ নির্ধারণ করতে হয়। সমাজকর্মীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত নির্ণয়ের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে থাকেন।

**৮। বাস্তবায়ন :** প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মী একদিকে যেমন পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করেন, তেমনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনেও যথাযথ ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে পরিকল্পনার যথার্থতা উপস্থাপন করে এর বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালিয়ে থাকেন।

**৯। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন :** পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে যাবতীয় কর্মতৎপরতা যথাযথভাবে চলছে কি না তা যাচাই করা এবং উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষিতে সমাধান ব্যবস্থা উদ্‌ঘাটন করাই হলো পরিবীক্ষণের কাজ। মূলত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায় থেকে চলমান থাকে। কারণ মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম। সমাজকর্মীগণ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের শেষ অবধি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্যার্জনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মী একজন পেশাদার সেবাপ্রদানকারী। তিনি তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও কৌশল সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ করে যথাযথ ভূমিকা রাখেন। সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পথনির্দেশিকা হলো সামাজিক পরিকল্পনা। একজন সমাজকর্মী সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন। সাধারণত একজন সমাজকর্মী এক্ষেত্রে তিন ধরনের মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। প্রথমত, সংশিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। দ্বিতীয়ত, জনসচেতনতাকারী হিসেবে তিনি লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। তৃতীয়ত, উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে সমাজকর্মী সমাজের চাহিদাপূরণ, সমস্যা দূরীকরণ ও সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তাবায়নে কে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন?

ক) সমাজকর্মী খ) পরিকল্পনা প্রণয়নকারী
গ) লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী ঘ) অর্থনীতিবিদ

২। মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ হিসেবে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে মূল্যায়ন করা হয়?

ক) পরিকল্পনার শুরুতেই খ) পরিকল্পনার শেষে
গ) পরিকল্পনা শুরু থেকে শেষ অবধি ঘ) পরিকল্পনার মাঝামাঝি পর্যায়ে

৩। সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা হলো–
i. তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা
ii. জনসচেতনকারী হিসেবে জনগণকে পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা
iii. উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে পরিকল্পনা গ্রহণে কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কবে জনসংখ্যাস্ফীতিকে ১ নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করা হয়?
ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৬ সালে
গ) ২০০১ সালে ঘ) ২০১২ সালে

২। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর কোনটি?
ক) পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি খ) সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি
গ) অষ্টম থেকে একাদশ শ্রেণি ঘ) নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

৩। সামাজিক পরিকল্পনার পথপ্রদর্শক হিসেবে কোনটিকে নির্দেশ করা হয়?
ক) সামাজিক নীতি খ) সামাজিক কার্যক্রম
গ) সামাজিক উন্নয়ন ঘ) সামাজিক গবেষণা

৪। প্রতিবছর কোন দিনকে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়?
ক) ২ জানুয়ারি খ) ২ ফেব্রুয়ারি
গ) ২ জুন ঘ) ২ জুলাই

৫। সময়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা কয় ধরনের?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

৬। ভিশন ২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার কত শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে?
ক) ৫ শতাংশ খ) ১০ শতাংশ
গ) ১৫ শতাংশ ঘ) ২০ শতাংশ

৭। একটি জাতিকে দ্রুত মানব সম্পদে পরিণত করার যথার্থ উপায় হলো–
i. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার বিস্তার
ii. কৃষি শিক্ষার বিস্তার
iii. কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষার বিস্তার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। জনসংখ্যা কার্যক্রমে যে সকল মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অপরিহার্য–

i. স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
ii. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
iii. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং ওসিসির কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া নির্যাতনের শিকার নারীদের মানসিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হবে।

৯। উদ্দীপকে সরকারের কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে?

ক) জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ খ) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
গ) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ ঘ) জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০১২

১০। উক্ত নীতিতে উদ্দীপকে উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ ছাড়া আরো যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে–

i. বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া
ii. বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিতহারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
iii. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে সিটি করপোরেশন ও পৌর এলাকার বস্তি, ভাসমান ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

ক) জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অনুযায়ী শিশু কারা? ১
খ) সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝেন? ২
গ) উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) নিরাপদ মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমেই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব"–আপনি কী উক্তিটির সাথে একমত? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

২। মানহা ও জেরিন দুই বান্ধবী। দুজনই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচএসসি প্রোগ্রামের প্রথম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী। উভয়ের মধ্যে একদিন সামাজিক পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

**মানহা :** সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অনেক সমস্যা রয়েছে।

**জেরিন :** একজন সমাজকর্মী সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বহুমূখী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

ক) সর্বপ্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণীত হয় কোন দেশে? ১
খ) উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝেন? ২
গ) উদ্দীপকে বর্ণিত মানহার বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত জেরিনের বক্তব্যের সাথে আপনি কী একমত?– উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ : ১। গ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৭ : ১। ঘ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৮ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৯ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১০ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১১ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১২ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১৩ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১৪ : ১। গ ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১৫ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১০ : ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। খ ৫। খ ৬। গ ৭। খ ৮। ঘ ৯। খ ১০। ঘ

# সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা
## (Problems and Prospects of Social Wrok Profession)

**ইউনিট ১১**

### ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উন্নত দেশে শিল্পবিপ্লব ও যান্ত্রিক যুগের সূচনার ফলে আধুনিক সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। পরবর্তীতে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয়। শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত সমস্যা মোকাবিলার জন্য উন্নত দেশের অনুসরণে পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সূচনা এবং ষাটের দশকে এর সম্প্রসারন ঘটে। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক দশক অতিক্রান্ত হলেও এখনো বাংলাদেশে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, প্রবীণকল্যাণ, শ্রমকল্যাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের সম্ভাবনা রয়েছে। পেশাগত সংগঠনের অভাব, দেশজ শিক্ষা উপকরণের সীমাবদ্ধতা, জনসচেতনার অভাব, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অভাবে সমাজকর্ম পেশা এদেশে যথাযথ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনা অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি পর্যায়ে সীমিত পরিসরে হলেও সমাজকর্ম পেশার অনুশীলন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সমাজকর্ম পেশার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জনের নিমিত্তে BCSWE এর মতো সংগঠন তৎপর রয়েছে। অদূর ভবিষ্যত বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ ও গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ- ১১.১ : বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশের পর্যায়
পাঠ- ১১.২ : বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের ইতিহাস
পাঠ- ১১.৩ : বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র
পাঠ- ১১.৪ : বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সমস্যাসমূহ
পাঠ- ১১.৫ : বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনা
পাঠ- ১১.৬ : বিশ্বের উন্নত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা
পাঠ- ১১.৭ : বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা


## পাঠ-১১.১ বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশ (The Development of Social Work Knowledge in Bangladesh)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১১.১ বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

### ১১.১ বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশ

শিল্পবিপ্লবের পর উদ্ভূত জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সর্বপ্রথম ইউরোপ ও আমেরিকায় সমাজকর্ম পেশার উন্মেষ ঘটে। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বর্তমানে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের উন্মেষ ঘটে। আজও এদেশে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও সমাজকর্মের দেশজ জ্ঞানভান্ডার বিকাশের প্রেক্ষাপট রয়েছে।

জাতিসংঘের সুপারিশ ও সহায়তায় সমাজকর্ম বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তৎকালীন পকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের সমাজজীবন ও সমাজ কাঠামোতে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। কেননা দেশ বিভাগের পর বহু মোহাজের ভারত থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন। একদিকে শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত আর্থ-সামাজিক সমস্যা, অন্যদিকে আগত মুহাজির পুনর্বাসন সমস্যা জটিল আকার ধারণ করলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের নিকট সাহায্যের আবেদন জানায়। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে ড. জেমস আর ডাম্পসন (Dr. James R. Dumpson) এর নেতৃত্বে জাতিসংঘের কার্যকর সাহায্য কর্মসূচির (technical assistance programme) ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি সমাজকর্ম বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় আসেন। বিশেষজ্ঞ দলটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে একটি জরিপ কার্য পরিচালনা করে। বিশেষজ্ঞ দল জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করে এদেশে পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন ও সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকায় তিন মাসব্যাপী স্বল্পকালীন 'প্রশিক্ষণ কোর্স' প্রবর্তন করা হয়। এই কোর্স প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়। জাতিসংঘের পরামর্শ অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে 'ঢাকা প্রজেক্ট' নামে শহর সমষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রজেক্টের সাফল্যের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলীতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প নামে পরীক্ষামূলক একটি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৯৫৫-৫৬ অর্থ বছরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রবর্তনের মাধ্যমে এদেশে পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বেসরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও বিকাশে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমাজকর্ম বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার দেশে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার (College of Social Welfare and Research Center) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র হতে ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে এম.এ. কোর্স প্রবর্তন করা হয়। এর মাধ্যমেই বাংলাদেশে সমাজকর্মে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানিক সূচনা হয়। শুরুর দিকে দু'বছর মেয়াদী এম.এ. কোর্স চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষা বছর থেকে স্নাতক সম্মান পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। এরপর ১৯৭৩ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় 'সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট', যা ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক (International Association of Schools of Social work) এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত । বর্তমানে এই ইনস্টিটিউট থেকে সমাজকল্যাণে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এছাড়াও ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক, ভিকটিমোলজি, জেরনটলজী ও ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিলেশনের উপর এই ইনস্টিটিউট বিশেষ স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে "সমাজকর্ম কলেজ" (বর্তমানে সমাজকর্ম বিভাগ) প্রতিষ্ঠা করে সমাজকর্মে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু করা হয়। এরপর ১৯৬৭ সালে কলেজটিতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হয়। পরবর্তীতে সমাজকর্ম বিভাগ হিসেবে কলেজটিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আত্মীকরণ করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হয়। একই সাথে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্স প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সমাজকর্মে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। অতি সম্প্রতি ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু হয়েছে। সমাজকর্ম শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে কলেজ পর্যায়ে স্নাতক (সম্মান) এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৮ সাল থেকে সরকারি ও বেসরকারি কলেজে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাজকল্যাণ বিষয়কে সমাজকর্ম নামকরণ করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সাল থেকে দেশের সকল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয়টির নাম সমাজকল্যাণ এর পরিবর্তে সমাজকর্ম করা হয়েছে, যা এদেশে সমাজকর্ম জ্ঞান বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিদ্যমান পাঠ্যক্রম আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে বেশ কিছু বেসরকারি

বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু আছে। আশা করা যায় যে, এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশ স্বাধীনের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সমাজসেবা বিভাগে সমাজসেবা কর্মকর্তা নিয়োগে কেবল সমাজকর্ম/সমাজকল্যাণ বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ধারীরাই যোগ্য বলে বিবেচিত হতো। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে এটি বাতিল করে সকল বিষয়ে ডিগ্রী প্রাপ্তদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যার ফলে বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারে মন্থর গতি আসে। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কিছু এনজিওতে সমাজকর্ম অনুশীলন হচ্ছে। বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (CSWE) এর আদলে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (BCSWE) গঠন করা হয়েছে। BCSWE বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা ও অনুশীলনের মানোন্নয়ন ও পেশাগত স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে NASW, IASSW এবং APASWE এর মতো আন্তর্জাতিক পেশাগত সংগঠনসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টার এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ চ্যাপ্টারে নিয়মিত কর্মশালা ও জার্নাল প্রকাশ করছে, যা বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

## সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে সমাজকর্মের অগ্রযাত্রা শুরু হয় দেশ বিভাগের পর জাতিসংঘের সহযোগিতায় ১৯৫৩ সালে ভারত থেকে আগত মুহাজিদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য। জাতিসংঘের বিশেষ দলের সুপারিশের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম ১৯৫৩ সালে তিন মাসব্যাপী স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা প্রজেক্টের মাধ্যমে এই অগ্রযাত্রার শুরু হয়। পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫-৫৬ অর্থ বছরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রবর্তনের মাধ্যমে। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ১৯৫৬ সালে সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠিত হয়। বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা অগ্রযাত্রার অগ্রদূত হিসেবে ১৯৫৮ সালে কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় যা বর্তমানে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৪-৬৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৯৩ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেটে, ১৯৯৩ সালে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৯৮ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত কলেজে এবং ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। বর্তমানে সমাজকর্ম শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠন হিসেবে BCSWE প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যা বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে কবে?

ক) ১৯৫২ সালে খ) ১৯৫৩ সালে

গ) ১৯৪৭ সালে ঘ) ১৯৪৮ সালে

২। বাংলাদেশে কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

ক) ১৯৫৭ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি খ) ১৯৫৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি

গ) ১৯৫৭ সালের ২০ মার্চ ঘ) ১৯৫৮ সালের ২০ মার্চ

## পাঠ-১১.২ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের ইতিহাস (History of Professional Social Work Practice in Bangladesh)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১১.২ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে সমাজকর্মের পেশাগত যাত্রা শুরু হয় দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। দেশ বিভাগের পর ব্যাপক সংখ্যক মোহাজের ভারত থেকে বাংলাদেশে আগমনের ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য তৎকালীন সরকার ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের সাহায্য ও পরামর্শের জন্য আবেদন জানায়। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় আসেন। বিশেষজ্ঞ দল সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং জরিপ কার্য পরিচালনা ও বিশ্লেষণ করে এদেশে পেশাদার সমাজকর্ম প্রয়োগের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে পেশাদার সমাজকর্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজকর্মের উপর স্বল্পকালীন (তিন মাসের) প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উপর ভিত্তি করে সমাজকর্মের বাস্তব অনুশীলনের জন্য ১৯৫৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা প্রজেক্ট নামে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়। বাংলাদেশে মূলত পেশাদার সমাজকর্মের বাস্তব অনুশীলনের সূচনা হয় শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Urban Community Development Project-UCDP) চালুর মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে ঢাকা প্রজেক্টের সাফল্যের ভিত্তিতে ঢাকার গোপীবাগ ও মোহাম্মদপুরে আরো দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এরপর ১৯৫৯-৬০ সালে বিভাগীয় শহরসহ মোট বারটি শহরে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে যা শহর সমাজসেবা কার্যক্রম নামে ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে সকল পৌর এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাতিসংঘ ও রেডক্রসের সহায়তায় ১৯৫৬ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু করা হয়। এরপর ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, মিটফোর্ড এবং বক্ষব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্ম অনুশীলন শুরু হয়। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা পর্যায়ের সকল হাসপাতালসহ মোট ৯০টি হাসপাতালে হাসপাতাল সমাজসেবা নামে কর্মসূচিটি চালু রয়েছে। এদেশে ১৯৬৩ সাথে আন্তঃসার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৬৯ সালে আরমানিটোলা উচ্চ বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রামের মুসলিম হাইস্কুলে বিদ্যালয় সমাজকর্ম (School Social Work) চালু করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটির সুপরিশের ভিত্তিতে বিদ্যালয় সমাজকর্ম কর্মসুচি বন্ধ করে দেয়া হয়।

দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৪ সালে "গ্রামীণ সমাজসেবা" (Rural Social Services-RSS) নামে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ পল্লী এলাকায় সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলায় কর্মসূচিটি চালু রয়েছে। সমাজকর্ম বিকাশের ধারায় এদেশে শিশুকল্যাণ, প্রবেশন, প্যারোল, আফটার কেয়ার সার্ভিস, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে সমাজকর্মের কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু হয়। বাংলাদেশে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতে সোশ্যাল কেস ওয়ার্কার ও সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার নামে পদ সৃষ্টি করা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশ ও অনুশীলন বিস্তৃতি লাভ করছে।

### সারসংক্ষেপ

ঢাকা প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার অনুশীলন শুরু হয়, যা বর্তমানে শহর সমাজসেবা USS নামে ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে সমগ্র পৌর এলাকায় চালু রয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্মের মাত্রা শুরু হয় ১৯৫৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যা বর্তমানে ৯০টি হাসপাতালে 'হাসপাতাল সমাজসেবা' নামে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৬৯ সালে বিদ্যালয় সমাজকর্ম চালু হলেও তা ১৯৮৪ সালে বন্ধ হয়ে যায়। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ সমাজসেবা (RSS) চালু হয়, যা বর্তমানে সমগ্র দেশের সকল উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া শিশুকল্যাণ, সংশোধনমূলক কর্যক্রম, প্রতিবন্ধীকল্যাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকর্ম জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার অনুশীলন দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বাংলাদেশে বিদ্যালয় সমাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় কত সালে?

ক) ১৯৬৩ সালে খ) ১৯৬৯ সালে
গ) ১৯৮৪ সালে ঘ) ১৯৮৫ সালে

২। বর্তমানে "হাসপাতাল সমাজসেবা" কর্মসূচি চালু রয়েছে কতটি হাসপাতালে?

ক) ৯০টি খ) ৯১টি
গ) ৮৮টি ঘ) ৮৯টি

## পাঠ-১১.৩ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র (Possible Fields of Applying Social Work in Bangladesh)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১১.৩ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

### ১১.৩ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র

উন্নত বিশ্বে বিশেষ করে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। সেখানে লাইসেন্সধারী ও রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সমাজকর্মীরা সমাজকর্ম অনুশীলন করে থাকেন। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র ধীরগতিতে হলেও প্রসার লাভ করছে। শিল্পায়ন ও শাহরায়ণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা যেমন– পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, বস্তি ও গৃহায়ন সমস্যা, সামাজিক বন্ধনে শিথিলতা, বেকারত্ব, জনসংখ্যাস্ফীতি, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতাসহ অন্যান্য সমস্যা কার্যকর সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান ও পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী। তাই বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্য কবলিত দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মানবপাচার, নারী ও শিশু নির্যাতন, পরিবেশ দূষণসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ (social betterment) আনয়নে সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সমাজকর্মের সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্রগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **শহর ও গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন :** বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয় মূলত শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (UCDP) এর মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে। এটি বর্তমানে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম নামে ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে সারা দেশের পৌর এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা শহর এলাকার বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্য কাজ করছে। অন্যদিকে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ১৯৭৪ সাল থেকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি (RSS) চালু রয়েছে। এটি দেশের সকল উপজেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শহর ও গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নে সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল ও পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২. **বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম :** বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, পড়ালেখার প্রতি বিমুখতা, বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করতে না পারাসহ বিবিধ সমস্যা লক্ষণীয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া প্রতিরোধ, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী করা তথা শিক্ষার্থী বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে ১৯৬৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকার

আরমানিটোলা উচ্চ বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রামের মুসলিম হাই স্কুলে চালু করা হলেও তা ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটির সুপারিশ বন্ধ করে দেয়া হয়। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে ইউসেপ, ব্র্যাকের মতো কিছু এনজিও বিদ্যালয় সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করে। বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে সমাজকর্ম প্রয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

৩. **সংশোধনমূলক কার্যক্রম :** অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের আচরণ সংশোধনে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সমষ্টিভিত্তিক সেবা কর্মসূচি চালু রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক সেবা কর্মসূচির মধ্যে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, কারাগারের অভ্যন্তরে বন্দী কয়েদীদের প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং ও মটিভেশন কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক সেবা কর্মসূচির মধ্যে প্রবেশন, আফটার কেয়ার সার্ভিস ও প্যারোল রয়েছে। প্রতিকারমূলক এই সব কর্মসূচিতে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য যে, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে ব্যক্তি সমাজকর্মী ও সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার নামে পদ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সমাজকর্মে ডিগ্রিধারীদের নিয়োগের সুযোগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. **চিকিৎসা ক্ষেত্রে :** বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাক্ষেত্রে সমাজকর্মীর জ্ঞান প্রয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এদেশে ১৯৫৬ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চালুর মধ্য দিয়ে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়, যা বর্তমানে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম নামে সমগ্র বাংলাদেশের মোট ৯০টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল, দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন সম্ভবপর। চিকিৎসা ক্ষেত্রে টীম ওয়ার্ক অ্যাপ্রোচের (team work approach) মাধ্যমে কাজ করা হয়ে থাকে, যা বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে কার্যকর ফল বয়ে আনতে সক্ষম।

৫. **পরিবারকল্যাণ :** পরিবার সমাজের আদিম প্রতিষ্ঠান। পরিবারেই শিশু জন্ম গ্রহণ করে। পরিবারে সঠিক দিকনির্দেশনা, সচেতনতা ও নেতৃত্বের অভাবে পরিবারের সদস্য ও সন্তান-সন্ততিরা অনেক সময় যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে পরিবারের সদস্যরা বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মতো দেশে পরিবার কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি যেমন– পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, পারিবারিক ও দাম্পত্যকলহ প্রতিরোধে সমাজকর্মের জ্ঞান বিশেষভাবে উপযোগী।

৬. **শিশুকল্যাণ :** শিশুকল্যাণের নিমিত্ত গৃহীত কর্মসূচির সফলতা আনয়নে সমাজকর্ম অনুশীলন করা যেতে পারে। পুষ্টি কার্যক্রম, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিশু যত্ন, মা ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, শিশু সুরক্ষা, শিশু নির্যাতন রোধ, শিশু বঞ্চনা ও নিপীড়ন প্রতিরোধে সমাজকর্মীরা যথার্থ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বাংলাদেশে শিশু পরিবার, ছোটমনি নিবাস, দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র, দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, সেফ হোম, প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে পরিচালিত কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রমে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. **নারীকল্যাণ :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হচ্ছে নারী। নারীরা বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। নারীর অনগ্রসরতা, অসচেতনতা ও কুসংস্কার দূর করে সচেতন, দায়িত্বশীল ও উপার্জনক্ষম করে নারী ক্ষমতায়ন তথা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম জ্ঞান অধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া সেফ হোম, পল্লী মাতৃ কেন্দ্র, দুঃস্থ মহিলা প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, এসিড দগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীর পুনর্বাসন কর্মসূচিসহ নারী কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৮. **যুবকল্যাণ :** যুবকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, দৈহিক, মানসিক, নৈতিক তথা সার্বিক কল্যাণের জন্য যেসব কর্মসূচি বা কার্যক্রম নেয়া হয় তাই যুবকল্যাণ। বাংলাদেশের যুবকদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বেকার। বাংলাদেশের যুবসমাজের জন্য গৃহীত কর্মমুখী ও গঠনমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগের বিকল্প নেই বললেই চলে। বিশেষ করে বিপথগামী, হতাশাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত যুবসমাজের জন্য সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ অধিক ফলপ্রসূ। সমাজকর্মের নীতি, মূল্যবোধ, কৌশল ও পদ্ধতির আলোকে যুবসমাজকে সংগঠিত করে আত্মনির্ভরশীল তথা মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

৯. **প্রবীণকল্যাণ :** শিল্পসমাজে পারিবারিক বন্ধন শিথিল, যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলার ফলে প্রবীণ জনগোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতার শিকার হচ্ছেন। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ, নতুন প্রজন্মের সাথে সামঞ্জস্যবিধানসহ তাদের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নে সমাজকর্মীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বাংলাদেশে প্রবীণকল্যাণে গৃহীত বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম, বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিসহ শান্তি নিবাসগুলোতে

সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রবীণদের জন্য মোট ৬টি শান্তি নিবাস আছে। এসব নিবাসগুলোতে সমাজকর্ম অনুশীলনের যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

১০. **প্রতিবন্ধীকল্যাণ :** বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ ভাগ প্রতিবন্ধী। জন্মগত, দুর্ঘটনা ও অপুষ্টিসহ বিভিন্ন কারণে দিন দিন প্রতিবন্ধীর সংখ্যার বেড়েই চলছে। প্রতিবন্ধীদের পরিবার ও সমাজের বোঝা না ভেবে সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি রয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়, জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রমসহ বেশ কিছু কর্মসূচি যেখানে সমাজকর্ম জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

১১. **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি :** বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সফলতা নিশ্চত করা সম্ভবপর। বয়স্ক ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি সংক্রান্ত সমাজসেবা কর্মসূচিসহ সামাজিক বীমা ও সামাজিক সাহায্য কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১২. **শ্রমকল্যাণ :** শ্রমজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, কর্ম পরিবেশের মানোন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শ্রমিক-কর্মচারিদের মধ্যে শ্রম অসন্তোষ, নিরাপত্তাহীনতা, মালিক-শ্রমিকদ্বন্দসহ বিভিন্ন সমস্যা নিরসন করে শ্রমিকদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া শ্রমিক কর্মচারিদের মধ্যে গঠনমূলক শিক্ষা, চিত্তবিনোদন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান, সামাজিক শিক্ষা প্রদান, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত জ্ঞান দান ও পেশাগত কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতেও সমাজকর্মীরা সচেষ্ট হতে পারে।

উপরিউক্ত প্রয়োগক্ষেত্রগুলোর কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের বেকারত্ব, জনসংখ্যাস্ফীতি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা, নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক সমস্যা, মাদকাসক্তি, অপরাধ ও কিশোর অপরাধসহ নানাবিধ সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক ব্যাধি মোকাবিলার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া বর্তমানে দেশের পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলা, এইচআইভি/এইডস, আর্সেনিক সমস্যাসহ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ সুফল বয়ে আনতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত জটিল ও বহুমুখী সমস্যার কার্যকর সমাধানে সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক ও বহুমুখী হতে পারে। এদেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজর্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। শিশু, নারী, প্রবীণ, শ্রম ও যুবকল্যাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি ফলপ্রসূ হতে পারে। তাই সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতির মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্রগুলো বিস্তৃত করতে হবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১. বাংলাদেশে প্রথম কোন ক্ষেত্রে সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয়?

ক) গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন খ) শহর সমষ্টি উন্নয়ন

গ) শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে

২. বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানে সোশ্যাল কেস ওয়ার্কার নামে পদ রয়েছে?

ক) কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে খ) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে

গ) শহর সমষ্টি কার্যক্রমে ঘ) গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমে

# পাঠ-১১.৪ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সমস্যাসমূহ (Problems in the Development of Social Work Profession in Bangladesh)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১১.৪ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

## ১১.৪ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা বিকাশে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপরাধ, কিশোর অপরাধসহ বিভিন্ন রকম আর্থ-সামাজিক সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় পেশাদার সমাজকর্মের অনুশীলন খুব তাৎপর্যপূর্ণ। জাতিসংঘের সহযোগিতায় তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকে পশ্চাত্যের উন্নত দেশের অনুকরণে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশ ঘটে। এরপর থেকে এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা ও মৌলিক চাহিদা অপুরণজনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যাবলী মোকাবিলায় পেশাদার সমাজকর্মের নীতি, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মের দেশজকরণ এখনো সম্ভব হয়নি। এদেশে সমাজকর্ম পেশার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে আজও পেশাগত মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো হলো :

১. বাংলাদেশে সমাজকর্মের প্রতি মানুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস সমাজকর্ম পেশা বিকাশে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্ম এ দুটো বিষয়কে আলাদা করে না দেখার ফলে এখনো অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে।

২. যেকোনো পেশার বিকাশে পেশাগত সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে CSWE এর মতো কোনো শক্তিশালী পেশাগত সংগঠন না থাকায় সমাজকর্ম পেশা হিসেবে আজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। দেশ স্বাধীনের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদেশে বাংলদেশ সরকারের তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে (বর্তমান সমাজসেবা অধিদপ্তর) সমাজসেবা কর্মকর্তা পদটি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সমাজকর্মে/সমাজকল্যাণে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্তদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে তা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ায় সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশ বাধ্যগ্রস্ত হয়। বার কাউন্সিল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের মতো পেশাগত সংগঠন না থাকায় বাংলাদেশের সমাজকর্মের বিকাশ প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে না। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালে BCSWE প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ সংগঠনটি সীমিত পরিসরে হলেও সমাজকর্ম শিক্ষায় মানোন্নয়ন ও পেশাদার সমাজকর্মের অনুশীলন সম্প্রসারণে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

৩. বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম শিক্ষার দেশীয় উপকরণের (indegenious material) অভাব অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। এদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিবেচনা করে দেশজ উপকরণে সর্বস্তরের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস এবং সামঞ্জস্য বিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এছাড়া সমাজকর্ম শিক্ষার মুখপাত্র হিসেবে নিয়মিত সমাজকর্ম শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বই ও সাময়িকী প্রকাশের উদ্যোগ অত্যাবশ্যক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে The Journal of Social Development প্রকাশিত হলেও তা সমাজকর্ম পেশার বিকাশ এবং সমাজকর্ম শিক্ষার দেশজ উপকরণ প্রস্তুতে তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না বললেই চলে। BCSWE থেকে বর্তমানে 'Bangladesh Journal of Social Work' নামে একটি জার্নাল নিয়মিতভাবে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৪. উন্নত বিশ্বে প্রতিনিয়তই সমাজকর্ম শিক্ষার উপকরণ যেমন– পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রযুক্তিনির্ভর, আধুনিক ও সময়োপযোগী হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো পাশ্চাত্যের পুরাতন শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। যার ফলে আধুনিক শিক্ষা উপকরণের অভাব এদেশে আন্তর্জাতিক মানসম্মত সমাজকর্ম পেশা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

৫. বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠন সক্রিয় না থাকায় দেশীয় প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানে অনুকরণীয় পেশাগত মানদণ্ড ও মূল্যবোধ নির্ধারণে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয় না। বাংলাদেশে সমাজকর্ম অনুশীলনে পাশ্চাত্যে প্রচলিত সমাজকর্ম মূল্যবোধ ও নীতিমালা অনুসারণ করা হয় যা অনেকক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রযোজ্য নয়।

৬. উন্নত বিশ্বে সমাজকর্মীরা লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলন করে থাকে। বাংলাদেশে এই ধরনের ব্যবস্থা চালু না থাকায় সমাজকর্ম পেশার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৭. উন্নত বিশ্বে ফিল্ডওয়ার্কের সময়সীমা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, চীনে আটশত ঘণ্টা, কিন্তু আমাদের দেশে চারশত আশি ঘন্টা, যা প্রায় কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়া ফিল্ডওয়ার্কের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বহিঃতত্ত্বাবধায়কগণ সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী না হওয়ায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাদার সমাজর্মের বিষয়ে জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ সীমিত হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে যাথাযথভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায় না।

৮. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশ না হওয়ার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নামকরণ নিয়ে দোদুল্যমানতা বিশেষভাবে দায়ী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের নাম সমাজকল্যাণ কিন্তু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম হওয়াতে তা শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ, সুশীল সমাজ ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যে প্রায়শ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে থাকে। আবার অনেকে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্মকে আলাদা না করে একই কাতারে বিবেচনা করে। কখনো কখনো সমাজকর্মকে সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা অথবা সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানকে একই বিষয় হিসেবে মনে করেন। ফলে এদেশে সমাজকর্মকে স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে দাঁড় করানো চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্পষ্ট ধারণা সমাজকর্ম পেশার বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

৯. বাংলাদেশে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু আছে সেগুলোর সাথে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতার দরুন সমাজকর্মের বাস্তব উপযোগিতা ও গুরুত্ব তুলে ধরা সম্ভবপর হবে না, যা সমাজকর্ম পেশার বিকাশে বাধাস্বরূপ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বাস্তব প্রয়োগ উপযোগিতা ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও স্বতন্ত্র শিক্ষা উপকরণ, গতিশীল পেশাগত সংগঠনের যথাযথ তৎপরতার অভাবসহ রাষ্ট্রনীতিতে সমাজকর্মীদের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ ও সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি না থাকায় সমাজকর্ম পেশার বিকাশ ও সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

## সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বাস্তব প্রয়োগ উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও দেশজ শিক্ষা উপকরণের অভাব, সচেতনতার অভাব, সমন্বয়ের অভাব, গতিশীল পেশাগত সংগঠনের অভাব, পেশাগত স্বীকৃতির অভাবসহ রাষ্ট্রনীতিতে সমাজকর্মীদের ক্ষমতায়নের অভাবে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা কোনটি?

ক) পেশাগত সংগঠনের অভাব খ) দেশজ শিক্ষা উপকরণের অভাব

গ) জনসচেতনতার অভাব ঘ) সমন্বয়হীনতা

২. কার নির্দেশে তৎকালীন সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে সমাজকর্মে/সমাজকল্যাণে ডিগ্রিধারীদের জন্য সমাজসেবা কর্মকর্তা পদটি সংরক্ষিত করা হয়?

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ) রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

গ) রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ ঘ) জননেত্রী শেখ হাসিনা

# পাঠ-১১.৫ বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনা (Prospects of Social Work Education in Bangladesh)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১১.৫ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের পেশাগত গুরুত্ব অপরিসীম। পাকিস্তান আমালে এদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা ঘটে। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশে ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে তথা আজকের বাংলাদেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তিনমাসব্যাপী স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সমাজকর্ম শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের সফলতার পর প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন কর্মীদের জন্য নয় মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়। অতঃপর ১৯৫৫-৫৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু করা হয়। ১৯৫৮ সালে কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা সমাজকর্ম বিষয়ে দেশের প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং এটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউট সমাজকল্যাণে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম.ফিল, পিএইচ.ডি.সহ স্পেশালাইজড মাস্টার্স প্রদান করছে। এছাড়া ৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যারয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর নাম পরিবর্তন করে সমাজকর্ম ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ডিগ্রির নাম ব্যাচেলর অব সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন সোশ্যাল সায়েন্স করা হলেও দুভার্গ্যজনক হলো সেটিকে আবার পূর্বের নামে ফিরিয়ে নেয়া হয় যা সমাজকর্ম শিক্ষা তথা পেশার বিকাশে বাধাস্বরূপ।

সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে ১৯৬৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৯২ সালে জগন্নাথ কলেজে (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৯৩ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২০১৫ সালে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয়েছে। বর্তমানে আরো কিছু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের প্রায় ১৫০০টি কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পার্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও সমাজকর্ম ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চালু আছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সাল থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের সকল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয়ের নামকরণ 'সমাজকল্যাণ' এর পরিবর্তে 'সমাজকর্ম' করা হয়েছে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে পশ্চাত্যের অনুকরণে সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। তাই এদেশে দেশজ উপকরণভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা একান্ত আবশ্যক। এছাড়া বাংলাদেশে সরকারি ও এনজিও পরিচালিত সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজসেবা কার্যক্রমে পেশাদার সমাজকর্মী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচি দেশজকরণের পাশাপাশি পাঠ্যসূচিতে CSWE এর নির্দেশনা অনুযায়ী যুগোপযোগী নতুন নতুন কোর্স সংযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। সেজন্য CSWE এর আদলে BCSWE কে গতিশীল সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তাহলে এদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানে দেশজ জ্ঞানের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ও টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশের সম্ভাবনা বাস্তবে পরিলক্ষিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনার সাথে সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠনের স্বক্রিয় তৎপরতা ও পেশাগত স্বীকৃতির বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িত। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার স্বীকৃতি লাভ করবে এ বিষয়ে দ্বিধা না থাকলেও সময়ের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য। আশা করা যায়, সমাজকর্মের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পেশাগত সংগঠনের সমন্বয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা ও তৎপরতার অদূর ভবিষ্যতে এদেশে সমাজকর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। ফলে এদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার নতুনদ্বার উন্মোচিত হবে।

## সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের পেশাগত সম্ভাবনা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদলের সুপারিশে ১৯৫৩ সালে এদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা ঘটে। বর্তমানে দেশের পাঁচটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয়েছে। বর্তমানে আরো কিছু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের প্রায় ১৫০০টি কলেজে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও সমাজকর্ম ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চালু আছে। বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনার সাথে সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠনের স্বক্রিয় তৎপরতা ও পেশাগত স্বীকৃতির বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িত। আশা করা যায়, সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও তৎপরতার অদূর ভবিষ্যতে সমাজকর্মকে একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলে এদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার নতুনদ্বার উন্মোচিত হবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১. পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয় কবে?
   ক) ২০১৩ সালে খ) ২০১৪ সালে
   গ) ২০১৫ সালে ঘ) ২০১৬ সালে

২. কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার নামটি পরিবর্তন করে কোন নামকরণটি করা হয়?
   ক) সমাজকর্ম ও গবেষণা ইনস্টিটিউট খ) সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
   গ) সমাজকর্ম গবেষণা ইনস্টিটিউট ঘ) সমাজকল্যাণ গবেষণা ইনস্টিটিউট

# পাঠ-১১.৬ বিশ্বের উন্নত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা (Social Work Education in Developed Countries)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১১.৬ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে সমাজকর্ম শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

## ১১.৬ বিশ্বের উন্নত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা

প্রাচীনকালে দানশীলতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাজকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা চালানো হতো, যা মূলত বস্তুগত সহায়তার মাধ্যমে সমস্যার সাময়িক সমাধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজে উদ্ভূত বহুমুখী ও জটিল সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানে আধুনিক সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। সমাজকর্ম পেশার বিকাশে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার অবদান সবচেয়ে বেশি। সমাজকর্মের গোড়াপত্তন ইংল্যান্ডে হলেও পেশাগত মযার্দা প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম আমেরিকায়। আঠারো ও উনিশ শতকে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যা ও মনো-সামাজিক চাপ মোকাবিলার কৌশল হিসেবে সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৯৮ সালে এবং পরবর্তীতে ইউরোপসহ সারাবিশ্বে সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলনের যাত্রা শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আমেরিকা ও ইউরোপসহ বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজকর্ম একটি পেশাগত ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে পঠিত ও অনুশীলিত হয়ে আসছে। সেই সময় থেকে অদ্যবধি আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রায় দুই হাজারের অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী সমাজকর্মে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে। সেখানে লাইসেন্সধারী ও

রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সমাজকর্মীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলন করছে। অনেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্লিনিক খুলে সমাজকর্ম অনুশীলন করছে। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স এর এক তথ্যানুযায়ী বিশ্বের ৯০টি অঞ্চলে সাড়ে সাতলাখ পেশাদার সমাজকর্মী এর সদস্যভুক্ত। সমাজকর্মীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স (IFSW), জাতিসংঘের ECOSOC এবং UNICEF এর বিশেষ পরামর্শক হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থা যেমন– WHO, ILO, Commonwealth Organisation for Social Work (COSW), Amnesty International সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে অংশিদারীত্বের ভিত্তিতে সমাজকর্মীরা কাজ করছে। নিম্নে উন্নত বিশ্বের দেশ হিসেবে যুক্তরাজ্য (ইংল্যান্ড), আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও চীনের সমাজকর্ম শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো :

## ১. ইংল্যান্ডে সমাজকর্ম শিক্ষা

ইংল্যান্ডের সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাসই বিশ্বব্যাপী সমাজকর্মের ইতিহাস হিসেবে পরিচিত। বিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডেই মূলত সমাজকর্ম শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত ঘটে। ইংল্যান্ডের দান সংগঠন সমিতির (COS) দর্শনের উপর ভিত্তি করে Fabian Society এবং Seltlement Movement দারিদ্র্য সম্পর্কিত 'School of Economics' প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৩ সালে London School of Economics এর অন্তর্ভুক্ত হয়। লিভারপুলে School of Social Science প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৪ সালে। এটি ১৯১৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৮ সালে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয়। বর্তমানে ইংল্যান্ডের ৮৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম কোর্স চালু রয়েছে। চিকিৎসা সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য Institute of Almoners প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয় ১৯২০-১৯৩০ সালের মধ্যে। পরবর্তীতে এগুলোর আওতায় সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্ক, প্রবেশন সেবা, শিশুকল্যাণ সেবা ও ফ্যামিলি সোশ্যাল ওয়ার্ক এর উপর প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নে বিভারিজ রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা আইন-১৯৪৬, জাতীয় বীমা আইন-১৯৪৬ এবং শিশু আইন-১৯৪৮ সমাজকর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করে। এসব আইনের উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালে চিকিৎসা সেবার উপর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল, ১৯৬২ সালে সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ কাউন্সিল এবং ১৯৬৩ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা হয়। স্থানীয় সমাজসেবা আইন, ১৯৭০ অনুসারে সমাজকর্ম শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণের কাঠামো তৈরি করা হয়। এই আইন অনুসারে Seebohn Committee স্বাস্থ্য ও শিশুকল্যাণ বিভাগকে সমন্বিত করে সমাজসেবা দপ্তরের অধীনে সমাজসেবা বিভাগ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়। যার ফলে ইংল্যান্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যান্ডে পেশাদার সমাজকর্মীদের কাজ করার নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। এ সময় কেন্দ্রীয় সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাউন্সিল গঠিত হয়। এই কাউন্সিলের আওতায় ইংল্যান্ডের বিভিন্ন এলাকায় বয়স্ক সেবা, পারিবারিক পরামর্শ কেন্দ্র ও অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ এর দশকে ইংল্যান্ডে সরকারি উদ্যোগে সমষ্টিকেন্দ্রিক সেবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমষ্টিকেন্দ্রিক সেবাকে আরো জোরদারকরণের লক্ষ্যে তিনটি আইন প্রণয়ন করা হয়। এগুলো হলো ১৯৮৩ সালের মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ১৯৮৯ সালের শিশু আইন এবং ১৯৯০ সালের স্বাস্থ্য ও সমষ্টি সেবা আইন। এসব আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে সমাজসেবার ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক পরিবর্তন সূচীত হয় যা সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

## ২. আমেরিকায় সমাজকর্ম শিক্ষা

ইংল্যান্ডের সমাজসেবার উপর ভিত্তি করে আমেরিকায় সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয়। আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস প্রায় ১০০ বছরের। আধুনিক সমাজকর্মের জ্ঞান ও শিক্ষা বিকাশে আমেরিকার অবদান অনস্বীকার্য। দান সংগঠন সমিতি ১৮৯৮ সালে নিউইয়র্কে School of Philanthropy প্রতিষ্ঠা করে। সমাজকর্ম শিক্ষার প্রবর্তনে সর্বপ্রথম এনা এল. ডয়েস (Anna L. Dawes) ১৮৯০ সালে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত International Congress of Charities Correction and Philanthropy সম্মেলনে সমাজসেবায় পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ম্যারী ই. রিচমন্ড (Mary E. Richmond) ১৮৯৭ সালে সমাজসেবায় সর্বপ্রথম ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দানের জন্য Training School for Applied Philanthropy স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৮৯৮ সালে নিউইয়র্ক শহরে সমাজকর্মের ওপর এক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

আমেরিকায় এ কোর্সের মাধ্যমে সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। সমাজকর্মের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ১৮৯১ সালে Charities Review নামে একটি প্রত্রিকা প্রকাশ করা হয়। আমেরিকাতে ১৯০৪ সাল থেকে পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত হয়। এই সময় থেকে অর্থাৎ ১৯০৪ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে ১৫টি সমাজকর্মভিত্তিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ১৯১৯ সালে সমস্ত স্কুলের সমন্বয়ে Association of Training School for Professional Social Work গড়ে ওঠে। সমাজকর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান উন্নতকরণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯২৭ সালে American Association of School Social Work (AASSW) প্রতিষ্ঠিত হয়। AASSW এর উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু করা হয়। এ সময়ে দু'বছর মেয়াদি মাষ্টার্স কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্য ১৯৪৬ সালে National Council on Social Work Education গঠন করা হয়। CSWE এর সাথে সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করার জন্য ১৯৫২ সালে National Association of School of Social Administnation (NASSA) গঠিত হয়। আমেরিকায় সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাসে CSWE এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এটি আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের সংগঠন। CSWE সমাজকর্ম শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য পর্যালোচনা, নতুন নতুন সমাজকর্ম কর্মসূচি প্রবর্তন, প্রচলিত সমাজকর্ম কর্মসূচি মূল্যায়ন, সমাজকর্ম শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রকাশ ও বিতরণ এবং সমাজকর্ম কর্মসূচি উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। CSWE কে এক্ষেত্রে সহায়তা করে আমেরিকার শিক্ষা দপ্তর এবং The Council on Post-Secondary Accreditation (COPA)। পরবর্তীতে এই সংগঠনটি Post-Secondary Education Organization নামে কাজ করে। তবে ১৯৭০ সালের পূর্বে সংস্থাটি যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় সমাজকর্ম শিক্ষার বিস্তারে অবদান রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে CSWE এর অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রায় এক হাজারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে স্নাতক, স্নাতাকোত্তর ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। আমেরিকার CSWE সারাবিশ্বে সমাজকর্ম শিক্ষার মানোন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিবেচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পেশাদার বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম বিষয়ে পাঠদানের জন্য CSWE এর অনুমোদন বাধ্যতামূলক। সমাজকর্মের সর্ববৃহৎ পেশাগত সংগঠন হচ্ছে আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) যা ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সারা বিশ্বে পেশার সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করছে।

### ৩. অস্ট্রেলিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষা

ইংল্যান্ড ও আমেরিকার পরই অস্ট্রেলিয়াতে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অস্ট্রেলিয়ায় সমাজকর্ম পেশা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। আস্ট্রেলিয়াতে ১৯২৯ সালে প্রথম সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মের উপর প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালে মেলাবোর্নে এবং ১৯৩৬ সালে অ্যাডিলিডে দুই বছর মেয়াদি স্নাতক পূর্ব ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়। সারাদেশে সমাজকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ কর্মসূচি প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে Australian Association of Social Worker (AASW) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে ১৯৫৭ সালের Mury Report গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ফেডারেল সরকারের আর্থিক সাহায্য, রাজ্য সরকারের মঞ্জুরী এবং অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সাহায্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া ১৯৬৪-৬৫ সালে Mury Report বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাব-গ্রাজুয়েট কোর্সসমূহ বাদ দেয়ার পরামর্শ দেয়। ফলে এক দশকে অস্ট্রেলিয়াতে সমাজকর্ম স্কুলের সংখ্যা ৪টি থেকে ১৩টি উন্নীত হয়। অস্ট্রেলিয়ান সরকারের বিশেষ আর্থিক সহায়তায় ১৯৬০এর দশকের শেষের দিকে এবং ৭০এর দশকের প্রথম দিকে মেলবোর্নে তিনটি নতুন সমাজকর্ম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ১৯৭৪ সালে সরকার সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর কোর্সকে উৎসাহিত করার জন্য ৩০টি স্নাতকোত্তর সমাজকর্ম পুরস্কার (Post Graduate Social Work Award) প্রদান করে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৮০ এর দশকে সমাজকর্মের শিক্ষকরা Australian Association for Social Work Education (AASWE) এ অংশগ্রহণ করেন। AASWE ১৯৮৯ সালে Australian Association for Social Work and Welfare Education (AASWWE) তে রূপান্তরিত হয়। AASWWE এর একটি সাধারণ কাউন্সিল এবং দুটি স্ট্যান্ডিং কমিটি ছিলো। স্ট্যাডিং কমিটির একটি ছিল সমাজকর্ম শিক্ষার জন্য (for social work education) এবং অন্যটি ছিল কল্যাণকর্ম শিক্ষার জন্য (for wellfare work education)। এছাড়াও ১৯৭৫ সালে সমাজকর্ম স্কুলের প্রধানগণ (heads) মিলে আরেকটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে। বর্তমানে

অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্ম বিষয়ে যে সমস্ত কোর্স ও শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো এমন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা যারা যে কোনো বিষয় বা পরিস্থিতিকে জটিল বা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে। অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স এর তথ্যানুযায়ী ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এ্যাক্রিডিটেড কোর্স চালু রয়েছে।

## ৪. জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষা

জাপানে ১৯২০ সালে আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তী সময়ে এ পেশার বিকাশ, প্রসার ও গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে আমেরিকা সরকার জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৫০ সালে জাপানের কিয়োটোতে (Kyoto) অবস্থিত Doshisha University-তে সর্বপ্রথম সমাজকর্ম শিক্ষায় মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়। জাপানে জাপানিজ এ্যাসোসিয়েশন অব স্কুলস অব সোশ্যাল ওয়ার্ক (JASSW) ১৯৫৫ সাল থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। সেই সাথে টোকিওতে জাপান কলেজ অব সোশ্যাল ওয়ার্ক নামে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ২,৩৮,১৩০ জন শিক্ষার্থী সমাজকর্মে কোর্স সম্পন্ন করে পেশাদার সমাজকর্ম হিসেবে সার্টিফিকেট ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়েছেন।

## ৫. চীনে সমাজকর্ম শিক্ষা

চীনে অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত অবাধ নীতির (open door policy) প্রভাবে সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। চীনে সমাজকর্ম শিক্ষার উদ্ভব ঘটে ১৯২০ সালে। তবে ১৯৬০ এবং ১৯৭০ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর মাও জে দং (Mao Ze Dong) সরকারিভাবে সমাজকর্ম পেশার বিলুপ্ত ঘটায়, যা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে সরকারি সহায়তায় প্রথম বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম কর্মসূচি চালু করা হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষার স্বীকৃতি প্রদান করেন। চীনে ১৯৮৭ সালে Social Work Education Research Centre প্রতিষ্ঠা করা হয়। China Social Workers Association ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া সমাজকর্ম শিক্ষার্থীদের স্বার্থে ১৯৯৪ সালে China Association of Social Work Education প্রতিষ্ঠা করা হয়। চীনের প্রাদেশিক শিক্ষা কমিটি ১৯৮৭ সালে Peking University এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম কোর্স চালু করে। চীনে প্রায় দুইশত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম বিভাগ চালু করা হয়েছে এবং ৩৪ টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম চালু আছে।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসার ঘটছে। বিশ্বায়নের এই যুগে শিল্পসমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের প্রয়াসে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে সমাজকর্ম একটি গতিশীল ও বহুমুখী পেশা হিসেবে দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের গোড়াপত্তন ইংল্যান্ডে হলেও পেশাগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯২৯ সালে প্রথম সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালুর মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম পেশার যাত্রা শুরু হয়। জাপানে ও চীনে আধুনিক সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় ১৯২০ সালে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে লক্ষণীয় ভাবে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসার ঘটেছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। আমেরিকাতে কবে পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত হয়?

ক) ১৮৯৮ সালে খ) ১৯০৩ সালে

গ) ১৮৯৯ সালে ঘ) ১৯০৪ সালে

২। কোন দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসারে Mury Report গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে?

ক) যুক্তরাজ্য খ) যুক্তরাষ্ট্র

গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) জাপান

## পাঠ-১১.৭ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা (Social Work Education in Developing Countries)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১১.৭ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

### ১১.৭ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে আর্থ–সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় পাশ্চাত্যের উন্নত দেশের অনুকরণে সমাজকর্মের আবির্ভাব ঘটে। এর আগে সাধারণত ধর্মীয় অনুভূতি ও মানবপ্রেমকে কেন্দ্র করে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহে সমাজসেবা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। উন্নয়নশীল দেশের সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ উন্নত দেশে থেকে ভিন্ন হওয়ায় সেখানে সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারত, শ্রীলংকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজকর্ম শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

#### ১. ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা

ভারতে আধুনিক সমাজকর্মের উন্মেষ ঘটে ১৯২০ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৃষ্ট আর্থ–সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান মিশনারীরা সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভারতে আসে। আমেরিকার একটি পোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান মিশনারী সংগঠন 'American Marathi Mission' ১৯২৫ সালে বোম্বেতে সমাজসেবায় নিয়োজিত ছিল। এ সময় ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ড (Clifford Manshard) নামক এক মিশনারী বোম্বেতে আগমন করেন। ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ডকে ভারতে পেশাদার সমাজকর্ম বিকাশের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বস্তি সমস্যা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তখন তিনি পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৩৬ সালে বোম্বেতে প্রথম সমাজকর্ম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ভারতে সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার সূচনা হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৪ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে 'Tata Institute of Social Sciences' করা হয়। এরপর ১৯৪৬ সালে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসারে লক্ষ্ণৌ এর দ্বিতীয় ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৪৭ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে Delhi School of Social Work প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে সমাজকর্ম পেশা ও শিক্ষার সম্প্রসারণে ১৯৪৭ সালে Indian Council of Social Welfare প্রতিষ্ঠা করা হয়। Tata Institute of Sciences কে ১৯৬৬ সালে Tata University তে উন্নীত করা হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে The Indian Journal of Social Work প্রকাশ করা হচ্ছে। এ পত্রিকাটি ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশ ও প্রসারে

আমেরিকান সমাজকর্মের প্রভাব থাকায় দেশীয় শিক্ষা পাঠ্যক্রম গড়ে উঠেনি। এছাড়া সমাজকর্মের কার্যকরী পেশাগত সংগঠন তেমনভাবে গড়ে না উঠায় ভারতে সমাজকর্ম পেশা এখনো উদীয়মান পর্যায়ে রয়েছে।

### ২. শ্রীলংকায় সমাজকর্ম শিক্ষা

শ্রীলংকায় ১৯৫২ সালে সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার বিকাশ ঘটে। শ্রীলংকায় সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ডরোথী মসেস (Dr. Dorathy Mosess) ১৯৫২ সালে প্রথমে ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯৬৪ সালে ইনস্টিটিউটটিকে সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ীভাবে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল ওয়ার্ক। দেশটির অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'Srilanka School of Social Work' সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়নে দীর্ঘ ৬০ বছরের অধিক সময় ধরে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রীলংকার সরকার ২০০৪ সালে সুনামির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর সমাজকর্ম শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। তবে এখনো দেশটির অধিকাংশ জনগণ সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করতে অনেক ক্ষেত্রে সক্ষম হচ্ছে না।

বর্তমানে দেশটির চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের অধীনে বিশেষ ডিগ্রি কোর্স হিসেবে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সমাজকর্মে তিন স্তরের শিক্ষা পরিচালনা করছে। স্তরগুলো হলো– সমাজকর্মে ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শ্রীলংকায় ২০০৫ সাল থেকে সমাজকর্মে স্নাতক ডিগ্রি এবং ২০০৮ সাল থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালু রয়েছে। বর্তমানে Srilanka School of Social Work হতে শিক্ষার্থীরা সমাজকর্ম বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ অর্জন করলেও রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা নেই। তবে আশার বিষয় হচ্ছে সমাজকর্মীদের পেশাগত সংগঠন æSrilanka Association of Professional Social Workers" সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পেশাদার সমাজকর্মীদের জন্য একটি Regulatory Body প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

### ৩. দক্ষিণ কোরিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষা

দক্ষিণ কোরিয়ায় সর্বপ্রথম Yonsei University-তে সমাজকর্মে Under Graduate কোর্স প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত হয়। দেশটিতে সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস প্রায় ৪০ বছরের। দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। দেশটিতে ১৯৮০ সাল থেকে সমাজকর্মীদের জন্য লাইসেন্স প্রদান প্রথা চালু হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩৬৯টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে সমাজকর্ম কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশটিতে সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে Hallum University এর ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৪ সালে Social Welfare School প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'স্কুল অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার' নাম পরিবর্তন করে পুনরায় 'স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক' করেছে। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ কোরিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষার দ্রুত বিকাশ ও প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে দেশটি সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পশ্চাত্যের উন্নত দেশের ন্যায় ভারত, শ্রীলংকা ও দক্ষিণ কোরিয়া তথা উন্নয়নশীল দেশের দ্রুত সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসার ও বিকাশ ঘটছে।

## সারসংক্ষেপ

বিশ্বের উন্নতদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসার লাভ করছে। ভারতে আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার উন্মেষ ঘটে ১৯২০ সালে। শ্রীলংকায় ১৯৫২ সালে পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়। সেখানে Srilanka Association of Professional Social Workers সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পেশাদার সমাজকর্মীদের জন্য পেশাগত অথরিটি তথা Regulatary Body প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস প্রায় ৪০ বছরের। দেশটিতে সমাজকর্ম শিক্ষা দ্রুত বিকাশ ও প্রসার লাভ করছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ভারতে আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার উন্মেষ ঘটে কত সালে?
ক) ১৯২০ সালে খ) ১৯২১ সালে
গ) ১৯২২ সালে ঘ) ১৯২৩ সালে

২। শ্রীলংকায় ১৯৫২ সালে শ্রীলংকা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন কে?
ক) ড. ডরোথী খ) ড. ডাম্পসন
গ) ড. থমাস ঘ) রবার্ট মূর

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। AASW এর পূর্ণরূপ কী?
ক) Asian Association of Social Service
খ) Asian Alliance of Social Service
গ) Austraian Association of Socal Workers
ঘ) Agro Ailiance of Solidarity Work

২। উদ্বাস্তুর অপর নাম কী?
ক) মোহাজির খ) আনসার
গ) স্বেচ্ছাসেবক ঘ) উদ্ধারকর্মী

৩। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীলংকায় Institute of Social Work প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন?
ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ) কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়
গ) দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ঘ) বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়

৪। দক্ষিণ কোরিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস কত বছরের?
ক) ২০ বছর খ) ৩২ বছর
গ) ৩৭ বছর ঘ) ৪০ বছর

৫। দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নানাবিধ আর্থ-সামাজিক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে কেন?
ক) মোহাজিরদের আগমন ঘটায় খ) হিন্দুদের আগমন ঘটায়
গ) মুসলিমদের আগমন ঘটায় ঘ) রোহিঙ্গাদের আগমন ঘটায়

৬। বর্তমানে আধুনিক বিশ্বের দেশে কোন ধরনের সমস্যা বিশেষভাবে লক্ষনীয়?
ক) আর্থ-সামাজিক সমস্যা খ) মনো-সামাজিক সমস্যা
গ) রাজনৈতিক সমস্যা ঘ) সাংস্কৃতিক সমস্যা

৭। Mury রিপোর্ট কোন দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে?
ক) যুক্তরাজ্য খ) যুক্তরাষ্ট্র
গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) জাপান

৮। Post Secondary Education কোন দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার বিস্তারে অবদান রেখেছে?
i. যুক্তরাজ্য ii. যুক্তরাষ্ট্র iii. কানাডা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অনেক মোহাজিরের আগমন ঘটে। ফলে দেশে বস্তিসহ নানাবিধ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। তৎকালীন সরকার উক্ত সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় জাতিসংঘের কাছে সাহায্যের আবেদন করে।

৯। উদ্দীপকের আলোকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?

ক) আর্থ-সামাজিক সমস্যা খ) মনো-সামাজিক সমস্যা

গ) রাজনৈতিক সমস্যা ঘ) সামাজিক সমস্যা

১০। জাতিসংঘ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান সরকারকে কী ধরনের সাহায্য প্রদান করে?

i. আর্থিক সাহায্য দিয়ে ii. বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়ে iii. পরামর্শ প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন**

১। দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক সেবা কার্যক্রম, যা সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ ও ছিন্নমূল শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে সেবা প্রদান করে থাকে। উক্ত কেন্দ্রে দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন পেশাগত কর্মী না থাকায় সেবাপ্রদান ও কাঙ্খিত লক্ষ্যার্জন ব্যাহত হচ্ছে। কেন্দ্রটির সেবার মানোন্নয়ন ও কাঙ্খিত লক্ষ্যার্জনের জন্য সমাজকর্মী একান্ত আবশ্যক।

ক) UCDP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ) দুইটি উন্নত দেশের নাম লিখুন যেখানে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি। ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা বিকাশের অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত ক্ষেত্রটি ছাড়া বাংলাদেশে সমাজকর্ম অনুশীলনের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করুন। ৪

২। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে সমাজকর্মে উচ্চতর ডিগ্রিধারীরা সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলন করে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে সমাজকর্মের শিক্ষার্থী ও ডিগ্রিধারীরা সমাজকর্ম অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছে না। দেশ বিভাগের পর জাতিসংঘের সহযোগিতায় এদেশে সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হলেও আজ অবধি সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি।

ক) বাংলাদেশে সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কত সালে? ১

খ) সমাজকর্ম পেশার দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম অনুশীলনের তাৎপর্য কী তা ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উন্নত বিশ্বে সমাজকর্ম একটি পেশা হলে বাংলাদেশে সমাজকর্ম এখনো পেশা নয় কেন?– বিশ্লেষণ করুন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ : ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ : ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৫ : ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৬ : ১। ঘ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৭ : ১। ক ২। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১১ : ১। গ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। খ ৭। গ ৮। গ ৯। ক ১০। ঘ

# মানবণ্টন : পূর্ণমান ১০০

- সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৬০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।
- প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১।

- **সৃজনশীল প্রশ্নঃ**
  সৃজনশীল অংশে মোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং উত্তর দিতে হবে মোট ৬টি প্রশ্নের।

- **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**
  ৪০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

**সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের সাধারণ কাঠামো**

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে।
প্রশ্ন ৪টির নম্বর বন্টন হবে নিম্নরূপ:

**(ক) প্রশ্নের মান থাকবে ১**

**(খ) প্রশ্নের মান থাকবে ২**

**(গ) প্রশ্নের মান থাকবে ৩**

**(ঘ) প্রশ্নের মান থাকবে ৪**

প্রতিটি প্রশ্নের এই ৪টি অংশের মোট নম্বর হবে ১০।

# নমুনা প্রশ্ন

## সমাজকর্ম

কোর্স কোড: HSC-1862

### সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়: ২ ঘন্টা ১০ মিনিট

পূর্ণমান–৬০

[দ্রষ্টব্য: প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। যে কোনো **ছয়টি** প্রশ্নের উত্তর দিন। ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১. জনাব উথান্ট একটি বিশেষ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে তার নিজ গ্রামের অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ তথা উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এজন্য তিনি জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠিত ও মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। বর্তমানে তার গ্রামের নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী যেমন– প্রতিবন্ধী, শিশু ও প্রবীণদের উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

ক. NASW কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. পেশা বলতে কী বোঝেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব উথান্ট যে বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন তার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. জনাব উথান্টের কার্যক্রমের আলোকে উল্লেখিত বিষয়ের পরিধি বিশ্লেষণ করুন। ৪

২. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সামাদ স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাসে সমাজকর্ম পেশা বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি তার লেকচারে এক যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঘটনার প্রেক্ষিতে সমাজকর্ম পেশা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন।

ক. Values শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কি? ১

খ. সমাজকর্মের পদ্ধতিসমূহ লিখুন। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী ঘটনাটির প্রভাব আলোচনা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সমাজকর্ম পেশা বিকাশের যোগসূত্র বিশ্লেষণ করুন। ৪

৩. জনাব হ্যানরী একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের সমস্যা সমাধানে কাজ করেন। মরিয়ম বেগম একজন সাহায্যার্থী (Client), যিনি তার দাম্পত্য জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জনাব হ্যানরীকে প্রদান করেন। জনাব হ্যানরী তা গোপন রাখেন এবং মরিয়ম বেগমকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে সমাজে পুনর্বাসিত করেন। বর্তমানে মরিয়ম বেগম তার জীবনের মূলস্রোতধারায় ফিরে এসেছেন। বর্তমানে সমাজ তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

ক. পেশাগত সম্পর্ক বা Rapport কী? ১

খ. পেশা ও বৃত্তির মধ্যকার বিদ্যমান দুটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তুলে ধরুন। ২

গ. উদ্দীপকে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী কর্তৃক অনুশীলিত মূল্যবোধের বর্ণনা দিন। ৩

ঘ. "সমাজকর্ম একটি মূল্যবোধ নির্দেশিত পেশাগত কর্মকান্ড"– উক্তিটির যতার্থতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

৪. স্বর্গীয় প্রতিমা পাল মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সমুদয় অংশ একটি মন্দিরের নামে দান করে যান। তিনি তাঁর দানকৃত সম্পত্তি দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য মন্দির পরিচালনা পর্ষদকে অনুরোধ করে যান। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রদত্ত সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করা হয়।

ক. 'Charity' শব্দটি কোন ধরনের শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে? ১

খ. সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের মধ্যে বিদ্যমান মৌলিক পার্থক্যটি লিখুন। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. "সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনের ঐতিহ্যগত বা সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্য অপরিসীম"– উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

৫. শিমুল সাহা একজন শিক্ষানবিস সমাজকর্মী হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে অনুশীলন করছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি অস্বাভাবিক আচরণ করে এমন মানুষের সমস্যা সমাধানে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত নিবাসীদের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ, প্রকৃতি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিশেষ শাখার জ্ঞান প্রয়োগ করছেন।

ক. সমাজকর্ম কি ধরনের বিজ্ঞান? ১
খ. সতীদাহ প্রথা কী? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের সমস্যা সমাধানে কোন শাখার জ্ঞান প্রয়োজন– তা নিরূপণ করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাখার সাথে সমাজকর্মের গভীর সম্পর্ক রয়েছে– কথাটি যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ করুন। ৪

৬. বাঁধন ১৬ বছরের একজন কিশোর। সে কিছুদিন যাবত ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তার বাবা বিষয়টি বুঝতে পেরে একজন পেশাদার সমাজকর্মীর নিকট তাকে নিয়ে যান। সমাজকর্মী বাঁধনকে তার সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলেন।

ক. সমাজিক গবেষণা সমাজকর্মের কোন ধরনের পদ্ধতি? ১
খ. সামাজিক কার্যক্রমের পাঁচটি উপাদান লিখুন। ২
গ. বাঁধনের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিটি প্রয়োগযোগ্য তা নিরূপন করুন। ৩
ঘ. সমাজকর্মী বাঁধনের সমস্যা সমাধানে কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন তা বিশ্লেষণ করুন। ৪

৭. নাসিমার বয়স ১৪ বছর। সে এবার জেএসসি পরীক্ষা দিবে। তাই সে মনোযোগ সহকারে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার পিতা-মাতা তাকে বিয়ে দেয়ার জন্য পাত্র ঠিক করেছে এবং কিছুদিন যাবত তাকে স্কুলে না যাওয়ার জন্য বাধ্য করছেন। নাসিমাদের গ্রামে নাসিমার মতো বেশ কয়েকজন মেয়েশিশুর বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। তবে তারা কেউই এখন বিয়ে করতে আগ্রহী নয়। কেননা তারা পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে আগ্রহী। এমতাবস্থায় নাসিমা গ্রামের অন্য মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামে কর্মরত একটি এনজিও'র মাধ্যমে বিষয়টির বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিষয়টি প্রতিরোধ সম্ভবপর হয়।

ক. পদ্ধতি শব্দটি ইংরেজি কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১
খ. দল সমাজকর্মের উপাদানসমূহ লিখুন। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামে সমাজকর্মের যে পদ্ধতির প্রতিফলন লক্ষণীয় সে পদ্ধতিটির প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত পদ্ধতিটি প্রয়োগের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

৮. শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যত। শিশুদের সুরক্ষা, সর্বোত্তম উন্নয়ন, শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিতে বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেটিতে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ক. শিশু কারা? ১
খ. পরিকল্পনা বলতে কী বোঝেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত উদ্যোগটির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ আলোকপাত করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গৃহীত উদ্যোগটি বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করুন। ৪

৯. বর্তমানে উন্নত দেশসমূহে সমাজকর্মে উচ্চতর ডিগ্রি ধারীরা সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলন করে ব্যক্তি, দল ও সমষ্ঠির সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে সমাজকর্মে ডিগ্রিধারীরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমাজকর্ম অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছে না। জাতিসংঘের সুপারিশে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সমাজকর্মের পেশাগত যাত্রা শুরু হলেও এখনও এদেশে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

ক. বাংলাদেশে সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কত সালে? ১
খ. সামাজিক দল কী? ২
গ. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উন্নত বিশ্বে অনেক দেশে সমাজকর্ম পেশা হলেও বাংলাদেশে সমাজকর্ম আজও পেশা নয় কেন?– বিশ্লেষণ করুন।৪

# সমাজকর্ম

## বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ৪০ মিনিট

পূর্ণমান– ৪০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার প্রতিটি ক্রমিক নম্বরের প্রশ্নের সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখুন।]

১. সমাজকর্ম পেশার অগ্রদূত কে ছিলেন?
ক. W. A. Friedlander খ. Robert L. Barker
গ. Marry Ellen Richmond ঘ. Arthur Dunham

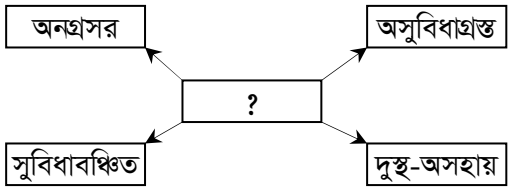
২. সমাজকর্মের প্রকৃতি হচ্ছে–
i. সাহায্যকারী প্রক্রিয়া ii. বহুমুখী প্রক্রিয়া iii. বদান্যতা নির্ভর প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. APASWE এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক. Asia-Pacific Association of Social Work Education
খ. American Association of Social Work Education
গ. Atlantic-Pacific Association of Social Work Education
ঘ. Africa-Pacific Association of Social Work Education

৪. COS এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক. Community Organization Society খ. Curity Organization Society
গ. Charity Organization Society ঘ. Changing Organization Society

৫. বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা ঘটে কোন কর্মসূচির মাধ্যমে?
ক. United Community Development Project
খ. Urban Community Development Program
গ. Urban Community Development Project
ঘ. Under Community Development Project

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন :




৬. উদ্দীপকটির '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?
ক. সমাজকল্যাণ খ. সামাজিক নিরাপত্তা
গ. সামাজিক আইন ঘ. সমাজকর্ম

৭. দুস্থ-অসহায় ও অসুবিধাগ্রস্ত কারা?
i. ছিন্নমূল পথশিশু ii. ভাসমান জনগোষ্ঠী iii. গার্মেন্টসকর্মী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন একজন প্রবেশন অফিসার। তার তত্ত্বাবধানে বর্তমানে দশজন কিশোর অপরাধীকে সংশোধনের জন্য শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেয়া হয়েছে। কিশোর অপরাধীদের মধ্যে বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের কিশোর রয়েছে। এছাড়া তাদের মধ্যে দুইজন কিশোর অপরাধীর গ্রামের বাড়ি প্রবেশন অফিসারের গ্রামে এবং তারা দুজনই মুসলমান। ফরে প্রবেশন অফিসার উচ্চবিত্ত, তার নিজ গ্রামের ও নিজ ধর্মের কিশোর অপরাধীদের সেবা প্রদানে অধিক যত্নশীল।

৮. উদ্দীপকটিতে মোঃ দেলোয়ার হোসেনের পেশার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী?

ক. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা
খ. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করা
গ. সনাতন ও প্রথাগত পদ্ধতিতে সহায়তা করা
ঘ. বাহ্যিক সাহায্য প্রদান করা

৯. উদ্দীপকটি মোঃ দেলোয়ার হোসেন কোন পেশাগত মূল্যবোধ লঙ্ঘন করেছেন?

i. সকলকে সমান সুযোগ দান ii. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি iii. সামাজিক দায়িত্ববোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১০. নিচের কোনটি পেশা নয়?

ক. রিক্সা চালানো
খ. ডাক্তারি
গ. ওকালতি
গ. শিক্ষকতা

১১. কার শাসন আমলে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রবর্তন করা হয়?

ক. বাদশাহ আকবর
খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
ঘ. লর্ড ক্লাইভ

১২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ কোনটি?

ক. বাল্যবিবাহের প্রতিকার
খ. বাল্যবিবাহ : কারণ ও প্রতিকার
গ. বাল্যবিবাহের দোষ
ঘ. বাল্যবিবাহ নিরোধ

১৩. 'Sociology' শব্দটি সর্বপ্রথম কোন দার্শনিক ব্যবহার করেন?

ক. Kangsley Davis
খ. Franklin Giddings
গ. Auguste Comte
ঘ. John B. Watson

১৪. শাহীন আক্তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। তার অধীত বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে বলল, সে এমন একটি বিষয়ে পড়াশোনা করছে, যা মানুষের শারীরিক গঠন-প্রকৃতি ও জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করে। শাহীন আক্তারের অধীত বিষয় কোনটি?

ক. জনবিজ্ঞান
খ. সমাজবিজ্ঞান
গ. নৃ-বিজ্ঞান
ঘ. সাংবাদিকতা

১৫. মাধ্যমিক দলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে–

i. পরিবার ii. শ্রমিক সংঘ iii. নাট্যদল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১৬. বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষানীতি প্রণীত হয় কত সালে?

ক. ১৯৭২
খ. ১৯৭৩
গ. ১৯৭৪
ঘ. ১৯৭৫

১৭. জাতীয় জনসংখ্যা নীতি, ২০০৪ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে–

i. পরিবার পরিকল্পনা ii. প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন iii. সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১৮. সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা হচ্ছে–

i. জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণের অভাব ii. দক্ষ জনবল ও বিশেষজ্ঞদের অভাব

iii. অর্ধেক জনগোষ্ঠী যুবক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. "পরিকল্পনা হলো সচেতন ও সুচিন্তিত নির্দেশনা যাতে সম্মিলিত উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি হয়"– উক্তিটি কার?

ক. Arthur Dunhan খ. W. H. Nawman

গ. H. B. Trecker ঘ. P. N. Sharma

২০. চীনে সর্বপ্রথম সমাজকর্ম শিক্ষার উদ্ভব হয় কত সালে?

ক. ১৯২০ খ. ১৯২১

গ. ১৯৩০ ঘ. ১৯৩৪

২১. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে উচ্চ শিক্ষা চালু রয়েছে?

ক. দুই খ. তিনটি

গ. চারটি ঘ. সাতটি

২২. MDGs এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Millennium Declaration Goals খ. Millennium Diliberate Goals

গ. Millennium Development Goals ঘ. Middle Development Goals

২৩. সামাজিক আইন কেন প্রণয়ন করা হয়?

ক. নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের জন্য খ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য

গ. নাগরিকদের সচেতন করার জন্য ঘ. সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য

২৪. দক্ষিণ সুদানে জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশের পুষ্টির হার বৃদ্ধির জন্য একটি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন সমস্যার কারণে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। দক্ষিণ সুদানের সাথে নিচের কোন দেশের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. জাপান

গ. রাশিয়া ঘ. বাংলাদেশ

২৫. শিল্পবিপ্লবের ফলে কোন শিল্পটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

ক. চামড়া শিল্প খ. পোশাক শিল্প

গ. বৃহৎ শিল্প ঘ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

২৬. বাংলাদেশে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি?

ক. শহর সমষ্টি উন্নয়নে খ. মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানে

গ. প্রবেশন সেবায় গ. পতিতা সমস্যা নিরসনে

নিচের উদ্দীপনকটি পড়ুন এবং ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'ক' নামক রাষ্ট্র অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অসুস্থতাজনিত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য সামাজিক বীমা ও সামাজিক সাহায্য কার্যক্রম চালু করেছে।

২৭. উদ্দীপককে 'ক' রাষ্ট্রের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. সামাজিক সংস্কার খ. সামাজিক নিরাপত্তা

গ. সামাজিক আইন গ. সামাজিক উন্নয়ন

২৮. উদ্দীপকে যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে সেটির প্রথম সূত্রপাত ঘটে কোন দেশে?

ক. যুক্তরাজ্য খ. যুক্তরাষ্ট্র

গ. অস্ট্রেলিয়া গ. কানাডা

২৯. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে–

i. সমাজকর্ম প্রশাসন ii. সামাজিক কার্যক্রম iii. সামাজিক নিরাপত্তা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

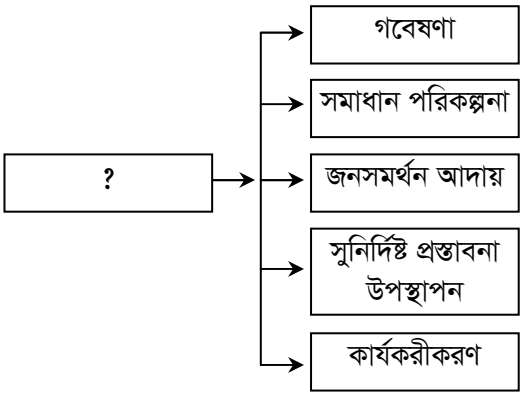
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. 'সমষ্টি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

ক. Total খ. Average

গ. Whole ঘ. Community

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩১ ও ৩২নং প্রশ্নের উত্তর দিন :




৩১. উদ্দীপকটিতে '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?

ক. সামাজিক আন্দোলন খ. সামাজিক সংস্কার

গ. সামাজিক কার্যক্রম ঘ. সামাজিক গবেষণা

৩২. উদ্দীপকটিতে '?' চিহ্নিত স্থানে যে বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে, সেটির গুরুত্ব হচ্ছে–

i. বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবর্তন ii. আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ iii. কুসংস্কার ও সামাজিক গোঁড়ামি দূরীকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৩. মজিদ মিঞার ছেলে-মেয়েরা শহরে বড় চাকুরী করে। তারা সকলে প্রতিষ্ঠিত হলেও মজিদ মিঞা গ্রামে দরিদ্র জীবযাপন করছে। তার ছেলে-মেয়েরা তার প্রতি কোনো ধরনের দায়িত্ব পালন করছে না। মজিদ মিঞার পরিবারে কোন বিষয়টির প্রভাব লক্ষ্যনীয়?

ক. আধুনিকায়ন খ. শহরায়ন

খ. পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঘ. শিক্ষার অভাব

৩৪. মন্নুজান বেশ কিছুদিন যাবত মিথ্যে কথা বলছে। তার মা বিষয়টির প্রতি নজর দেন। অবশেষে মন্নুজানকে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে যান। সেখানে একজন পেশাগত প্রতিনিধি একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করেন। উক্ত বিষয়টির সাথে কোন বিষয়টির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. ব্যক্তি সমাজকর্ম খ. দল সমাজকর্ম

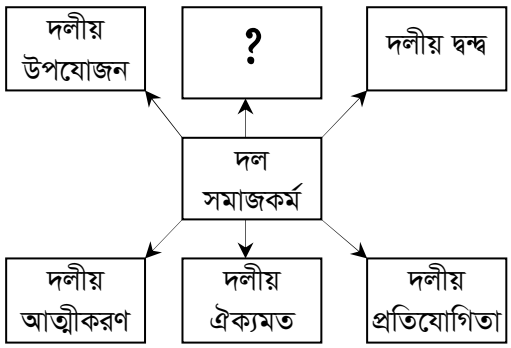
গ. সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্ম গ. সমষ্টি সংগঠন সমাজকর্ম

৩৫. সামাজিক দলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় তা হলো :

ক. মুখ্য ও গৌণ দল খ. অন্তঃদল ও বহিঃ দল

গ. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গ. স্থায়ী ও অস্থায়ী দল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন :




৩৬. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?

ক. দলীয় সহযোগিতা খ. দলীয় সহমর্মিতা

গ. দলীয় যোগাযোগ ঘ. দলীয় সম্প্রীতি

৩৭. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানের বিষয়টি কিভাবে নিশ্চিত করা যায়?

ক. মানবীয় গুণাবলি ও মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে খ. দলীয় শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে

গ. দলীয় কঠোর বিধি-বিধানের মাধ্যমে ঘ. দলীয় দ্বন্দ্বের মাধ্যমে

৩৮. বাজিতপুর গ্রামের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্বসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। বাজিতপুরে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি বেশি কার্যকরি হবে?

ক. ব্যক্তি সমাজকর্ম ও সামাজিক কার্যক্রম খ. দল সমাজকর্ম ও সামাজিক গবেষণা

গ. সমষ্টি উন্নয়ন ও সামাজিক গবেষণা ঘ. সমষ্টি সংগঠন ও সামাজিক গবেষণা

৩৯. সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কোনটিকে গণ্য করা হয়?

ক. সামাজিক নীতি খ. সামাজিক পরিকল্পনা

গ. সমাজসেবা ঘ. সামাজিক প্রকল্প

৪০. Richard M. Titmass তাঁর æSocial Policy" গ্রন্থে সামাজিক নীতির কয়টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন?

ক. দুইটি খ. তিনটি

গ. চারটি ঘ. পাঁচটি